চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ : ১৯৬০

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার। টেকনোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

চীনা সভ্যতা সুপ্রাচীন এবং এর ইতিহাস দীর্ঘ ও সমৃদ্ধিশালী। আমাদের এই পুস্তকের উদ্দেশ্য হল সংক্ষেপে চীনের ইতিহাস বর্ণনা এবং চীনা সামাজিক অগ্রগতির একটি রূপরেখা দেওয়া।

এই পুস্তক তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভক্ত: আদি যুগ, আধুনিক যুগ এবং সাম্প্রতিক যুগ।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় চীনাজাতিও আদিম কমিউন, দাসপ্রথা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। চীন দেশে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতি হয়েছে খুবই মন্থরগতিতে এবং এই প্রক্রিয়া চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। চীনের কৃষকশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে চালিয়ে গেছে তাদের বিপ্লবী সংগ্রাম, তাই সমাজের অগ্রগতি মন্থর হলেও তাতে কোন ছেদ পড়ে নি। বিশেষ করে, ছিন, সুই এবং ইউয়ান প্রতিটি সাম্রাজ্যের শেষের দিকে যে যে বৃহৎ আকারের কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তা সমাজের উৎপাদনশক্তিসমূহের অগ্রগতিকে বিরাট প্রেরণা যুগিয়েছিল, আর তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল হান, থাং এবং মিং সাম্রাজ্যগুলির প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং চীনের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃতি। চীনা জনগণের গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং তাদের অত্যুত্তম ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে আসছে চীনের সুপ্রাচীন ইতিহাস।

১৮৪০ সালে ইংরাজ চীনের বিরুদ্ধে ইতিহাসে খ্যাত 'আফিম যুদ্ধ' শুরু করে। আর, তখন থেকেই অবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা চীনে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। চীনের সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে যোগসাজসে তারা চীন দেশে পুঁজিবাদের বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়। চীনের পুঁজিবাদী

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রগতি বিভিন্ন আবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্লথ গতিতে এগুতে থাকে। চীনের ব্যাপক জনসাধারণ তখন সর্বতোভাবে শোষিত ও নিপীড়িত হয়ে যে চরম দারিদ্র্য দশায় পড়েছিল তা কল্পনাতীত। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনী শক্তি যতই প্রবল হতে থাকে চীনা জনগণেরও প্রতিরোধ আন্দোলন ততই অটল ও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৮৫১ সালে কৃষকদের দ্বারা সংঘটিত 'থাইফিং বিদ্রোহ'ই গণ-বিদ্রোহের সর্বপ্রথম অভ্যুত্থান। আর তারই ফলে ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের পতন ত্বরান্বিত হয়। দ্বিতীয় অভ্যুত্থান হয় ১৯০০ সালে কৃষকদেরই দ্বারা সংঘটিত 'ই হো থুয়ান আন্দোলন'। এই আন্দোলনের সময় চীনা জনগণ জোটবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের নিদারুণ বর্বরতাপূর্ণ আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হেনে চীন দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মতলব সাময়িকভাবে বানচাল করে দেয়। তৃতীয় অভ্যুত্থান হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে ১৯১১ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে চীনে দু'হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসনের অবসান ঘটে আর অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয় একটি অস্থায়ী শাসনতন্ত্র। এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা জনগণের মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সকলের মন থেকে দূরীভূত হয়। তবে, সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রকে পরাস্ত করতে চীনা বুর্জোয়া-সম্প্রদায় ছিল খুবই দুর্বল। তাই তারা চীনা সমাজের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। চীনা জনগণের বিপ্লবী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই চীনা জনগণের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব সত্যিকারে সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তোপধ্বনি চীন দেশের জন্য বহন করে আনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। ইতিমধ্যে চীনে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আরও উন্নতি লাভ করেছিল এবং চীনের সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো যথেষ্ট শক্তিও অর্জন করেছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চিন্তাধারার প্রভাবে বিস্ফোরিত হয় ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলন। সেই সঙ্গে চীনা ইতিহাসে উদ্‌ঘাটিত হয় একটি নতুন পর্যায় — নয়া গণতন্ত্র পর্যায়। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ

এবং আমলা-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নেতৃত্ব দিতে থাকে। পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে চীনা জনগণ তিনটি গৃহযুদ্ধ এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং পরিশেষে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিরাট বিজয় অর্জন করে। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অতঃপর, চীন প্রবেশ করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের এক নতুন যুগে।

সূচীপত্র

আদি যুগ

(আদিম সমাজ, দাস ব্যবস্থাভিত্তিক সমাজ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ)

আধুনিক যুগ

(পুরনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়)

সমসাময়িক যুগ

(নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়)

আদি যুগ

(আদিম সমাজ, দাস ব্যবস্থাভিত্তিক সমাজ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ)

১. সুদূর প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধরত দেশসমূহের কাল পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৩০০-এর পূর্বে)

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার : বর্তমানে চীন নামে অভিহিত এই দেশে সুদূর কাল থেকে যে মানুষ বাস করে আসছে তার প্রমাণ বিগত কয়েক দশকের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাতন প্রত্নপ্রস্তর-যুগীয় মর্কট-মানবদের জীবাশ্ম এবং তাদের ব্যবহৃত প্রস্তর-নির্মিত যন্ত্রাদি ও অন্যান্য বহু জীবাশ্ম-সংক্রান্ত উপাদান ১৯২৯ সালের পর থেকে পেইচিং শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে চৌখৌতিয়ান নামক স্থানে বহুবার আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মর্কট-মানব যা পেইচিং মানব বলেও পরিচিত প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে ভূ-গঠনের চতুর্থ যুগের প্লাইসেটোমিন পর্বে চীনে বাস করত। ১৯৫৪ সালে, শানসী প্রদেশের সিয়াংফেন জেলার অন্তর্গত তিংছুন গ্রামে মধ্যপ্রস্তর যুগীয় মানুষের দাঁতের জীবাশ্ম এবং বহু সংখ্যক প্রস্তর-নির্মিত যন্ত্রাদি আবিষ্কার হয়। অন্ত-প্রত্নপ্রস্তর-যুগীয় নৃবিদ্যায় আখ্যায়িত হোমো স্যাপিয়েন (বর্তমানে উপর গুহামানব) নামে পরিচিত হাড়ের জীবাশ্ম এবং বহু সংখ্যক প্রস্তরনির্মিত যন্ত্রাদি ও হাড়নির্মিত শিল্পদ্রব্য ১৯৩৪ সালে চৌখৌতিয়ানের ড্রাগন-হাড় পাহাড়ের উপরাংশের গুহা থেকে পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, কুয়াংতোং প্রদেশের শাওকুয়ানের মাপা, হুপেই প্রদেশের ছাংইয়াং এবং কুয়াংসী প্রদেশের লিউচিয়াং এবং হোথাও (পীতনদীর বাঁকে) অঞ্চলগুলিতে প্রত্নপ্রস্তর-যুগের মানুষদের জীবাশ্ম এবং তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে থাকা নবপ্রস্তর-যুগের বিভিন্ন নিদর্শন চীনের বহু স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে প্রত্নপ্রস্তরযুগ এবং নবপ্রস্তর-যুগের অন্তর্বর্তী সময়কার চিত্রিত কৃষ্ণ মৃন্ময়পাত্র আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্মিত কারিগরী যন্ত্রাদি। চিত্রিত মৃন্ময়পাত্রের নমুনা যা ইয়াংশাও সংস্কৃতি নামেও পরিচিত — আধুনিক হোনান, শানসী এবং সেনসী প্রদেশ থেকে কানসু প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণ মৃন্ময়পাত্রের নমুনা — যা লোংশান সংস্কৃতি নামে পরিচিত — প্রধানতঃ শানতোং প্রদেশ এবং চীনের মধ্য মালভূমির বিশাল এলাকার ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে। মাইক্রোলিথিক সংস্কৃতির নিদর্শন চীনের মহাপ্রাচীরের উত্তরাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং নবপ্রস্তর-যুগীয় দক্ষিণ চীনের বৈশিষ্ট্যবহনকারী নিদর্শন ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপাখ্যান: চীনের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নানা-ধরণের মূল্যবান উপাখ্যান ও চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব উপাখ্যানে বিবৃত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন: হুয়াং তি, অর্থাৎ পীত সম্রাট। প্রবাদ, তিনি জেডনির্মিত অস্ত্র দিয়ে অন্যান্য উপজাতিদের বশীভূত করেছিলেন। পীত সম্রাটের পত্নী ছিলেন লেই জু। প্রবাদ, তিনি রেশমগুটি পালন প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শুন নামে এক প্রবাদ পুরুষ লাক্ষা বস্ত প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। ইয়ু অথবা মহান ইয়ু ব্রোঞ্জ-নির্মিত অস্ত্র প্রয়োগ করে মিয়াও জাতিকে পরাভূত করেছিলেন। প্রবল বন্যার জল রোধ করবার উপায়ও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এই সব উপাখ্যান বা লোককাহিনী থেকে জানা যায় যে, চীনের আদিম কমিউন সমাজব্যবস্থায় না ছিল শ্রেণীবিভাগ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা না ছিল মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ।

সিয়া (খৃষ্টপূর্ব একবিংশ থেকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী) এবং শাং (খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ থেকে খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী): প্রবাদ, একটি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে সিয়া রাজবংশই ছিল চীনের সর্বপ্রথম রাজবংশ। এই রাজবংশের রাজা ছিলেন মহান বীর ইয়ু-এর পুত্র ছি। ছি'র পর তার বংশধরেরা রাজত্ব করেন। সিয়া রাজবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন চিয়ে। শাং চিয়েকে পরাস্ত করে একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে।

শাং অথবা ইন রাজবংশের সময় থেকে শুরু হয় চীনের লিখিত বিবরণের

ইতিহাস।* এই যুগের লিপি কিছু কিছু ব্রোঞ্জের উপর ঢালাই করে লিখিত হয়, কিছু কিছু কচ্ছপের খোলার উপর অথবা জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের উপর খোদাই করে লিখিত হয়। এই সব লিপি প্রধানতঃ ছিল ছবিলিপি। শাং যুগের ব্রোঞ্জ-নির্মিত বস্তু তার পরের সব রাজত্বের যুগেই ভূগর্ভ থেকে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হোনান প্রদেশের আনইয়াং নামক স্থানে বহুবার খননকার্য চালিয়ে প্রচুর মূল্যবান বস্তু আবিষ্কার করেছেন। চেংচৌ নামক স্থানে ইন রাজত্বের সময়কার লোকেদের বসবাসকারী একটি শহরের লুপ্তাবশেষ এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের নিদর্শন বহু পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব থেকে জানা যায় যে এই শহরটি ছিল ইন লোকেদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কচ্ছপের খোলা এবং হাড়ের উপর খোদিত লিপি ১৮৯৯ সালে সর্বপ্রথম আনইয়াং জেলাভুক্ত সিয়াওথুন গ্রামের ইনের লুপ্তাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৯৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত বহু নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের গবেষণার ফল থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই সব লিপিতে ব্যক্ত হয়েছে তৎকালীন ভবিষ্যদ্বক্তাদের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী।

এই সব মূল্যবান তথ্য থেকে আমরা শাং রাজবংশ আমলের সংস্কৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারি।

প্রথমতঃ, আমরা নিশ্চিতরূপে অনুমান করতে পারি যে, শাং রাজত্বের সময়কার উৎপাদন-কৌশল বহু আগেই তাম্রযুগে প্রবেশ করেছিল। ঐ যুগের তাম্র-নির্মিত দ্রব্য ছিল বিভিন্ন প্রকারের আর তাদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল রন্ধনশালায় প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র ও কাটারি, মদ্যপানের পাত্র, যুদ্ধের অস্ত্র ইত্যাদি। বৃহৎ আকারের মধ্যে আছে বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত এবং সুন্দর কারুকার্যশোভিত সাতশত কিলোগ্রাম ওজনের একটি ত্রিপদ পাত্র। ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে আছে যেমন চামচ, মদের পেয়ালা এবং তীরের ফলা। এগুলো খুবই শোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক। এই সব তাম্র-নির্মিত দ্রব্য সংখ্যার দিক থেকে, আকৃতির বিভিন্নতার দিক থেকে, কারিগরী দক্ষতার দিক থেকে

* রাজা ফানকেং তাঁর রাজধানী ইন নামক স্থানে স্থানান্তরিত করার পর থেকে শাং রাজবংশ ইন রাজবংশ নামে পরিচিত হয়।

এবং কারুকার্যের সৌন্দর্যের দিক থেকে পৃথিবীর তাম্রযুগীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় স্থান দখল করে আছে।

দ্বিতীয়তঃ, শাং রাজত্ব কৃষি উৎপাদনের যুগে প্রবেশ করেছিল। কচ্ছপের খোলা এবং হাড়ের উপর ফসল-কাটা ও বৃষ্টি সম্বন্ধে খোদিত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শাং রাজত্বের অর্থনীতিতে কৃষি ইতিমধ্যেই এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। এই সব খোদিত বর্ণনাতে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে জোয়ারের কথা সবচেয়ে অধিক উল্লিখিত হয়েছে। তারপর গম। এ থেকে ধারণা করা যায় যে শাং আমলের লোকেদের প্রধান খাদ্য ছিল জোয়ার এবং গম। "রেশমীগুটি-পোকা", "তুঁতগাছ" এবং "রেশম ও রেশমীকাপড়" ইত্যাদি শব্দের বহু উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে শাং সময়পর্বের অভিজাত ব্যক্তিরা রেশম দিয়ে পরিধান বস্ত্র তৈরী করার কথা জানতেন। গবাদি পশু পালন ঐ সময়ে ইতিমধ্যেই গৌণ বৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদদের আবিষ্কার এবং কচ্ছপের খোলা ও হাড়ের উপর খোদিত লিপি থেকে আরও জানা যায় যে, শাং লোকেরা যে সব পশু গৃহে পালন করত তা হল বর্তমানকালেও ব্যবহৃত ঘোড়া, গরু, ভেড়া, কুকুর এবং শূকর। ভারবাহী পশু হিসেবে এবং রথ ও শকট চালনাতে ঘোড়া এবং গবাদি পশু ব্যবহৃত হত। পীতনদীর উপত্যকায় ঐ সময়ে হাতির অস্তিত্ব ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি ব্যবহৃত হত।

তৃতীয়তঃ, শাং রাজত্বের সময়কার সমাজ ছিল দাসব্যবস্থাভিত্তিক সমাজ। ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত তাম্রদ্রব্যসমূহের উন্নত ধরণের মান থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে বহু সংখ্যক সুদক্ষ কারিগর ছিল এবং তাদের তদারকী করার জন্য অন্য লোকও ছিল। ঐ সব দাস-কারিগরেরা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য বিলাসদ্রব্য তৈরি করত। আমরা আরও জানতে পারি যে তখন বহু ভবিষ্যদ্বক্তার অস্তিত্ব ছিল এবং তারা অর্ঘ্য অর্পণ করত, ভবিষ্যদ্বাণী করত আর তার ফলাফল লিখত বা খোদাই করত। অবশ্য কৃষি অথবা পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের লোকের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকেদেরও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগান দিত।

এ থেকে কল্পনা করা যেতে পারে যে শাং রাজত্বের সময়ে বহু সংখ্যক ক্রীতদাস শ্রম-উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশারদদের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ক্রীতদাসদের তাদের মৃত প্রভুদের সঙ্গে জীবন্ত কবর

দেওয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন জীবন্ত কবরস্থ ক্রীতদাসদের সংখ্যা তিনশত থেকে চারশত ছিল। ইন রাজত্বের সময়কার কবরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই ধরণের দুই হাজার জীবন্ত মানুষ বলিদানের ঘটনা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে ক্রীতদাসদের সংখ্যার বিপুলতা। আরও অনুমান করা হয় যে এই সব ক্রীতদাস ছিল যুদ্ধ-বন্দী অথবা অপরাধী। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, শাং রাজত্বের কালে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত এবং শাস্তিদান ব্যবস্থা খুব কঠোর ছিল।

বর্তমানে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে শাং শাসনাধীন ভূখণ্ডের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তা জানা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে, উত্তরে বর্তমানে হোপেই প্রদেশের মধ্যভাগ, দক্ষিণে ইয়াংসি এবং হুয়াই নদীদ্বয় এবং হুপেই প্রদেশ, পূর্বে শানতোং প্রদেশ এবং পশ্চিমে সেনসী প্রদেশ শাং রাজাদের আধিপত্যে ছিল। এই বিরাট অঞ্চলের বহুসংখ্যক উপজাতি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাং রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

চীনা ঐতিহাসিক সিমা ছিয়ান তাঁর "ঐতিহাসিক ঘটনা বিবরণ" নামক গ্রন্থের 'ইন রাজবংশের বিবরণ' অধ্যায়ে শাং রাজবংশের শাসকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এই বিবরণে প্রথম শাসক সিয়ে থেকে শুরু করে থাং (যিনি শাং রাজত্বের পত্তন করেছিলেন) পর্যন্ত মোট তেরটি বংশধর উল্লিখিত হয়েছে। শাং রাজত্বের পত্তনকারী থাং থেকে শুরু করে শেষ শাসক রাজা চৌ পর্যন্ত মোট ত্রিশ-জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। এই বিবরণে উল্লিখিত এইসব রাজাদের নাম কচ্ছপের খোলা এবং হাড়ের উপর খোদাইকৃত নামের সঙ্গে মোটামুটি মিল আছে।

শাং রাজত্বের স্থিতিকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। জুও ছিউমিং রচিত "কনফুসিয়াসের বসন্ত ও শরৎ উপাখ্যানের টীকা" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শাং রাজাদের রাজত্বকাল ছিল ছয়শত বছর।

পশ্চিম চৌ (খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী থেকে খৃঃ পূঃ ৭৭১) এবং পূর্ব চৌ (খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী): শাং রাজবংশের রাজত্বের শেষের কয়েকটি বছরে বর্তমানকালের শানসী প্রদেশের ওয়েই নদী উপত্যকায় চৌ রাজ্যের লোকেরা বিদ্রোহ শুরু করে। চৌ রাজা শাং রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ঠিক কোন সময়ে চৌ বংশের শাসন পত্তন করে তা জানা যায় না। চলিত প্রবাদ অনুসারে খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে চৌ শাং বংশকে

পরাভূত করে। 'ঐতিহাসিক ঘটনা বিবরণ' গ্রন্থের "দ্বাদশ রাজকুমারদের কালক্রম" অধ্যায় শুরু হয়েছে খৃঃ পূঃ ৮৪১ থেকে। আর ঐ বছর থেকে শুরু করে চীনা ঐতিহাসিক গ্রন্থে যে দিন-কাল বর্ণিত হয়েছে তা সব নিখুঁত।

চৌ বংশের প্রারম্ভিক যুগে রচিত লোকগাথা থেকে আমরা জানতে পারি যে, চৌ রাজবংশের প্রথম শাসকের নাম ছিল ছি এবং তিনি ছিলেন দেবকন্যা চিয়াং ইউয়ানের পুত্র। কথিত আছে, ছি হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এক ধরণের জোয়ার রোপণ করেন। এই ধরণের জোয়ার খুব সহজেই চাষ করা যেত আর তা লোকেদের মুখ্য খাদ্যশস্যে পরিণত হয়। কৃষিক্ষেত্রে এই বিরাট অবদানের জন্য ছি কৃষি-দেবতা বলে পূজিত হন এবং তাকে হৌ-চি অর্থাৎ কৃষি-স্বামী উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

প্রবাদ, আদিতে চৌ গোষ্ঠীর লোকেরা থাই অঞ্চলের অর্থাৎ বর্তমান সেনসী প্রদেশের উকোং জেলার বাসিন্দা ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সমীক্ষা এবং প্রারম্ভিক খননকার্য থেকে জানা যায় যে, ওয়েই নদী উপত্যকায় প্রাপ্ত পুরানিদর্শন চৌ রাজবংশ আমলের। ঐ যুগের পুরানিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে পশ্চিম সেনসীর ছিশান ও বর্তমান সিআনের ফেং এবং হাও নামক স্থানে দেখা যায়।

চৌ গোষ্ঠীর লোকেরা বহুবার তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করেছে। যখন তাবা তাদের গোষ্ঠীপতি থাই ওয়াং-এর নেতৃত্বে বর্তমান সেনসী প্রদেশের ছিশান জেলাব 'চৌ মালভূমিতে' বসবাস করতে এল তখন থেকে তারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকল এবং তাদের অধিকৃত ভূখণ্ডের নাম দিল চৌ। থাই ওয়াং-এর পুত্র ওয়াং চি এক শক্তিশালী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে শাং রাজা ওয়েন তিং তাকে হত্যা করেন। কচ্ছপের খোলা এবং হাড়ে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে এক সময়ে চৌ রাজ্য শাং রাজবংশের অধীনে এক সামন্ত রাজ্য ছিল।

ওয়াং চি'র পুত্র ছিলেন রাজা ওয়েন। তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে পরাভূত করে সমগ্র ওয়েই নদী উপত্যকা অঞ্চল তার শাসনাধীনে আনেন। তিনি তাঁর রাজধানী ওয়েই নদীর নিম্নভাগে ফেং নামক স্থানে (বর্তমান সিআনের নিকটবর্তী) স্থানান্তরিত করেন এবং তার আধিপত্য বর্তমান কালের শানসী ও হোনান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর পুত্র রাজা উ শাং রাজাকে পরাস্ত করে চৌ বংশ স্থাপিত করেন এবং রাজধানী ফেং থেকে হাওচিং (বর্তমান সিআন)-এ

স্থানান্তরিত করেন। পশ্চিম দিকে রাজধানী স্থানান্তরিত করার জন্য ঐতিহাসিকেরা এই রাজত্বকে পশ্চিম চৌ নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

রাজা উ'র মৃত্যুর পর শাংবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তার ভ্রাতা চৌ কোং পূর্বদিকে এক বিরাট অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের সময়ে তিনি পঞ্চাশটিরও অধিক রাজ্যকে পরাভূত করেন এবং পূর্বদিকে বিদ্যমান শাং ক্ষমতার সব চিহ্ন বিলুপ্ত করে পীতনদী উপত্যকার নিম্ন অববাহিকা পর্যন্ত চৌ গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তার করেন।

চৌ গোষ্ঠীর ক্ষমতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে চৌ কোং নব-অধিকৃত স্থানসমূহ এবং সেখানকার লোকেদের তার নিজ গোষ্ঠীভুক্ত জ্ঞাতি অথবা অন্য গোষ্ঠীভুক্ত অভিজাত ব্যক্তিদের হাতে সমর্পণ করেন। রাজা ওয়েন, রাজা উ ও চৌ কোং-এর পুত্রেরা এবং চৌ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের রাজকুমার অথবা রাজন্য উপাধি দেওয়া হয় এবং তাদের বর্তমান শানসী, হোনান, শানতোং, সেনসী, হোপেই, হুপেই প্রদেশসমূহের নানা স্থানে জায়গীর দেওয়া হয়। তবে, জায়গীরগুলি অধিকাংশ ছিল বর্তমান হোনান প্রদেশভুক্ত। কথিত আছে যে চৌ কোং একাত্তরটি জায়গীর স্থাপিত করেন। চৌ রাজা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য হিসেবে তারা চৌ রাজাদের আদেশ পালন করত এবং চৌ শাসকদের কর প্রদান করত।

পশ্চিম চৌ সময়কালের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে চীনা ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শুরু হয় পশ্চিম চৌ-এর সময়কালে। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে চৌ সমাজ তখনও ছিল দাসব্যবস্থাভিত্তিক সমাজ। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং অদ্যাপি বিদ্যমান লিখিত বিবরণ থেকে পশ্চিম চৌ সমাজের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যায় :

(১) শাং-এর তুলনায় পশ্চিম চৌ-এর সামাজিক উৎপাদন-শক্তি আরও উন্নত ছিল। প্রধানতঃ কৃষির উৎপাদনের অগ্রগতির ক্ষেত্রেই তা প্রকাশ পায়। তাম্রপট্টে খোদিত লিপিতে এবং "*সঙ্গীত কাব্য গ্রন্থ*" ও "*ঐতিহাসিক গ্রন্থ*"তে উল্লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, পশ্চিম চৌ একটি কৃষিপ্রধান সমাজে পরিণত হয়েছিল। ভূমি কর্ষণে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ ফসল উৎপাদন দ্রব্যের এবং চাষবাসের ব্যাপক বিস্তৃতি থেকে দেখা যায় যে,

পশ্চিম চৌ-এর সামাজিক উৎপাদন শক্তির মান শাং-এর তুলনায় আরও উন্নত ছিল। এ কথা বলা যেতে পারে যে, পশ্চিম চৌ-এর শাসনাধীন সব স্থানে উন্নত কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং পীতনদী উপত্যকার অগ্রগতিতে চৌ রাজাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

(২) ঐ যুগের সামাজিক উৎপাদনসম্পর্ক নিশ্চিতরূপে শাং যুগের চেয়েও উন্নত ছিল। তাম্রলিপি এবং "সঙ্গীত-কাব্য গ্রন্থ" এবং "ঐতিহাসিক গ্রন্থ" থেকে আমরা জানতে পারি যে ঐ যুগে শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান ছিল। এই শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে। দেবপুত্র অর্থাৎ রাজা কিছু জমি এবং জমিতে বসবাসকারী লোকেদের রাজকুমারদের প্রদান করতেন। রাজকুমারেরাও অনুরূপভাবে তাদের প্রাপ্ত জমি ও জমিতে বসবাসকারীদের নিজেদের মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করতেন। এইভাবেই উদ্ভব হয় জমি এবং জমিতে বসবাসকারী মানুষদের মালিকানাস্বত্বপ্রাপ্ত একটি ভূস্বামীশ্রেণী। অন্যদিকে, যারা সরাসরি জমি চাষ করত তাদের নিজেদের কোন জমি ছিল না। তারা ভূস্বামীদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমি নিয়ে তা চাষ করত এবং ঐ জমিতে নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য লোকদের ন্যূনতম ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করত, আর রাজা, রাজকুমার ও মন্ত্রীদের জমি বিনা মজুরিতে চাষ করত। ঐ সব সরাসরি জমি চাষকারীরা ভূস্বামীদের কাছ থেকে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেত না। তাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর, শাকসব্জীর বাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা নিজেরাই করত। ভূস্বামীরা ঐ সব ব্যক্তির উপর মালিকানাস্বত্ব বজার রাখতেন।

(৩) পশ্চিম চৌ-এর শ্রেণীবিভাগ প্রথার সঙ্গে জড়িত ছিল জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবার ব্যবস্থা। এই যুগে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক পদ এবং সম্পদের উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা অর্জন করতেন প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র। এই জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি পিতার পদ এবং জমি পেতেন তাঁকে 'জোং জি' অর্থাৎ উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিস নামে অভিহিত করা হত। এইভাবে চৌ গোষ্ঠীর রাজা হতেন চৌ সাম্রাজ্যের 'জোং জি', রাজকুমারেরা হতেন নিজ নিজ রাজ্য বা জায়গীরের 'জোং জি' এবং মন্ত্রীরা হতেন নিজ নিজ পরিবারের 'জোং জি'। বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ঐ সব 'জোং জি' প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পরিমাণের জমির মালিক ছিলেন।

(৪) পশ্চিম চৌ-এর সংস্কৃতি যে শাং আমলের সংস্কৃতির ভিত্তিতে অগ্রগতি লাভ করেছিল তার নিদর্শন আমরা তৎকালীন শিল্পসৃষ্টি এবং ঐ যুগে ব্যবহৃত লিপির আকৃতিতে দেখতে পাই। সাহিত্যের দৃষ্টিতে, "সঙ্গীত-কাব্য গ্রন্থ" এবং "ঐতিহাসিক গ্রন্থে" উল্লিখিত রাজকীয় হুকুমনামা ও উপাখ্যান বর্ণনার ভাষা শাং আমলের তুলনায় উন্নত ছিল। পশ্চিম চৌ বংশের শেষার্ধের কয়েক শত খোদিত তাম্রলিপি আজও বিদ্যমান আছে। প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি চৌ-বাসীদের ধারণা শাং-বাসীদের চেয়েও অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ ছিল।

পশ্চিম চৌ গোষ্ঠীর শেষ শাসক ছিলেন রাজা ইয়ৌ। পশ্চিমাঞ্চলের ছুয়ান রোং নামক এক উপজাতির হাতে তিনি নিহত হলে তাঁর পুত্র রাজা ফিং খৃঃ পূঃ ৭৭০ সালে হাওচিং-এর পূর্বদিকে অবস্থিত লুও-ই (বর্তমানকালের হোনান প্রদেশের অন্তর্গত লুওইয়াং) নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঐ সময় থেকে শুরু হয় পূর্ব চৌ বংশের শাসনকাল। খৃঃ পূঃ ৭৭২ থেকে খৃঃ পূঃ ৪৮১ সালের মধ্যবর্তী সময় চীনের ইতিহাসে 'বসন্ত ও শরৎ সময়পর্ব' নামে খ্যাত হয়ে থাকে। খৃঃ পূঃ ৪০৩ থেকে খৃঃ পূঃ ২২১ সালের মধ্যবর্তী সময় 'যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্ব' নামে খ্যাত। পূর্ব চৌ-এর পাঁচ শত বছর শাসনকালে চীনা সংস্কৃতি যথেষ্ট অগ্রগতি এবং অত্যুত্তম সাফল্য অর্জন করে।

'বসন্ত ও শরৎ' এবং 'যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে' সামাজিক অবস্থা পশ্চিম চৌ-এর তুলনায় লক্ষণীয় উন্নতি লাভ করে। এই উন্নতির বৈশিষ্ট্য হল :

এক, লৌহ আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার যা সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে উন্নত করে তোলে। নির্ভরযোগ্য লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৫১৩ সালে চিন রাজ্যের আইন একটি লৌহনির্মিত ত্রিপদ পাত্রে ঢালাই করে লিখিত হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায়, সুদূর খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই চীন লৌহ ঢালাইয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। এই বিবরণ যে খুবই নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বসন্ত ও শরৎ' সময়পর্বের শেষার্ধে এবং 'যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে' লৌহের ব্যবহার খুব ব্যাপক ছিল। হোপেই প্রদেশের সিংলোং জেলায় বহু পরিমাণে লৌহনির্মিত ঢালাই কাজে ব্যবহৃত ছাঁচ ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে। যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র হোনান প্রদেশের হুইসিয়ান জেলায় বহু কবরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।

লৌহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি এবং ভাল কৃষি ও হস্তশিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি হতে থাকে। তার ফলে কৃষি এবং হস্তশিল্প অগ্রগতি লাভ করে এবং তা ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সেই সঙ্গে রাজকুমারদের দুর্গগুলি শহর ও নগরে পরিণত হতে থাকে। যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে দশ হাজার পরিবার বসবাসকারী শহরের সংখ্যা খুব কম ছিল না। যেমন, ছি রাজ্যের (বর্তমানকালের শানতোং প্রদেশ) রাজধানী লিনজিতে সত্তর হাজার পরিবার বাস করত। ওয়েই রাজ্যের (বর্তমানকালের হোনান প্রদেশ) রাজপথে দিবারাত্রি যানবাহন চলাচল করত। এ সব থেকে জানা যায় আলোচ্য যুগের শ্রীবৃদ্ধি ও সঙ্গতির কথা।

ক্রয়-বিক্রয় প্রথা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যবিনিময়ের উপায় হিসেবে মুদ্রা ব্যবহার প্রচলিত হয়। চীন দেশে মুদ্রা ব্যবহারের ইতিহাস সুদীর্ঘ। কিন্তু, যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বের আগে ব্যাপকহারে ধাতুমুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। ঐ কালের বহু বাণিজ্য কেন্দ্র নিজ নিজ ধাতুমুদ্রা তৈরি করত। এই ধরণের দুই শতটির অধিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

দুই, উৎপাদন-শক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিস্বত্বের প্রথারও পরিবর্তন হতে থাকে। পশ্চিম চৌ কাল থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাই সব জমির মালিকানাস্বত্ব ভোগ করছিল। জমি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। বসন্ত ও শরৎ সময়পর্বের মধ্যভাগ থেকে কিছু কিছু জমি অভিজাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নবোদিত জমিদারশ্রেণী এবং কৃষকদের নিকট হস্তান্তরিত হতে থাকে। পরবর্তী যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে জমি ক্রয়-বিক্রয় একটি সাধারণ ঘটনারূপে পরিণত হয়। নবোদিত জমিদারশ্রেণী রাজকুমার অথবা মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিরাট জমি নিয়ে তা ভূমিকর্ষকদের নিকট ইজারা দিতেন এবং তার পরিবর্তে খাজনা হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণে কৃষি-উৎপাদিত দ্রব্য গ্রহণ করতেন। এই ভাবে ক্রমশঃ জমির খাজনা হিসেবে বাধ্যতামূলক বেগার প্রথার পরিবর্তে দ্রব্যদান প্রথা প্রচলিত হয়। জমির খাজনা প্রথার এই পরিবর্তনের ফলে ভূমিকর্ষকদের উপর ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে।

তিন, উৎপাদন-শক্তির মানোন্নতি কেবলমাত্র ভূমিস্বত্বাধিকারীদের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনে নি, তার সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে অগ্রগতি এনে দেয়। পশ্চিম চৌ-এর অধীনে সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতিক অঞ্চল

ছিল ওয়েইনদী উপত্যকা। বসন্ত ও শরৎ সময়পর্বে সমগ্র পীতনদী উপত্যকা খুব সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত হয়। তৎকালীন ছি (বর্তমানে শানতোং), চিন (বর্তমানে শানসী), চেং (বর্তমানে হোনান প্রদেশের মধ্যভাগ), সোং (বর্তমানে হোনান প্রদেশের পূর্বভাগ), ছিন (বর্তমান সেনসী প্রদেশ), ছু (বর্তমান হুপেই প্রদেশ) ইত্যাদি সামন্তরাজ্যের অর্থনীতিক অবস্থা সমৃদ্ধিলাভ করে। বসন্ত ও শরৎ সময়পর্বের শেষার্ধে উ (বর্তমানকালের চিয়াংসু), ইয়ুয়ে (বর্তমানকালের চেচিয়াং) রাজ্যগুলি যখন ক্ষমতা বিস্তারের জন্য পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল, তখন ইয়াংসি নদীর নিম্ন অববাহিকা চৌ রাজবংশের অর্থনীতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন যুগের সংরক্ষিত বস্তু এবং পুরানিদর্শন অধ্যয়ন করে স্থানীয় অর্থনীতিক অগ্রগতি জানা যেতে পারে। পশ্চিম চৌ কালে যে সকল তাম্র-নির্মিত দ্রব্য ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের অধিকাংশই চৌ-রাজপ্রাসাদের অথবা চৌ-রাজকর্মচারীদের ব্যবহৃত জিনিস ছিল। প্রকৃতপক্ষে সামন্ত রাজাদের ব্যবহৃত ঐ জাতীয় জিনিষ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ পূর্ব চৌ সময়পর্বের প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত দ্রব্যসমূহের অধিকারী ছিলেন সামন্তরাজারা। এ থেকে বসন্ত ও শরৎ সময়পর্বের সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশের কথা জানা যায়।

যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বের মধ্যভাগের পর ছু রাজ্য শাসিত অঞ্চল—বর্তমানকালের হুপেই, হুনান, আনহুই, চিয়াংসু, চেচিয়াং সমগ্র প্রদেশসমূহ এবং শানতোং, হোনান, সিছুয়ান ও কুইচৌ প্রদেশসমূহের আংশিক ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত ছিল। এই রাজ্যের দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ডের অগ্রগতিতে বিরাট অবদান ছিল। ছু রাজ্যের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃতির পরিচয় বিগত কয়েক বছরে আনহুই, হুনান, হুপেই, দক্ষিণ হোনানের ভূগর্ভ থেকে খনন করে প্রাপ্ত ঐ যুগের লিপি খোদিত কাঠ এবং বাঁশের সরু ও লম্বা ফালি থেকে পাওয়া সম্ভব হয়।

ছিন, চাও (হোপেই প্রদেশ) এবং ইয়ান (হোপেই এবং লিয়াওতোং উপদ্বীপ) রাজ্যগুলোও নিজ নিজ রাজ্যের পূর্ববর্তী সীমান্ত ছাড়িয়ে আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ছু রাজ্য সুদূর ইয়ুন্নান পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ছু রাজ্যের সেনাপতি চুয়াং ছিয়াও একটি অভিযান পরিচালনা করে ইয়ুন্নানে যান ও তিয়ান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ অঞ্চলে সর্বপ্রথম মূল ভূখণ্ডের সংস্কৃতি প্রচলন করেন।

চার, স্থানীয় অর্থনীতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত ও শরৎ এবং যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বের রাজনীতিক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। পশ্চিম চৌ-এর অধীনে পীতনদী উপত্যকায় বহু সামন্তরাজ্য ছড়িয়ে ছিল। বসন্ত ও শরৎ সময়পর্বের প্রারম্ভে, অধিকতর শক্তিসম্পন্ন রাজকুমারেরা সেনাশক্তির বলে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাজ্য নিজেদের বশে আনেন। এইভাবে সৃষ্টি হয় ছি, সোং, চিন, ছিন ও ছু এই পাঁচটি শক্তিশালী রাজ্য। পরে এইসব রাজ্য নিজেদের আধিপত্যলাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বসন্ত ও শরৎ এবং যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্ব শুরু হবার অন্তর্বর্তীকালে শক্তিশালী চিন রাজ্য হান (হোনান প্রদেশ), চাও এবং ওয়েই (হোপেই এবং শানসী প্রদেশ) এই তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই তিনটি রাজ্য এবং ছি, ছিন, ছু ও ইয়ান সাতটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয় আর তাদের মধ্যে নিরন্তর পরস্পরের রাজ্য অধিকার ও নিজ-রাজ্যভুক্ত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। সংক্ষেপে, বসন্ত ও শরৎ এবং যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে রাজ্যগুলিকে খণ্ডবিখণ্ড না করে তাদের একীকরণ করাই ছিল সাধারণ প্রবণতা। নবোদিত ভূস্বামীশ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী অভিজাত সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাকামী শাসন শেষ করে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করে। সুতরাং, কোন কোন স্থানে জায়গীর প্রথা বিলোপ করে তার পরিবর্তে প্রিফেক্‌চার এবং জেলা প্রথা প্রচলিত হয়। এই নূতন প্রথায় প্রিফেক্‌চারের গভর্ণর এবং জেলা শাসকরা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তারা সরাসরি রাজার প্রতি দায়ী থাকতেন। ক্রমশঃ, ব্যক্তিবিশেষকে জায়গীর দিয়ে পুরস্কৃত করার পরিবর্তে দ্রব্যবস্তু প্রদান করার প্রথা প্রচলিত হয়।

বসন্ত ও শরৎ এবং যুদ্ধরত রাজ্যসমূহ সময়পর্বের সংস্কৃতি : বসন্ত ও শরৎ সময়পর্বের শেষার্ধে প্রাচীনকালের বিদ্বৎসমাজের বিকাশ লাভ হতে থাকে। কনফুসিয়াস (খৃঃ পূঃ ৫৫২—৪৭৯) ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভাগের একজন সমর্থক। বিদ্যা ও জ্ঞানের সারসংকলন এবং তার বিস্তারের জন্য তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে সামাজিক এবং অর্থনীতিক আলোড়নের তীব্রতা চিন্তাজগতেও গভীরভাবে সাড়া জাগায়। আর তার ফলে নিজ নিজ চিন্তা ব্যক্ত করা এবং তাত্ত্বিক বিতর্কে 'শত-মতবাদের চিন্তাধারা'র সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কনফুসিয়াসপন্থীরা অভিজাত সম্প্রদায়ের

কর্তৃত্বাধীন সমাজের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করে রাজা ওয়েন ও রাজা উ'র (অর্থাৎ পশ্চিম চৌ) ঐতিহ্যকে আদর্শরূপে মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত আচরণবিধি তৈরী করেন এবং শ্রেণীবিভাগ ও পিতৃশাসিতগোত্র-ভিত্তিক সংঘাবাসের মত ব্যক্ত করেন।

মো তি (খৃঃ পূঃ ৪৮০?—৩৯০?) সমর্থকেরা অর্থাৎ মো তি-দর্শনবাদীরা রাজাদের মধ্যে পরস্পর ধ্বংসকারী যুদ্ধ এবং তাদের বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের বিরোধিতা করতেন। মো-পন্থীরা দুর্বলের প্রতি বলশালীর অত্যাচার, গরীবের প্রতি ধনীর ভ্রূকুটি, হীনজাত লোকের প্রতি অভিজাত ব্যক্তির ঘৃণা এবং সরল মনোভাবের মানুষের প্রতি ছলনার আশ্রয় নেওয়ার মতো সব আচরণের সমালোচক ছিলেন। তাঁরা চাইতেন শান্তি, মিতব্যয়িতা, সৌভ্রাত্র এবং পারস্পরিক সাহায্য। তাঁরা নির্যাতিত কৃষক (যাদের মনে তখনও বিদ্রোহী ভাব জাগে নি) এবং ক্ষুদ্র কারিগর ও ব্যবসায়ীদের চিন্তা প্রতিফলিত করতেন।

দার্শনিক লাও জি এবং চুয়াং জি (খৃঃ পূঃ ৩৬৫?—২৯০?)-এর অনুগামীরা — যাদের তাওপন্থী বলা হত — সামাজিক বিবর্তনের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁরা চাইতেন মানুষেরা আদিম যুগের সমাজে ফিরে গিয়ে চিরকাল নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করুক। এই ধরণের দর্শনে ব্যক্ত হয়েছিল অবক্ষয়ী অভিজাত সম্প্রদায়ের মতবাদ।

আইনবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিরা যেমন শাং ইয়াং (খৃঃ পূঃ ৩৯০?—৩৩৮), হান ফেই (খৃঃ পূঃ ২৮০?—২৩৩) ইত্যাদি চাইতেন এক কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র এবং আইনের শাসন। নব্য জমিদারশ্রেণীর রাজনীতিক অভিলাষ তাদের ভাবধারায় ব্যক্ত হয়েছিল।

এই সব বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছিল তৎকালীন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং তাদের স্বার্থের সংঘাত।

আলোচ্য যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল। চীনা জ্যোতির্বেত্তারা প্রধান প্রধান গ্রহনক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরা সূর্য, চাঁদ এবং বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই পঞ্চ গ্রহের সঞ্চারণ গণনা করতে পারতেন। জলানুসন্ধানবিদ্যার যন্ত্রশিল্পী যেমন লি পিং এবং চেং কুও জলসেচন এবং জলাধার তৈরীর ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিকেরা বুঝতে পেরেছিলেন

শুধুমাত্র চীন দেশকে নিয়েই পৃথিবী গঠিত হয় নি। তাঁরা ক্রমশঃ চীন দেশের বাইরে অন্যান্য দেশের ভূগোলও আলোচনা করতে থাকেন। পদার্থ-বিজ্ঞানও উন্নতি লাভ করেছিল। দার্শনিক মো তি রচিত গ্রন্থে রশ্মি এবং বলবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐ যুগে কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। জুও ছিউমিং-রচিত "কনফুসিয়াসের বসন্ত ও শরৎ গ্রন্থের টীকা", "রাষ্ট্রচালনা সম্পর্কে আলোচনা", "যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের ইতিহাস" এবং "বাঁশগ্রন্থের উপাখ্যান" ইত্যাদি যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে লিখিত হয়েছিল। সাহিত্যের বিকাশ আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর্ণনামূলক প্রবন্ধ ছাড়া বহু বৃহৎ তাত্ত্বিক প্রবন্ধও লিখিত হয়েছিল। ছু রাজ্যের প্রতিভাবান কবি ছ্যু ইউয়ান (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৪০—২৭৮)-এর গীতিকাব্যসমূহ এবং ঐ রাজ্যের আরও অন্যান্য কবিদের রচনা — যা সম্মিলিতভাবে "ছু রাজ্যের গাথাসঙ্গীত" নামে খ্যাত এবং সবচেয়ে পুরাতন কাব্য ও গীত সংকলিত গ্রন্থ "কাব্য-গীতিকা গ্রন্থ" চীনা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

২. ছিন, হান, ত্রিরাজ্য, চিন এবং দক্ষিণ রাজবংশ ও উত্তর রাজবংশ (খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)

ছিন রাজবংশ (খৃঃ পূঃ ২২১-২০৭)ঃ ছিন রাজবংশের সর্বপ্রথম সম্রাট শি হুয়াং তি (খৃঃ পূঃ ২৪৬—২১০) খৃঃ পূঃ ২২১ সালে ছয়টি রাজ্য যথা হান, চাও, ওয়েই, ছু, ইয়ান এবং ছি'কে জয় করে আট শত বছরেরও অধিক স্বাধীন এবং বিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোকে উচ্ছেদ করে চীনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং স্বৈরতন্ত্রী সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের আবির্ভাবে ভূস্বামীশ্রেণীর ঐতিহাসিক জয় সূচিত হয়। এই শ্রেণী যুদ্ধরত রাজ্যসমূহের সময়পর্বে জমির মালিকানা অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ সমাজের প্রধান প্রধান অর্থনীতিক শাখাগুলো করায়ত্ত করে। এই সব অধিকার পাবার পর এই শ্রেণী রাজন্যবর্গ কর্তৃক দেশ খণ্ড-বিখণ্ড করা রোধ করে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে একটি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়াসী ছিল।

সম্রাট শি হুয়াং তি পুরাতন সামন্ত জায়গীর প্রথা রদ করে প্রিফেক্চার এবং জেলা স্থাপনার একটি নূতন প্রথা গ্রহণ করেন। তিনি রাজন্যবর্গের ভূমি-মালিকানার প্রথা রদ করে তার স্থানে স্বাধীনভাবে জমি ক্রয়বিক্রয় প্রথা প্রচলন করেন। সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি ওজন ও দৈর্ঘ্যের পরিমাপকে, মুদ্রা-ব্যবস্থাকে, আইন-ব্যবস্থাকে, লেখ্য-ভাষাকে, শকট গাড়ীর চক্রনেমীকে, পোষাক-পরিচ্ছদকে, মাস গণনা ও পঞ্জিকা প্রণয়নে অভিন্ন একক ব্যবস্থায় পরিণত করেন। পূর্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যের প্রাচীর, দুর্গ এবং অবরোধ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। রাজধানী সিয়ানইয়াং (বর্তমানে সেনসী প্রদেশের অন্তর্গত একই নামের শহর) মহানগরীতে পরিণত হয় এবং প্রশস্ত সড়ক ব্যবস্থার দ্বারা সারা দেশের মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জল যানবাহন ব্যবস্থা বর্তমান কুয়াংতোং প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বহু সংখ্যক বাণিজ্য শহর গড়ে ওঠে এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বণিক ও ব্যবসায়ীদের বিনা বাধায় এই সব শহরে যাতায়াত করার সহায়ক হয়।

সদ্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য শি হুয়াং তি রাজ্যের বিভিন্ন লোকের হাতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিল তা সংগ্রহ করে ধ্বংস করান। তিনি তাঁর অধিকৃত ছয়টি রাজ্যের কোন কোন পূর্বতন রাজাদের এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী ব্যক্তিদের সীমান্ত এলাকায় নির্বাসিত করেন ও অন্যান্যদের রাজধানী সিয়ান-ইয়াং-এ বসবাস করতে বাধ্য করেন। পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চিন্তা উৎখাত করার প্রয়াসে খৃঃ পূঃ ২১৩ সালে শি হুয়াং তি প্রকাশ্যে বিরাট সংখ্যক পুস্তক পুড়িয়ে ফেলেন। তবে এই পুস্তক-দগ্ধ যজ্ঞে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং কৃষিশিক্ষা বিষয় পুস্তকসমূহকে রেহাই দেওয়া হয়। আর যে সকল পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীরা নূতন শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন অথবা যারা বর্তমানকে আক্রমণ করে প্রাচীনের প্রশংসা করেন তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয়।

শি হুয়াং তি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সম্রাট (রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২০৯—২০৭) উভয়েই বিবেকহীনভাবে জনগণের শ্রমশক্তি নিজেদের কার্যসাধনে প্রয়োগ করেন। তাঁরা কৃষকদের নিকট থেকে এমনকি দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উৎপাদিত শস্য খাজনা হিসেবে আদায় করেন। এর ফলে কৃষকদের বহু জমি জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। এই সম্রাটদ্বয় ৩00,000 মানুষকে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করতে বাধ্য করান, এবং ৫00,000 লোককে লিংনানে (কুয়াংতোং)

সেনা শিবিরে পাঠান। রাজপ্রাসাদ এবং শি হুয়াং তি'র সমাধি নির্মাণের জন্য ৭০০,০০০ লোক নিয়োগ করা হয় এবং অগণিত লোককে বাধ্যতামূলকভাবে রাস্তা নির্মাণের কাজে নিয়োগ করা হয়। গুরুতর করভার এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদানের ফলে কৃষকেরা নিজেদের জমি চাষ করার সময় পেত না এবং মহিলা-দেরও সুতা কাটা এবং বস্ত্রবয়ন করার অবসর ছিল না। কৃষকদের জীবনযাপন দুরূহ হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, খৃঃ পূঃ ২০৯ সালে ছেন শেং (খৃঃ পূঃ ? — ২০৮) এবং উ কুয়াং (খৃঃ পূঃ ? —২০৮)-এর নেতৃত্বে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী কৃষকেরা কেবলমাত্র নিড়ানি এবং মুগুরের সাহায্যে ছিন রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটায়।

পশ্চিম হান বংশের (খৃঃ পূঃ ২০৬—২৪ খৃষ্টাব্দ) পত্তন এবং তার অগ্রগতি: খৃঃ পূঃ ২০৬ সালে কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনাকারীদের মধ্যে একজন অন্যতম নেতা লিউ পাং (খৃঃ পূঃ ২৫৬—১৯৫) সমগ্র চীনকে একীভূত করে প্রতিপত্তি-শালী হান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাট কাও তি নাম গ্রহণ করেন। তার রাজধানী পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছাংআন (বর্তমানকালের সেনসী প্রদেশের সিআন) নামক স্থানে অবস্থিত থাকাতে ইতিহাসে এই যুগ পশ্চিম হান নামে আখ্যায়িত হয়।

ছিন রাজবংশের শেষার্ধে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হবার ফলেই পশ্চিম হান বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে যে, কৃষক বিদ্রোহ কেবল-মাত্র রাজার শাসন উৎখাত করতে পেরেছে কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবসান ঘটাতে পারে নি। অর্থাৎ কিনা কৃষক বিদ্রোহে বিজেতা অবধারিতভাবে একজন ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছে এবং যথারীতি কৃষকদের শাসন ও শোষণ করেছে। তাই, পশ্চিম হানের সর্বপ্রকার প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ছিন রাজবংশ আমলের অনুকরণ করে আর তাদের উদ্দেশ্যও হয় ভূস্বামীশ্রেণীর সম্পত্তি এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা ও কৃষকদের দমন করা। অন্যদিকে, কৃষক বিদ্রোহের শক্তি দেখে নূতন শাসককেও রাজনীতি এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কৃষকদের কিছু সুবিধা দিতে হয়। এই সকল সুবিধা সমাজের আর্থনীতিক বিকাশের সহায়ক হয়। অর্থনীতিক বিকাশের ভিত্তির উপরই একটি শক্তিশালী ও সম্পদশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের জন্য পশ্চিম হানের শাসকেরা যে সকল

ব্যবসায়ীরা বাজারদর স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে লাগাতে এবং ফটকামূলক কার্যে লিপ্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি দমননীতি গ্রহণ করেন। ব্যবসায়ীদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হয়। সেজন্য ব্যবসায়ীরা এবং ক্ষুদ্র নৃপতিরা স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যোগসাজসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে।

হান রাজবংশের হুই তি থেকে চিং তি (খৃঃ পূঃ ১৯৪—১৪১) রাজত্বের সময়ে স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং কেন্দ্রীয় শাসনের শক্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলে। চিং তি সাতটি রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করে তার সাম্রাজ্যকে আরও ঐক্যবদ্ধ করেন। উ তি'র রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ১৪০—৮৭) পশ্চিম হান রাজবংশের ক্ষমতা উচ্চ শিখরে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাধীন রাজনীতিক ব্যবস্থার সমর্থনকারী কনফুসিয়াসবাদের প্রসার ঘটতে থাকে এবং অন্যান্য বিরোধী ভাবধারার বিরোধিতা করা হয়। রাজকীয় বিদ্যালয়গুলোতে কনফুসিয়াস প্রণীত পঞ্চশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত হয় এবং কনফুসিয়াসবাদ চীন দেশের একটি ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়।

পশ্চিম হান রাজবংশের রাজত্বের প্রথম কয়েকটি বছরের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। উ তি'র রাজত্বকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হলে এবং স্থানীয় সামাজিক আর্থনীতির সব বাধানিষেধ কেটে গেলে ভূস্বামীশ্রেণী এবং ব্যবসায়ীরা আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে ক্রমশঃ এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কারিগরী শিল্প যা তখনও হস্তশিল্পের পর্যায়ে ছিল তার সম্প্রসারণ হতে থাকে এবং ব্যবসায়ীরা লৌহ ঢালাই ও লবণ উৎপাদনে ব্যাপৃত থেকে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হয়ে ওঠে। কোন কোন ব্যবসায়ী পরিবার হাজারাধিক লোক নিয়োগ করত। ছাংআনে এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে নামকরা লৌহ-কারখানা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও কয়েকটি সরকারী শিল্প সংস্থা ছিল যেমন সিছুয়ানের 'স্বর্ণ এবং রৌপ্য কারখানা', ছাংআনের 'পূর্ব ও পশ্চিম বস্ত্রবয়ন কারখানা' এবং ছি-এর 'তিন ঋতুর সুতীবস্ত্র কারখানা'। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিনিয়োগ করে এই সকল কারখানা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ এবং শিল্প কৌশল উভয় দিক থেকে তাম্র ঢালাই, লাক্ষা, কাষ্ঠ ও বাঁশের কাজ,

সূচিশিল্প, রঞ্জনকার্য ও মদ চোলাই ইত্যাদি দ্রব্য তৈরীর মান পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়।

কারিগরী শিল্পের অগ্রগতি ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে। রাজধানী ছাংআন তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র নগরে পরিণত হয়। ছাংআন ছাড়া লুওইয়াং (বর্তমানকালের হোনান প্রদেশের অন্তর্গত), ছেংতু (সিছুয়ান প্রদেশে), হানতান (হোপেই প্রদেশে), লিনজি (শানতোং প্রদেশে) এবং নানইয়াং (হোনান প্রদেশে) কর্মমুখর এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। নগর ও শহরের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ফটকা এবং তেজারতী কারবারে লিপ্ত থাকত। আর মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের মালিকানাধীন দোকান খুলে কম মূল্যে পণ্যদ্রব্য খরিদ করে বেশি দামে বিক্রয় করত। বহু সংখ্যক যানবাহন ও নৌকা দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে পণ্যদ্রব্য বহন করে যাতায়াত করাতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নিবিড় অর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সবদিক থেকে সামাজিক আর্থনীতিক বিকাশের ফলে দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। উ তি'র রাজত্বকালে পশ্চিম হান বর্তমান কালের কুয়াংতোং, ফুচিয়ান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রিফেক্চার স্থাপিত করে এবং এই সকল অঞ্চলের ওপর শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করে। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দীর্ঘকাল ধরে সিয়োংনু জাতিগোষ্ঠীর হামলার প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী এবং বৃহৎ আকারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উ তি'র রাজত্বকালের শুরু (খৃঃ পূঃ ১৪০) থেকে সুয়ান তি'র রাজত্বের (খৃঃ পূঃ ৭৩—৪৯) শেষার্ধ এই নব্বুই বছর পর্যন্ত সিয়োংনুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলে। দুই জন খ্যাতিমান সেনাপতি ওয়েই ছিং (খৃঃ পূঃ ?—১০৬) এবং হুও ছ্যুপিং (খৃঃ পূঃ ?—১১৭)-এর নেতৃত্বাধীন পশ্চিম হানের সেনাবাহিনী সিয়োংনুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করে। খৃঃ পূঃ ৫১ সালে সিয়োংনু আত্মসমর্পণ করে পশ্চিম হানের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং উত্তর সীমান্তে হামলা করা থেকে বিরত থাকে।

ইতিপূর্বে সিয়োংনু চীন দেশের পশ্চিমাঞ্চলের (অর্থাৎ হান যুগের বর্তমান কানসু প্রদেশের ইয়ুমেনকুয়ান গিরিপথের পশ্চিম দিকে অবস্থিত সমগ্র অঞ্চল) বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল। এই সকল রাজ্য নিজের

অধিকারে আনার জন্য উ তি খৃঃ পূঃ ১৩৮ সালে চাং ছিয়ানকে (খৃঃ পূঃ ? —১১৪) এই অঞ্চলে দূতালি করতে পাঠান। চাং ছিয়ান আবিষ্কার করেন যে এই সুদূর অঞ্চলে বহু সম্পদশালী দেশ রয়েছে। খৃঃ পূঃ ১২১ সালে পশ্চিম হানের সেনাবাহিনী এই পশ্চিমাঞ্চলে যাবার জন্য বর্তমানকালের কানসু প্রদেশের মধ্য দিয়ে সংযোগস্থাপক রাস্তা তৈরী করে এবং পরে, উ সুনবাসীদের সমর্থন লাভ করে পশ্চিম হান সেনাবাহিনী থিয়ানশান পর্বতমালার উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে সিয়োংনুর শাসন ধ্বংস করে ঐ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে পশ্চিম হান বংশের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যে পরিণত করে। তখন থেকে চীন এবং মধ্য-এশিয়ার বণিকেরা চীনা পণ্যদ্রব্য, বিশেষ করে রেশম সুদূর পশ্চিমের দেশসমূহে যেমন তা ইউয়ান, খাং চ্যু, তা সিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে রপ্তানি আর ঐ সকল দেশে উৎপাদিত পশ্চিম হানের শাসকদের ও মধ্যসমভূমির লোকেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে থাকেন। সিয়োংনুদের পরাজিত করার পর এবং পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবার পর পশ্চিম হান রাজবংশ তার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উপনীত হয়।

পশ্চিম হান রাজবংশের রাজত্বকালীন ভূমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে উদ্ভূত অবস্থা এবং কৃষক বিদ্রোহ: হান রাজবংশের ইউয়ান তি'র রাজত্বের (খৃঃ পূঃ ৪৮—৩৩) অর্ধ শতাব্দী পর থেকে পশ্চিম হান রাজবংশের পতন শুরু হয়; রাজদরবারে দুর্নীতি দেখা দেয়, এবং রাজপরিবারের * মহিলাদের আত্মীয়স্বজন ও সম্রাটের প্রিয় মন্ত্রীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁরা তহবিল আত্মসাৎ, বলপ্রয়োগ, চুরি, ঘুষ এবং রাজদরবার প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন।

উ তি'র রাজত্বকালে এবং তার পরেও বিভিন্ন প্রকার করধার্য করা হয় যা লোকেদের বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভূমি-রাজস্ব, মাথাপিছু ধার্য-কর, সেনা-কর, তৃণ ও খড়-কর, বাণিজ্যিক ও সম্পদ-কর এবং উ তি কর্তৃক স্থাপিত লবণ ও লৌহর একচেটিয়া উদ্যোগগুলো থেকে সম্রাটের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ হত কোটি কোটি মুদ্রা। কর প্রদান ছাড়াও প্রত্যেক কৃষককে বৎসরে

*. সম্রাটের মাতা, পত্নী, প্রিয় উপপত্নী নিয়ে গঠিত।

নব্বুই দিন বেগার খাটতে হত। এই ধরণের নির্মম শোষণের ফলে কৃষকেরা তাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

খৃঃ পূঃ প্রায় ৫০ সালের নিকটবর্তী সময়ে ভূমি মালিকানা সমস্যা যার আগেই সমাধান হওয়া উচিত ছিল তা একটি ভয়ংকর পরিস্থিতি ধারণ করে। পশ্চিম হান সরকার সব অনাবাদী জমি এমনকি রাজকীয় উদ্যানের পার্শ্ববর্তী সরকারী জমিও কৃষকদের চাষ করতে দিতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন এবং তার সঙ্গে তেজারতি সুদখোরদের শোষণে গ্রামীণ অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে। অথচ সারা দেশে রাজকর্মচারী এবং ভূস্বামীদের হাজার হাজার মু* বিশিষ্ট জমিদারী নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল। একবার, সম্রাট তার একজন প্রিয় মন্ত্রীকে ২০০,০০০ মু জমি দান করেন।

২য় খৃষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী তখন চীন দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি, এবং চাষবাসের জন্য জমির পরিমাণ ছিল ৮০লক্ষ মু। নিরন্তর শোষণের ফলে বহু কৃষক ভূমিহীন ও গৃহহারা ব্যক্তিতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। অনেকে গবাদি পশুর সঙ্গে বিক্রীত হয়, আবার অনেকে নিজেদের বিক্রয় করে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের অধীনে পোষ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা এক লক্ষর অধিক ছিল। এরা কোন উৎপাদনের কাজ করত না। এদের প্রতিপালন করা কৃষকদের এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামের অবস্থার এমন অবনতি হয়েছিল যে অনেক কৃষক ক্রীতদাস হওয়াকে সৌভাগ্য বলে মনে করতেন, কারণ এইসব খাদ্যশস্য-উৎপাদনকারী কৃষকদের বুভুক্ষু অবস্থায় থাকতে হত। অথচ, কৃষকদের বঞ্চিত করে সম্রাট, ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা খাদ্যশস্য ঘোড়াকে খাওয়াতেন।

খৃঃ পূঃ ৩০ সালে, জলপ্লাবন এবং খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিস্তীর্ণ গ্রাম্য এলাকাকে গ্রাস করলে কৃষকেরা এবং কারিগরী-শিল্পীরা বিদ্রোহ শুরু করেন। বিদ্রোহ দমন করা হয় বটে, কিন্তু সামাজিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়। একটি দুর্ভিক্ষের বছরে ছাংআনের পার্শ্ববর্তী জেলায় অর্ধ কিলোগ্রাম সোনার (মূল্য

* চীনের ইতিহাসে বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন যুগে ওজন এবং পরিমাণের কোন এক নিশ্চিত মাপ ছিল না। বর্তমান মান অনুযায়ী এক মু জমির সমান হল ০.০৬৬৬ হেক্টর বা ০.১৬৪৭ একর।

প্রায় ১০,০০০ মুদ্রা) পরিবর্তে পাঁচ শেং* মটরডাল বিক্রীত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা মরিয়া হয়ে ওঠে।

সামাজিক দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার পরিস্থিতি প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে এবং বিপদগ্রস্ত ভূস্বামীদের শাসন রক্ষার জন্য রাজপরিবারভুক্ত একজন মহিলার আত্মীয় ওয়াং মাং (খৃঃ পূঃ ?—২৩ খৃষ্টাব্দ), যিনি অনধিকারভাবে রাজসিংহাসন দখল করেছিলেন, ৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কারমূলক কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন: (১) সম্রাটকেই করা হয় ভূমির একমাত্র অধিকারী এবং ব্যক্তিগত জমি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়; (২) ব্যক্তিগত ক্রীতদাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়; (৩) ছাংআন এবং পাঁচটি প্রধান শহরে (লুওইয়াং, হানতান, লিনজি, নানইয়াং এবং ছেংতু) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং কৃষকদের স্বল্প সুদে টাকা ধার দেবার জন্য কয়েকজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হয়; (৪) ব্যবসায়ীদের ফটকা নিয়ন্ত্রণের জন্য লবণ, লৌহ, মদ এবং আরও তিনটি দ্রব্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়; এবং (৫) মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থায় সংস্কার করা হয়। আসল কথা, ওয়াং মাং-এর এই সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি কিছু চাপ সৃষ্টি করা এবং তৎকালীন সামাজিক উত্তেজনা প্রশমিত করা।

কিন্তু, যেহেতু ওয়াং মাংকে তার সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করাতে ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্ভর করতে হয়, সেহেতু তার পরিকল্পিত নীতি ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। ফলে কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি হয় আর গরীব কৃষকদের পক্ষে তা সহ্যের সীমার বাইরে যায়। ২২ খৃষ্টাব্দে, ইয়াংসি নদী এবং পীতনদীর অববাহিকা অঞ্চলে সিনশি, ফিংলিন, লাল-ভ্রূ এবং তাম্র-ঘোড়া নামে পরিচিত কয়েকটি দলের নেতৃত্বে পরপর কয়েকটি অভ্যুত্থান হয়। কৃষক-সেনাবাহিনী রাজধানী নগরে প্রবেশ করতে কৃতকার্য হয় এবং তারা ওয়াং মাং-এর সরকারকে উৎখাত করে।

পূর্ব হান রাজবংশের (২৫—২২০ খৃষ্টাব্দ) উত্থান এবং তার অগ্রগতি: যখন কৃষক বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল তখন লিউ সিউ (খৃঃ পূঃ ৫—৫৭ খৃষ্টাব্দ) নামে হান রাজবংশভুক্ত একজন ভূস্বামীর পুত্র হোনান প্রদেশের নানইয়াং-এ একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী জড়ো করেন। তিনি বিদ্রোহী কৃষক

* এক শেং প্রায় ০.০২৮ বুশেল।

সেনাদের দমন করেন এবং যে সকল স্থানীয় নেতারা অরাজকতার সুযোগ গ্রহণ করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেছিল তাদের উৎখাত করেন। ২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লুওইয়াং-এ তার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করে পুনরায় হান রাজবংশের শাসন কায়েম করেন। রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত থাকায় চীনা ইতিহাসে এই রাজবংশ পূর্ব হান রাজবংশ নামে অভিহিত হয়।

লিউ সিউ সম্রাট কুয়াং উ তি নামে পরিচিত। তিনি ভূমি-কর সম্পূর্ণ আদায় করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং সেজন্য সারাদেশে নূতন করে জরিপ করার আদেশ দেন। তিনি সকল ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য আদেশ জারী করেন যাতে যেসব কৃষকেরা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিল তারা পুনরায় কৃষিকাজে নিয়োজিত হতে পারেন। ভূস্বামীশ্রেণীর বাধাদানের ফলে এই আদেশ পুরোপুরিভাবে ফলপ্রসূ হয় নি। কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকেরা ভূস্বামীদের কিছু সুবিধা দান করতে বাধ্য করান। ফলস্বরূপ, সম্রাট মিং তি'র শাসনকালে (৫৮–৭৫ খৃষ্টাব্দে) সামাজিক আর্থনীতি উন্নতি লাভ করে, এবং বহু পরিত্যক্ত জলাশয় পুনরুদ্ধার করা হয়। যেমন, বর্তমানকালের হোনান প্রদেশের রুনান নামক স্থানে পুকুর খনন করে যে জলসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তা ২00 কিলো-মিটার বিস্তৃত ছিল। এই ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য এক বছরে খরচা হয় তিন কোটি মুদ্রা। ইয়াংসি নদী উপত্যকা পশ্চিম হান যুগ থেকে আরও উন্নতি লাভ করে, এবং কৃষি মোটামুটি ঐ যুগের মতনই সমৃদ্ধিলাভ করে।

হস্তশিল্প উৎপাদনের কৌশল উন্নত হয় এবং লৌহ গলানো ও ঢালাইয়ের কাজে হাপর চালনার জন্য জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম হান যুগে প্রচলিত অন্যান্য হস্তশিল্পও এই যুগে আরও উন্নতি লাভ করে। প্রধানতঃ শ্রম বিভাজনের জন্য এই সব শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ববর্তী যুগ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি লাভ করে। কোরিয়া দেশের লাক লাং নামক স্থানের ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি লাক্ষার পেয়ালায় খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, এই সব পেয়ালা তৈরি করে তাদের পূর্ণ রূপ দিতে বহু কারিগর নিয়োজিত হয়েছিল।

আলোচ্য যুগে বহু নূতন জিনিষ উদ্ভাবিত হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১০৫ খৃষ্টাব্দে ছাই লুন কর্তৃক কাগজ তৈরি। চীনামাটি দিয়ে জিনিষ তৈরির কাজও এই যুগে শুরু হয়।

শহর ও নগরগুলোও পশ্চিম হান যুগের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধিলাভ

করে। রাজধানী লুওইয়াং রাজনীতিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ছাং'আনের স্থান দখল করে নেয়। নূতন শাসকের আমলে পশ্চিম হানের সময়কার নগরগুলোও অগ্রগতি লাভ করতে থাকে, কুয়াংচৌ শহরের ফানইয়ু এবং কুয়াংতোং প্রদেশের স্যুওয়েন বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উপকূলবর্তী বন্দরে পরিণত হয়।

পূর্ব হান রাজবংশের শুরুর কয়েকটি বছরের মধ্যে সিয়োংনু উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়। উত্তর সিয়োংনু গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার জন্য দক্ষিণ সিয়োংনু গোষ্ঠী পূর্ব হানের সঙ্গে হাত মেলায়। ৭৩ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব হানের সেনাবাহিনী উত্তর সিয়োংনু গোষ্ঠীকে পরাজিত করে পশ্চিম অঞ্চলের দিকে যাবার পথ পুনরায় উন্মুক্ত করে। পরবর্তী দশাধিক বৎসরের মধ্যে পূর্বে বারবার সিয়ানপেই জাতি এবং দক্ষিণে পূর্ব-হানের আক্রমণের ফলে উত্তর সিয়োংনুর বিভিন্ন দল ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। কয়েকটি দল পূর্ব-হান রাজবংশের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় আর কয়েকটি দল সিয়ানপেইয়ের বশ্যতা স্বীকার করে। আর অন্যান্য কয়েকটি দল নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে আরও পশ্চিমে চলে যেতে বাধ্য হয়।

যখন পূর্ব হান রাজবংশ এবং উত্তর সিয়োংনুদের মধ্যে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন পূর্ব হান রাজবংশ পান চাও (৩৪—১০২) নামে একজন কর্মচারীকে রাজনৈতিক দূতালির উদ্দেশ্যে পশ্চিম অঞ্চলে পাঠান। পান চাও-এর আগমনে পশ্চিম অঞ্চল পুনরায় চীনের ইতিহাসের পাতায় আবির্ভাব হয়। পূর্ব-হান রাজবংশের প্রতিপত্তির জন্য পান চাও ঐ অঞ্চলকে পূর্ব-হানের শাসনাধীনে আনতে সমর্থ হন, এবং এই অঞ্চল দিয়ে চীনা ব্যবসায়ীরা পুনরায় বাণিজ্য শুরু করে। ৯৭ খৃষ্টাব্দে পান চাও কান ইংকে তা ছিন (রোম)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার জন্য দূতরূপে পাঠান। কান ইং সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত যেতে সমর্থ হন।

শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, হলুদ পাগড়ীদের অভ্যুত্থান এবং পূর্ব-হান রাজবংশের পতন: সিয়োংনুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার জন্য বহু সংখ্যক লোকবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয় অথবা কায়িক শ্রমদান করতে বাধ্য করা হয়। তার ফলে কৃষকেরা প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়েন। যুদ্ধের সময়ে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত-দ্রব্য অথবা ব্যবসায়ীদের পণ্যবিনিময় দ্বারা প্রাপ্ত প্রচুর সম্পদ থেকে

কৃষকেরা কোন ভাগ পেতেন না। এই সব দ্রব্য এবং সম্পদ অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, রাজকর্মচারী, ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ীদের হস্তগত হত এবং তা দিয়ে এই সব ব্যক্তিরা কৃষকদের জমি থেকে অধিকারচ্যুত করার কাজে ব্যবহার করত।

গ্রামীণ আর্থনীতি ধ্বংস হবার ফলে পূর্ব-হান রাজবংশের পক্ষে সামন্তরাজ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং, দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের শুরুতে পূর্ব-হান কর্তৃক পরাজিত পশ্চিমের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং উপজাতিসমূহ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কানসু এবং ছিংহাই প্রদেশের পর্বতের পাদদেশে বসবাসকারী ছিয়াং নামে যাযাবর জাতির লোকেরা সর্বপ্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। তারা পশ্চিম অঞ্চলে যাবার কানসু সংযোগ পথ অবরোধ করে। অচিরেই পূর্ব-হান রাজবংশ সংকটের সম্মুখীন হয়। পূর্ব-হান এবং ছিয়াং উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হয়। ছিয়াংদের বশীভূত করা হয় বটে তবে সামরিক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর ফলে লোকেদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে এবং তারা দরিদ্রাবস্থায় পতিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে যে দুঃস্থ অবস্থার সৃষ্টি হয় পূর্ব হান তা কাটিয়ে উঠতে পারল না। আরও কয়েকটি যুদ্ধের ফলে অর্থনীতিক অবস্থা আরও সংকটময় হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। পূর্ব হান রাজবংশ পতনের মুখে যেতে থাকে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজপরিবারভুক্ত মহিলাদের আত্মীয়েরা এবং রাজপ্রাসাদের খোজা-পুরুষেরা সত্যিকারের ক্ষমতা হস্তগত করে বিভিন্ন ঘোঁট পাকায়। তাদের মধ্যে সরকারী ক্ষমতা দখল করার জন্য সংগ্রাম খুব তীব্র হয়ে ওঠে। তারা প্রকাশ্যে ঘুষ নিতে থাকে ও তহবিল তছরূপে লিপ্ত হয় এবং আইন ভ্রষ্ট করে। তারা দরিদ্রদের শোষণ করতে থাকে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক শিবিরভুক্ত ধনী সদস্যদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আদায় করে। তারা শুধু রাজকোষের অর্থই চুরি করত না, ভ্রমণকারীদের অর্থও লুণ্ঠন করত। তারা বহু দক্ষ এবং গুণীব্যক্তিদের সরকারী পদ থেকে সরিয়ে দেয়। এই সবের ফলে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম খুব তীব্র আকার ধারণ করে।

অভিজাত পরিবারের ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীরা, বিশেষ করে নিম্ন-পদাধিকারী কর্মচারীরা এবং রাজকীয় বিদ্যায়তনের ছাত্রেরা খোজা-পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত হতেন। এই সকল ব্যক্তিরা তাদের সকলের শত্রুর বিরোধিতা করার

জন্য মিলিত হয়ে একটি রাজনৈতিক সংঘ গঠন করেন। কথিত আছে যে ছাত্রেরা "উচ্চ রাজকর্মচারীদের এবং রাজমন্ত্রীদের সমালোচনায় লিপ্ত হন"। তাঁরা খোজা-পুরুষদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন এবং কয়েক হাজার ছাত্রদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং রাজপ্রাসাদে গিয়ে সম্রাটের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করে খোজা-পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অনুরোধ জানান। এই সংগ্রাম হয় ক্ষণস্থায়ী। কারণ, খোজা-পুরুষেরা প্রবল দমন-নীতির আশ্রয় নেয়। শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং হাজার হাজার ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলাকালে বৈরিতামূলক শ্রেণী-দ্বন্দ্বও প্রতিদিন তীব্র হতে থাকে। কৃষকেরা নিরন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে থাকেন। অবশেষে ১৮৪ খৃষ্টাব্দে, চাং চিয়াও (? —১৮৪)-এর নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী হলুদ পাগড়ীদের উত্থান সংঘটিত হয়। যদিও পরিণামে এই বিদ্রোহ ভূস্বামীশ্রেণীর সেনাবাহিনী চূর্ণ করে দেয়, তবুও অবশিষ্ট হলুদ পাগড়ীদের দল এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অন্যান্য সশস্ত্র কৃষকদল মিলিত হয়ে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। তার ফলে অতি সত্বর পূর্ব-হান রাজবংশের পতন হয়।

পশ্চিম এবং পূর্ব-হান রাজবংশদ্বয়ের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান: পশ্চিম এবং পূর্ব-হান রাজবংশদ্বয়ের আমলে চীনের সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিমা ছিয়ান (খৃঃ পূঃ ১৪৫—?) প্রণীত "ঐতিহাসিক বিবরণপঞ্জী" জীবনী রচনাতে একটি নূতন রীতি শুরু করে, এবং পান কু (৩২—৯২ খৃষ্টাব্দ) প্রণীত "হান রাজবংশের ইতিহাস" রাজবংশসমূহের কালক্রম অনুযায়ী ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করার রীতি শুরু করে। এই দু'টি রীতি পরবর্তী দু' হাজার বছরে চীনের প্রত্যেকটি রাজবংশের ইতিহাস রচনার আদর্শরূপে গৃহীত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দু'জন যশস্বী ব্যক্তি যথা সিমা সিয়াংরু (খৃঃ পূঃ ১৮০—১১৮) এবং চাং হেং (৭৮—১৩৯ খৃষ্টাব্দ)-এর আবির্ভাব হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দার্শনিক ওয়াং ছোং (২৭—?) সাহসিকতার সঙ্গে তৎকালীন রাজদরবারে প্রচলিত কুসংস্কারমূলক চিন্তার সমালোচনা এবং আক্রমণ করেন। হান রাজবংশের আমলে তৈরি পাথরের ওপর খোদাই-করা মানুষের মূর্তি, কবরস্থানে পাথরের খোদাই-কাজ এব৲ লাক্ষা-নির্মিত বস্তুর উপর চিত্রাঙ্কন

শিল্পের ক্ষেত্রে চীনের উল্লেখযোগ্য অবদান। চাং হেং নামে একজন বৈজ্ঞানিক জলশক্তি চালিত জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় যন্ত্র, ভূকম্পমান যন্ত্র এবং হাওয়ার গতি নির্ণয় যন্ত্র ইত্যাদি উদ্ভাবন করেন। চুম্বক-পাথরের দিক্‌নির্ণয় করার গুণও পূর্ব-হান রাজবংশের প্রথমার্ধে আবিষ্কৃত হয়। এই সব উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার পশ্চিম এবং পূর্ব-হান রাজবংশদ্বয়ের সময়পর্বে জ্যোতির্বিদ্যা এবং কাল-গণনা পদ্ধতির অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে।

ত্রিরাজ্যের আবির্ভাব থেকে পশ্চিম চিন কর্তৃক ঐক্যসাধন পর্যন্ত: হলুদ পাগড়ীদের বিরাট উত্থানের সময়ে ভূস্বামীরা তাদের নিজেদের সেনাবাহিনী সংগঠন করে। এই সশস্ত্র দলগুলো একদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা করে কৃষকদের নিধন করত, আরেকদিকে প্রায়ই পারস্পরিক নিধনের যুদ্ধেও লিপ্ত থাকত। শেষ পর্যন্ত এঁদের মধ্যে তিনজন নেতা টিকে থাকতে পারেন, এবং তাঁরা হলেন তিনটি ভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ছাও ছাও (১৫৫—২২০) পীতনদী উপত্যকা অধিকার করে ওয়েই রাজ্য (২২০—২৬৫) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার রাজধানী হয় লুওইয়াং ; লিউ পেই (১৬১—২২৩) অধিকার করেন সিচুয়ান এবং প্রতিষ্ঠিত করেন শু রাজ্য (২২১—২৬৩), ছেংতু হয় তার রাজধানী ; এবং সুন চ্যুয়ান (১৮২—২৫২)-এর অধিকারে আসে ইয়াংসি নদীর মধ্য ও নিম্নভূমিখণ্ড এবং তিনি প্রতিষ্ঠা করেন উ রাজ্য (২২২—২৮০), তার রাজধানী হয় নানচিং। সেজন্য চীনের ইতিহাসে ২২০ থেকে ২৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় ত্রিরাজ্যের সময়পর্ব বলে আখ্যায়িত হয়। ২৮০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম চিন উ রাজ্যকে পরাজিত করলে এই সময়পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব-হান রাজবংশের শেষার্ধে সমরনায়কদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধের ফলে চীনা অর্থনীতি ও সংস্কৃতির লালন স্থান পীতনদী উপত্যকা চরম দুর্দশায় উপনীত হয়। একদা জনাকীর্ণ গ্রামসমূহ জনশূন্য পতিত জমিতে পরিণত হয় ; এবং একদা সমৃদ্ধিশালী নগর ও শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হাজার হাজার কৃষকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয় অথবা তাঁরা ক্ষুধা, ব্যাধি ও মহামারীতে মারা যান এবং জনসংখ্যা পশ্চিম এবং পূর্ব-হান রাজবংশদ্বয়ের সময়পর্বের চেয়ে অনেক হ্রাস পায়।

অবিরাম যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও ত্রিরাজ্যের সময়পর্বে গ্রামীণ আর্থনীতি ক্রমশঃ স্বাভাবিক হতে থাকে। এই তিন রাজ্যের শাসকেরা, বিশেষ করে ওয়েই রাজ্যের

ছাও শাসক, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনীকে জমি চাষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার একটি রীতি প্রবর্তন করেন। একই কারণে হস্তকৃত সামরিক-দ্রব্য উৎপাদন শিল্প বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে। যেমন, শু রাজ্যের প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী এবং কুশলী সমরবিদ্যা বিশারদ চুকে লিয়াং (১৮১—২৩৪) এমন একটি ধনুক তৈরী করেন যা একই সঙ্গে দশটি তীর নিক্ষেপ করতে পারত। তিনি খাদ্যশস্য বহন করার জন্য 'কাঠের বলদ এবং ধাবমান ঘোড়া' নামে এক ধরণের হাল্কা শকটেরও উদ্ভাবন করেন। ওয়েই রাজ্যের মা চুন পাথরের গোলা নিক্ষেপ করার জন্য উন্নত ধরণের কামানবাহী যান তৈরী করেন। উ রাজ্যের শাসক সুন ছুয়ান বড় বড় জাহাজ তৈরী করে ১০,০০০ মানুষ বহন করে দক্ষিণ সাগর এবং লিয়াওনিং উপদ্বীপে পাড়ি দেবার জন্য এক পোত-বহর সংগঠিত করেন। মা চুন উদ্ভাবিত উন্নত ধরণের বয়নশিল্পের তাঁত উত্তর চীনেও ব্যবহৃত হতে থাকে। সিছুয়ানে, লবণ তৈরির জন্য লোনা জল জ্বাল দিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্য এবং গদ্য-কবিতা উন্নত স্তরে উপনীত হয়। ছাও ছাও এবং তাঁর পুত্র ছাও চি (১৯২—২৩২) এবং চিয়ানআন যুগের (১৯৬—২২০) 'সাত-বিশিষ্ট পণ্ডিত' যথা খোং রোং, ছেন লিন, ওয়াং ছান, স্যু কান, রুয়ান ইয়ু, ইং ইয়াং এবং লিউ চেন সাহিত্যের দিশারী বলে গণ্য হন। অবশ্য, চিন্তার জগতে প্রধান স্থান অধিকার করে নেয় কনফুসিয়াসবাদ। তবে অধিবিদ্যামূলক প্রকৃতিবাদ অধ্যয়নের প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় আর তাতে প্রকাশ পায় ভূস্বামীশ্রেণীর বাস্তবকে এড়িয়ে চলার প্রবৃত্তি।

সামাজিক আর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে পীতনদী (হুয়াং-হো) উপত্যকায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত অগ্রগতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে, সিমা পরিবারের নেতৃত্বে ভূস্বামীশ্রেণীর এক অংশ একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। সিমা পরিবারগোষ্ঠী শু এবং ওয়েই রাজ্য দুটি জয় করে চিন রাজবংশ (২৬৫—৩১৬) প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে, ২৮০ খৃষ্টাব্দে উ রাজ্যও পরাভূত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিরাজ্য সময়পর্বে দেশবিচ্ছেদের পরিস্থিতির অবসান ঘটে এবং পুনরায় একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ একই বছরে যখন সিমা ইয়ান যিনি ইতিহাসে চিন সম্রাট উ তি (২৩৬—২৯০) নামে পরিচিত, উ রাজ্য জয় করেন তখন ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তিত

হয়। এই প্রথা অনুযায়ী কৃষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণের জমি বণ্টন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হয় ভূমিহারা কৃষকদের পুনর্বাসন করা। কৃষকেরা তখন জমি চাষ, নির্দিষ্ট পরিমাণ কর-প্রদান এবং বিভিন্ন ধরণের শ্রমদান করতে বাধ্য হন।

অবশ্য একথা ঠিক যে, ভূমি বণ্টন প্রথা প্রবর্তনের ফলে অধিকাংশ কৃষক কিছু না কিছু জমি পান। এর ফলে দেশে অনিশ্চিত ভাব দূর হয় ; কথিত আছে যে সাধারণ লোকেরা ২৮০ থেকে ২৯০ সালের এই এক দশকে সুখে এবং পরি-তৃপ্তিতে জীবনযাপন করে। তা সত্ত্বেও, প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা জমি অধিকারের কাজে লিপ্ত থাকে এবং এইরূপে তারা ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ব্যর্থ করে দেয়। উ তি'র নেতৃত্বে শাসকশ্রেণী ভোগবিলাস ও নিকৃষ্ট ধরণের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে কৃষকদের সম্পদ শোষণ করে উচ্ছৃংখলতাপূর্ণ জীবন কাটাতে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী "ঐ যুগের বিলাসবহুলতার জন্য অপচয় প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও হার মানিয়েছিল।"

চিন রাজবংশ কর্তৃক সারাদেশের ঐক্যসাধন অচিরেই সমাপ্ত হয়। সম্রাট উ তি'র মৃত্যুর পর অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য তীব্র লড়াই শুরু হয়। এর ফলে যে পরস্পর ধ্বংসকারী যুদ্ধ শুরু হয় তা ১৮ বছর ধরে চলে, আর তা চীনা ইতিহাসে "আট রাজার বিশৃংখলা" নামে খ্যাত। এই ১৮ বছরের যুদ্ধে পীতনদীর নিম্ন-অববাহিকায় রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধে চিন রাজবংশের মনোবল ভেঙ্গে যায় ও তার প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

ষোল রাজ্য: ৩০৪ থেকে ৪৩৯ সালের মধ্যে চীন দেশের উত্তর ভূখণ্ডে বিপুলভাবে ধ্বংসলীলা চলে। সিয়োংনু গোষ্ঠী চিন রাজবংশকে উৎখাত করার পর চিয়ে. সিয়ানপেই, তি এবং ছিয়াং উপজাতিরা একের পর এক চীনের মধ্য ভূখণ্ড দখল করে নেয়, এবং অন্যান্য কয়েকটি উপজাতি সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করে। তারা ক্ষণস্থায়ী কয়েকটি রাজ্য স্থাপিত করতে সক্ষম হয়। চীনের ইতিহাসে এই সময়পর্বকে ষোল রাজ্যের সময়পর্ব নামে অভিহিত করা হয়। ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ওয়েই রাজবংশ চীনের উত্তরখণ্ডে ঐক্যসাধন করলে উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক কলহের অবসান হয়।

পূর্ব হান রাজবংশের শাসনকাল থেকেই উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর উপজাতিরা চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের দিকে

আসতে শুরু করে। তাদের এই স্থান পরিবর্তন ত্রিরাজ্য এবং চিন রাজবংশের সময়পর্বেও অব্যাহত থাকে। কিন্তু চিন শাসকশ্রেণী এই সকল বসবাসকারীদের শোষণ ও নির্যাতন করত এবং স্থানীয় কৃষকদের চেয়েও তাদের প্রতি আরও নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। এই সকল যাযাবরদের মধ্যে ছিল নিম্নলিখিত উপজাতি :

সিয়োংনু — এই উপজাতি নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে বর্তমান শানসী প্রদেশের ফেনহো নদী উপত্যকায় বসবাস করতে আসে। হান রাজবংশ, ওয়েই রাজ্য এবং বিশেষ করে চিন রাজবংশের শাসনকালে এদের অবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই হানজাতিভুক্ত* ভূস্বামীদের প্রজা ছিল; অনেককে হান শাসকেরা ধরে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করত। এর পরিণতি হল চিন রাজবংশের শেষার্ধে সিয়োংনু গোষ্ঠীর নেতা লিউ ইউয়ান (? —৩১০)-এর নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান। সিয়োংনুরা লুওইয়াং এবং ছাংআন অধিকার করে চিন সম্রাট হুয়াই তি এবং মিং তিকে বন্দী করে পীতনদী উপত্যকায় চিন রাজবংশের শাসন ধ্বংস করে। তারা হান নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরে এই রাজ্যের নাম দেয় চাও। চীনা ইতিহাসে পরবর্তী চাও-এর সঙ্গে পার্থক্য করার জন্য সিয়োংনুদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পূর্ববর্তী চাও নামে অভিহিত হয়।

চিয়ে উপজাতি — এই উপজাতি সিয়োংনুদের পথ অনুসরণ করে চিন শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই উপজাতিভুক্ত কিছু লোক শানসী প্রদেশে বসবাস করত। চিন শাসকেরা এদের প্রতি ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করত এবং তাদের পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করত। সিয়োংনু অভ্যুত্থানের সময়ে শি লো (? — ৩৩৩) নামক চিয়ে উপজাতিভুক্ত একজন ব্যক্তি যিনি ইতিপূর্বে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়েছিলেন তিনি স্বগোষ্ঠী এবং হানজাতিভুক্ত বহু জাতিচ্যুত লোকেদের একত্রিত করে হোনানে চিন রাজবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। শি লো'র শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি পরবর্তী চাও রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পূর্ববর্তী চাও রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস করে উত্তর চীনের অধিকাংশ ভূখণ্ড অধিকার করেন।

* হান জাতি বলতে (কখনো বা বলা হয় হান লোক, কখনো শুধু হানও বলা হয়) চীনের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিদের বাদ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই নামের জাতির কথা বুঝায়। হান রাজবংশের নাম থেকেই এর উৎপত্তি। চীন সীমান্তের অপর পারের লোকেরা তখনকার চীনবাসীদের হান নামে অভিহিত করত— অনুবাদক।

উত্তর-পূর্ব চীনের লিয়াওহো নদী উপত্যকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে সিয়ান-পেই উপজাতি হানজাতির চাং কুই (২৫৫—৩১৪)-এর অধিকারভুক্ত বর্তমান-কালের কানসু প্রদেশ ছাড়া উত্তর চীনের সমগ্র স্থান দখল করে। চাং কুই পূর্ববর্তী লিয়াং রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তি উপজাতিরা পরে এই রাজ্যকে পরাস্ত করে।

৩৫১ খৃষ্টাব্দে তি উপজাতিরা সেনসী প্রদেশে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং পূর্ববর্তী ছিন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ফু চিয়ান (৩৩৮—৩১৪) -এর শাসনাধীনে তারা সিয়ানপেই উপজাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী ইয়ান রাজ্য এবং চাং কুই প্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী লিয়াং রাজ্যকে পরাভূত করে, এবং চীনের উত্তর ভূখণ্ডকে পুনরায় ঐক্যসাধন করে। ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে ফু চিয়ান দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পূর্ব চিনের বিরুদ্ধে বৃহদাকারে আক্রমণ করতে গেলে তার সেনাবাহিনী ফেইশুই নদী উপত্যকায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। তার পরাজয়ের অনতিকাল পরই পূর্ববর্তী ছিন রাজ্যের পতন হয়।

এর পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর-চীন ভূখণ্ডে বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী রাজ্যের উত্থান-পতন হতে দেখা যায়। অগণিত লোকের প্রাণনাশ হয়, গবাদি পশু হরণ করা হয় এবং উৎপাদন-শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হয়। নগর এবং শহর লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বিরাট ভূখণ্ড অনাবাদী থেকে যায়।

ঐ যুগে অধিকাংশ হানজাতিভুক্ত অভিজাত ব্যক্তি, রাজকর্মচারী, ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ী দক্ষিণে ইয়াংসি নদী উপত্যকায় পালিয়ে যান। যে হান লোকেরা উত্তর ভূখণ্ডে থেকে যান তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য কিছু সময় ঐক্যবদ্ধ হন এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের সুযোগ গ্রহণ করেন, পরিখা খনন করেন ও সেনানিবাস ও গড় তৈরি করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের ক্রমবর্ধমান চাপে পড়ে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়। ভূস্বামীরা আক্রমণকারীদের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং তাদের হানজাতিভুক্ত কৃষকদের প্রতি অত্যাচার চালাতে সাহায্য করেন। এইভাবে ভূস্বামী এবং আক্রমণকারীদের যুগপৎ অত্যাচারের ফলে এই সকল কৃষকদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। চীনের উত্তর ভূখণ্ডের অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির অনেক ক্ষতি হয়।

পূর্ব চিন এবং দক্ষিণ রাজবংশ : যখন উত্তর চীন বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন পূর্ব চিন রাজবংশের (৩১৭—৪২০) সম্রাট ইউয়ান তি দক্ষিণ

চীনের বৃহৎ ভূস্বামীদের সমর্থনে ৩১৭ খৃষ্টাব্দে ছাংচিয়াং (ইয়াংসি) নদীর অববাহিকা অঞ্চলে হানজাতির একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর পরপর চারটি হানজাতি রাজবংশের পত্তন হয়, যথা সোং (৪২০—৪৭৯), ছি (৪৭৯—৫০২), লিয়াং (৫০২—৫৫৭), এবং ছেন (৫৫৭—৫৮৯)। এই কয়েকটি রাজবংশ দক্ষিণ রাজবংশ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব চিনের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন উত্তর চীন থেকে আগত বৃহৎ অভিজাত ভূস্বামীরা, এবং তারা ইয়াংসি নদীর দক্ষিণের বৃহৎ ভূস্বামীদের সাহায্য পান। উত্তর চীনের এই ভূস্বামীরা রাজকর্মচারী হবার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে তাঁরা দক্ষিণ ভূখণ্ডের ভূস্বামীদের উচ্চ রাজকর্মচারী হবার সুযোগ অপহরণ করেন। তাঁরা অতি-সাধারণ জমিদার পরিবারে জন্ম এমন পণ্ডিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং বিবাহ-সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। এর ফলে, উত্তর এবং দক্ষিণ ভূস্বামীদের মধ্যে তীব্র স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং শাসকশ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকালীন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সোং এবং ছি'র শাসনাধীনে সাধারণ পরিবারের ব্যক্তিরা উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ পাবার অধিকারী হন। এই পদ পাওয়া সত্ত্বেও সমাজে তাদের স্থান নীচে ছিল এবং অভিজাত পরিবারেরা তাদের ঘৃণা করতেন।

উত্তর ভূখণ্ড থেকে আগত কিছু শরণার্থী হুয়াইহো নদীর দক্ষিণে অথবা উত্তর চিয়াংসুতে বসবাস করেন এবং সেখানে উর্বর জমি তৈরি করেন। অন্যান্য কিছু শরণার্থী জমির প্রজাস্বত্ব অধিকার গ্রহণ করে কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হন অথবা দক্ষিণের অভিজাত ভূস্বামীদের ক্রীতদাসে পরিণত হন। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ ভূখণ্ড দক্ষিণী ভূস্বামীরা দখল করে নেয়। উত্তর ভূখণ্ড থেকে আগত অভিজাত শরণার্থীরা জমি ক্রয় করেন অথবা রাজকীয় দান হিসেবে জমির অধিকারী হন। তারাও পতিত জমি চাষ করান অথবা বলপূর্বক পাহাড়ী জমি এবং বিল অঞ্চলের জমি নিজেদের অধিকারে আনেন। কৃষকেরা মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের অধিকারী হয় এবং বেগার শ্রমদান ছাড়া তাদের অশেষ করের ভার বহন করতে হয়। এইরূপ পরিস্থিতির ফলে দু'টি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় — একটি হয় ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে সুন এন (? —৪০২)-এর নেতৃত্বে, আর একটি হয় ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে থাং ইয়ুচি-এর নেতৃত্বে।

উত্তর চীন থেকে যে সকল শরণার্থীরা দক্ষিণ ভূখণ্ডে আসেন তারা সঙ্গে আনেন মধ্য চীনের উন্নত কৃষি-উৎপাদন কৌশল, এবং তা দক্ষিণাঞ্চলের অগ্রগতি-তে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও চা চাষের প্রবর্তন এবং চীনামাটির পাত্রের উৎপাদন, হস্তশিল্প বৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে উত্তম পরিবেশের সৃষ্টি করে। পূর্ব চিন থেকে শুরু করে ছেন রাজবংশ সময়পর্ব অব্দি ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ-কূলবর্তী স্থানসমূহের শহুরে অর্থনীতি লক্ষণীয় অগ্রগতি-লাভ করে। শাসকশ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করতে থাকে। ইয়াংসি নদীর উপকূলে গড়ে ওঠে বহু বাণিজ্যিক শহর। বাণিজ্য-কর, নাগরিককর এবং আমদানি ও রপ্তানির উপর ধার্য শুল্ক রাজকোষের আয়ের অন্যতম উৎস রূপে পরিণত হয়। উ, পূর্ব চিন এবং দক্ষিণ রাজবংশ-সমূহের তিন শত বছর রাজত্বের সময়ে ইয়াংসি নদী উপত্যকার অর্থনীতিক অগ্রগতি এক মাত্র মধ্য-চীন ভূখণ্ডের পরই তার স্থান করে নেয়।

বহু পণ্ডিত পরিবার দক্ষিণ চীনে বসবাস করতে আসার জন্য চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দী ধরে চিয়ানখাং (বর্তমান নানচিং) দক্ষিণ রাজবংশের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র এবং চীনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। চিয়ানখাং-এ কবি, শিল্পী এবং পণ্ডিতদের সমাবেশ হয় এবং সাহিত্য ও শিল্প বিকাশলাভ করে ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই যুগে সাধিত হয়। গণিতশাস্ত্রবিদ জু ছোংচি (৪২৯—৫০০) এক গণনায় একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ৩.১৪১৫৯২৬ এবং ৩.১৪১৫৯২৭এর মধ্যে বলে নিরূপিত করেন। গণিতশাস্ত্রে এই গণনা এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

উত্তর রাজবংশ : যখন উত্তর চীনের ভূখণ্ড বিভিন্ন বড় বড় রাজ্যে বিভক্ত তখন থোপা নামে সিয়ানপেই উপজাতির একটি শাখার বর্তমান কালের সেনসী প্রদেশের উত্তরখণ্ডে আবির্ভাব হয়। হানজাতির সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাদের সমাজ প্রথমে আদিম কমিউনিজম থেকে দাসব্যবস্থাভিত্তিক এবং পরে দাসব্যবস্থাভিত্তিক থেকে সামন্তবাদ সমাজে রূপান্তরিত হয়। শক্তিশালী অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সহায়তায় এবং দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পর তারা উত্তর চীনকে নিজেদের একচ্ছত্র অধীনে আনে এবং প্রতিষ্ঠিত করে উত্তর ওয়েই রাজবংশ (৩৮৬—৫৩৪)। ফিংছেং (বর্তমান কালের তাথোং) ছিল এই রাজ্যের রাজধানী।

উত্তর ওয়েই রাজবংশের শাসন আর তার পূর্ববর্তী ষোল রাজ্যের শাসনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। সাধারণ লোকেদের কষ্টের কোন লাঘব হয়নি। ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সিয়াও ওয়েন তি, যিনি ৪৭১ থেকে ৪৯৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তিনি ভূমির সমবণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যাতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা সকলকেই একই নির্দিষ্ট পরিমাণের জমি বণ্টন করা হয়। ভূমি-হীন কৃষকদের চাষ করার জন্য দাবীদারহীন পতিত জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেয়া হয়। সেই সঙ্গে পরিবারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে বৃহৎ ভূস্বামীদের তাদের অধীনস্থ কৃষকদের উপর কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদেরও করদানের আওতায় আনা হয়। বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরোধিতা সীমিত রাখার জন্য নূতন ভূমি ব্যবস্থায় তাদের অধিকারভুক্ত ভূমির উপর স্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং তাদের ক্রীতদাসদের জন্য অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ করা হয়।

এই ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পর আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি-ব্যবস্থা দ্রুত অগ্রগতিলাভ করতে থাকে। উত্তর ওয়েই রাজবংশের শেষের দিকে চিয়া সিসিয়ে কর্তৃক লিখিত "জনশিক্ষার উত্তম কলা" নামক একটি পুস্তকে কৃষি এবং পশু-পালন পন্থা সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তক থেকে আমরা তৎকালীন কৃষি-উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতি সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারি।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উত্তর ওয়েই রাজ্য ছাংচিয়াং (ইয়াংসি) নদীর দক্ষিণাঞ্চল থেকে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। পণ্যবিনিময় দ্বারা বাণিজ্য প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল, এবং ৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব অব্দি মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না।

উত্তর ওয়েইয়ের শাসনাধীন লোকেদের মধ্যে হান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। তাদের বশীভূত করার জন্য উত্তর ওয়েইয়ের শাসকেরা কোন কোন হান ভূস্বামী-দের রাজকর্মে নিযুক্ত করেন।

হান ভূস্বামীদের সহযোগিতা পাবার আশায় এবং নিজের শাসন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সম্রাট সিয়াও ওয়েন তি হানজাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করার নীতিতে বদ্ধ-পরিকর হন। ৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লুওইয়াং-এ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানে দক্ষিণ-রাজবংশের অনুকরণে বিভিন্ন রীতিনীতি প্রচলিত করেন। তিনি সিয়ানপেই উপজাতির বহুধ্বনিযুক্ত পদবী পরিবর্তন করে হানদের ন্যায় একধ্বনিযুক্ত পদবী গ্রহণ করেন। তিনি সিয়ানপেই রাজকর্মচারীদের রাজদর-

বারে নিজেদের ভাষায় কথা বলা ও নিজেদের পোষাক পরা নিষিদ্ধ করেন এবং অভিজাত সিয়ানপেই ব্যক্তিদের বৃহৎ হান-ভূস্বামীদের পরিবারের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য উৎসাহ দেন। এই সকল ব্যবস্থায় সিয়ানপেই এবং হান-ভূস্বামীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু তাদের সম্মিলিত শোষণ হান ও সিয়ানপেই কৃষকদেরও তাদের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের জন্য একতাবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে।

মঙ্গোলিয়া মালভূমিতে বসবাসকারী রৌ রান নামে একটি শক্তিশালী উপজাতি অনবরত উত্তর সীমান্তে হামলা করে উত্তর ওয়েই রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুললে উত্তর ওয়েই তার সীমান্ত বরাবর ছয়টি সেনা-শিবির স্থাপিত করে। রাজধানী লুওইয়াং-এ স্থানান্তরিত হলে দক্ষিণ চীন রাজ্যের রাজনীতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐ ছয়টি সেনা-শিবিরের সেনাধিপতি এবং কর্মচারী ও সেনাদের সম্রাট উপেক্ষা করতে থাকেন। তাই ৫২৪ খৃষ্টাব্দে তারা এক বৃহদাকারের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর পরই সংঘটিত হয় হান ও সিয়ানপেই কৃষকদের অভ্যুত্থান। কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়, কিন্তু পরিণামে উত্তর ওয়েই, পূর্ব ওয়েই (৫৩৪—৫৫০) এবং পশ্চিম ওয়েই (৫৩৫—৫৫৭) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অতঃপর, কাও ইয়াং নামে একজন হান পূর্ব ওয়েইকে পরাস্ত করে উত্তর ছি রাজবংশ (৫৫০—৫৭৭) প্রতিষ্ঠা করেন। সিয়ানপেই উপজাতির ইয়ু ওয়েনচ্যুয়ে পশ্চিম ওয়েই-এর কর্তৃত্ব অধিকার করে উত্তর চৌ (৫৫৭—৫৮১) রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর ছি-এর শাসকেরা দুর্নীতিপরায়ণ এবং বর্বর ছিলেন। তাদের এই আচরণ লোকেদের মনে ক্ষুব্ধ ও ঘৃণার ভাব উৎপন্ন করে। অন্যদিকে, উত্তর চৌ-এর শাসকেরা নূতন উন্নয়নপন্থা প্রবর্তন করেন এবং উৎপাদনে উৎসাহ দেন। তার ফলে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে, উত্তর চৌ উত্তর ছিকে পরাস্ত করে পরবর্তী সুই রাজবংশ কর্তৃক পুনরায় চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ প্রশস্ত করেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব: আনুমানিক খৃষ্ট জন্মের কাছাকাছি সময়ে তা ইয়ুয়ে তি'র মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবেশ লাভ করে। পূর্ব হান রাজবংশ এবং ত্রিরাজ্যের সময়পর্বে এই ধর্ম ক্রমশঃ প্রসার লাভ করতে থাকে। ওয়েই এবং চিন রাজত্বের সময়পর্বে চীনে অধিবিদ্যা চর্চার খুব প্রচলন থাকাতে বৌদ্ধধর্ম সহজেই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করে। পূর্ব চিন রাজত্বের শেষার্ধে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ক্রমশঃ চীনের সামন্ততান্ত্রিক

সমাজে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কনফুসিয়াসবাদের আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ ঘটান। বৌদ্ধধর্মের আত্মা অবিনশ্বর এবং কর্ম অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্তির ভাবনা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। সামন্ততান্ত্রিক আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যোগসাধনের ফলে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হয়।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাওবাদ-বিশ্বাসীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং এই দুই ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে বিতর্কের ফলে তাওবাদীরা পরাজিত হন। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী এবং কনফুসিয়াস পণ্ডিতদের মধ্যেও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। লিয়াং রাজবংশের সম্রাট উ তির রাজত্বকালে (৫০২—৫৪৯) ফান চেন নামক একজন কনফুসিয়াস পণ্ডিত আত্মার বিনাশতত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, মানুষ তার দেহে আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; তাই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তিনি আত্মার দেহান্তরবাদ এবং পাপ-পুণ্য কর্মফলের বিরোধিতা করেন। তৎকালীন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দক্ষিণ রাজবংশের অসহায় শাসকশ্রেণীর পক্ষে নিজেদের আত্মিক সান্ত্বনা এবং জনগণকে শান্ত রাখার জন্য বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। উ তি বৌদ্ধধর্ম প্রচার নিজের প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে বৌদ্ধমন্দিরে আশ্রয় নেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। লিয়াং রাজবংশের যুগে কেবলমাত্র চিয়ানখাং-এ পাঁচশত বৌদ্ধমঠ ছিল এবং সেখানে এক লক্ষেরও বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাস করতেন। এই সকল মঠ দান হিসেবে অথবা বলপূর্বক প্রাপ্ত বিরাট জমির অধিকারী হয় এবং বন্ধকী ও অধিক সুদ নিয়ে তেজারতী কারবারে লিপ্ত থাকে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে চীনের দক্ষিণ ভূখণ্ডের অর্থনীতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

শাসকশ্রেণীর উৎসাহদানের ফলে উত্তর চীনেও বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে। একবার, ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ওয়েই রাজ্যের শাসকেরা তাওবাদের সমর্থনে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের দমন করতে চেষ্টা করেন। অনেক বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম টিকে থাকে এবং আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। উত্তর চীনের শাসকেরা মন্দির নির্মাণ এবং বৌদ্ধমঠ চালু রাখার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে লুওইয়াং-এ বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধমঠের সংখ্যা ছিল ১,৩৬৭। সমগ্র উত্তর চীনে মোট ৩০,০০০ বৌদ্ধমন্দির ও মঠ ছিল, এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ।

উত্তর ছি রাজ্যের এবং উত্তর চৌ রাজ্যেরও অবস্থা উত্তর ওয়েই রাজ্যের মতনই ছিল এবং মন্দির ও মঠগুলো জমি দখল করে কৃষকদের দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল।

যে সকল কৃষক পরিবার মন্দির ও মঠে খাদ্যশস্য অর্পণ করতেন তাদের বৌদ্ধধর্মানুরাগী পরিবার বলা হত। যে সকল কৃষক পরিবার মন্দির ও মঠের জমি চাষ করতেন এবং তার জন্য বিভিন্ন ধরণের শ্রমদান করতেন তাদের বৌদ্ধ-পরিবার বলে আখ্যা দেয়া হত। বৌদ্ধমন্দির ও মঠগুলি সমাজের এক বিরাট অংশের সম্পত্তি ভোগ করত। দক্ষিণাঞ্চলের ন্যায় এইসব মন্দির ও মঠ বিরাট ভূমির অধিকারী ছিল এবং তেজারতী কারবার করত। এই অবস্থার জন্য ৫৭৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর চৌ-এর সম্রাট উ তি (রাজত্বকাল ৫৬১—৫৭৮) মন্দির ও মঠগুলির জমি বাজেয়াপ্ত করেন এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের সংসারে ফিরে যাবার আদেশ জারি করেন।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি হয়। বর্তমানকালের কানসু প্রদেশের তুনহুয়াং-এর হাজার বুদ্ধ-গুহা (পূর্ব লিয়াং রাজবংশের সময়ে শুরু হয়), এবং উত্তর ওয়েই রাজবংশের সময়পর্বে নির্মিত পিং-লিং-এর গুহামন্দির, মাইচিশানের গুহামন্দির, ইয়ুনকাং এবং লোংমেন-এর গুহামন্দির চীনের ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র এবং স্থাপত্যশিল্প গৃহীত হতে থাকে। বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদের ফলে চীনাভাষাও সমৃদ্ধিলাভ করে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তাওবাদের শিক্ষা তাত্ত্বিকরূপ পায় ও সুসম্বদ্ধ হয়।

এই যুগের লি তাওইউয়ান সঙ্কলিত "জলপথের ইতিহাস গ্রন্থের টীকা" চীনের ভৌগোলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল অবদান।

৩. সুই, থাং, পাঁচ-রাজবংশ, সোং, এবং ইউয়ান রাজবংশসমূহের যুগ (ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী)

সুই রাজবংশ (৫৮১—৬১৮) কর্তৃক চীনের ঐক্যসাধন এবং তার পতন: ৫৮১ খৃষ্টাব্দে উত্তর চৌ রাজ্যের সিয়ানপেই শাসকদের হান-জাতিভুক্ত ইয়াং চিয়ান (৫৪১—৬০৪) নামে একজন প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের ক্ষমতা

দখল করে সুই রাজবংশের পত্তন করেন। তিনি সুই সম্রাট ওয়েন তি নামে খ্যাত হন। ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ রাজবংশগুলোর মধ্যে ছেন রাজবংশকে পরাস্ত করে তিনি পূর্ব চিনের সময়পর্ব থেকে নানা রাজ্যে বিভক্ত থাকা চীনকে একীকরণ করেন।

সুই রাজবংশ উত্তর ওয়েই শাসকদের আমল থেকে প্রচলিত ভূমির সম-বণ্টন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করে নি, বরঞ্চ বাধ্যতামূলকভাবে কর্মরত লোকেদের ভার লাঘব করে এবং কৃষকদের করের ভারও হ্রাস করে। এই নীতি অনুসরণের ফলে কৃষি-উৎপাদন অগ্রগতিলাভ করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা-ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং সারা দেশে ওজন ও দৈর্ঘ্যের পরিমাপকে অভিন্ন একক ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের ঐক্যসাধনের ফলে নূতন নূতন কেনা-বেচার কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে।

পরবর্তী সম্রাট ইয়াং তি (রাজত্বকাল ৬০৫ থেকে ৬১৮ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই ব্যাপকহারে নির্মাণকার্য শুরু করান। তিনি লুওইয়াং নগরের পুনর্নির্মাণের জন্য ২০ লক্ষ লোক নিযুক্ত করেন এবং চীনের মহাপ্রাচীরের মেরামত ও তার দৈর্ঘ্য বিস্তৃত করার জন্য আরও ১০ লক্ষ লোককে নিযুক্ত করেন। লুওইয়াংকে কেন্দ্র করে তিনি দক্ষিণাঞ্চলের হাংচৌ এবং উত্তরাঞ্চলের চুওচুন (আধুনিক পেইচিং)-এর মধ্যে যোগাযোগের জন্য প্রচুর লোক নিয়োগ করে একটি বৃহৎ খাল খনন করান। এই 'মহা খাল' খনন চীনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নির্মাণ কাজের তাগিদে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি এবং প্রচুর অর্থ-ব্যয় সত্ত্বেও সম্রাট ইয়াং তি পশ্চিমাঞ্চলের থু-ইয়ুহুন উপজাতিদের বিরুদ্ধে এবং কোরিয়া দেশের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালনা করেন। বলপূর্বক লোক এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে এই অভিযান চালিত হয়। উপরন্তু পরপর কয়েকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দেশ এবং জনগণ দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হন। কোরিয়া অভিযানের অনতিকাল পরই কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

এই সকল কৃষক বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ওয়েন তি এবং ইয়াং তি উভয়েই কৃষকদের অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করে বার বার আদেশ জারী করেন। তা সত্ত্বেও ইয়াং তি'র শাসনকালের শেষের দিকে নিরন্তর কৃষক বিদ্রোহ চলতে থাকে। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন চাই রাং এবং তৌ চিয়ানতে-এর

মতো ব্যক্তিদের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ কৃষকদের যোগদানে শতাধিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে সুই রাজবংশের পতন হয়।

থাং রাজবংশের (৬১৮—৯০৭) পত্তন এবং তার স্বর্ণযুগ : কৃষক বিদ্রোহের সময়ে লি ইউয়ান (৫৬৫—৬৩৫) নামে সুই রাজবংশের একজন রাজকর্মচারী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং ৬১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি থাং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিহাসে তিনি থাং সম্রাট কাও জু নামে পরিচিত। ছাংআন (আধুনিক সিআন) হল এই রাজবংশের রাজধানী।

সুই রাজবংশের রাজত্বের শেষার্ধে সংঘটিত কৃষকদের যুদ্ধ ভূস্বামীদের শাসনের প্রতি এক বিরাট আঘাত হানে এবং সামাজিক উৎপাদন-শক্তির অগ্রগতিকে সক্রিয় করে তোলে।

থাং রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাট থাই জোং (রাজত্বকাল ৬২৭ থেকে ৬৪৯) একজন বিখ্যাত সম্রাট। তিনি দ্রুত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করেন এবং প্রভূত রাজনীতিক ও সামরিক শক্তির অধিকারী হন।

তাঁর রাজত্বকাল এবং সম্রাট স্যুয়ান জোং-এর রাজত্বকালের (৭১২—৭৫৬) সময়পর্বে কৃষকেরা জমি পায়, জলসেচন প্রণালীর অগ্রগতি হয় এবং গ্রামীণ আর্থনীতি পুনরায় শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে।

বুটিদার রেশমী কাপড় ও গালিচা বয়ন এবং রঞ্জনকার্যের জন্য রাষ্ট্র বহু হস্তচালিত কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে। এই সকল কারখানা মুদ্রা এবং বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য তৈরি করত। এই প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন কর্মী, সরকারী ক্রীতদাস এবং শ্রমজীবীদের নিয়োগ করত। ইয়াংচৌ-এ জাহাজ-নির্মাণ ও তাম্র-দর্পণ তৈরি, সিছুয়ানের তৈরি বুটিদার রেশমী কাপড় ও লবণ, চিয়াংসীর চীনামাটির বস্তু এবং শানসীর থাইইউয়ানে নির্মিত তাম্রদ্রব্য সারাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খনিজ পদার্থ উদ্ধারের কাজও যথেষ্ট অগ্রগতিলাভ করেছিল। আনহুই, চেচিয়াং এবং চিয়াংসী মাত্র এই ক'টি স্থানেই আটান্নটি রৌপ্য তৈরির কারখানা ছিল, ৯৬টি ছিল তাম্র-তৈরি কারখানা, পাঁচটি লৌহ-খনি, দুটি টিনের খনি এবং চারটি সীসার খনি। থাং যুগে তৈরি হস্তশিল্প পূর্ববর্তী অন্যান্য যুগের চেয়েও অনেক উন্নত ছিল।

রাজ্যের মধ্যে বার্তাবহ রানার এবং নির্দিষ্ট স্থানসমূহে সংগঠিত যাত্রীবহন-কারী গাড়ীর ব্যবস্থা থাকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছিল। বিশেষ

করে মহা খাল খননের ফলে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ সুবিধাজনক হয়েছিল। ছাংআন, লুওইয়াং, ইয়াংচৌ এবং কুয়াংচৌ বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে বহু নগর ও শহর সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল।

থাং রাজবংশের আধিপত্য সুদূর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই যুগের প্রথম ভাগে থাং সেনাবাহিনী পূর্ব-তুর্কীদের পরাস্ত করার পর পশ্চিম-তুর্কীদের পরাজিত করেছিল। থাং শাসকেরা মধ্য-এশিয়ার আধুনিক সিনচিয়াং এবং সুইইয়ে নদীর উপকূলবর্তী স্থানে স্থায়ীভাবে সীমান্ত রাজ-প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং ছিউজি (আধুনিক সিনচিয়াং-এর কুছা), ইয়ুথিয়ান (আধুনিক হোথান), শুলো (আধুনিক খাশি শহর) এবং সুইইয়ে নামক স্থানসমূহে সৈন্য মোতায়েন করেছিল। এইগুলো ছিল থাং রাজবংশ কর্তৃক পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার কয়েকটি পদক্ষেপ।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে থুপো জাতিদের নেতা সোংজান গাম্পো (? —৬৫০)তিব্বত মালভূমিতে বিক্ষিপ্ত উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করে লাসাতে তাঁর রাজধানী স্থাপিত করেন। তিব্বতের ইতিহাসে এই যুগই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধির যুগ, তখন সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিলাভ হয়েছিল। থাং রাজবংশ এবং থুপো জাতির মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ সত্ত্বেও থাই জোং-এর রাজত্বকালে রাজকুমারী ওয়েন ছেংকে (? — ৬৮০) থুপোতে পাঠান হয় এবং তিনি সোংজান গাম্পোর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। রাজকুমারী ওয়েন তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান বহু কারিগর, উৎপাদন-কৌশল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ, সব্জীর বীজ, হস্তকৃত শিল্পদ্রব্য এবং ঔষধ। ৭১০ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী চিন ছেংয়েরও তিব্বতী রাজার সঙ্গে বিবাহ হয় এবং তিনি সঙ্গে নিয়ে যান শতাধিক দক্ষ কারিগর এবং (কুছারের) ছিউজি সঙ্গীত। রাজকুমারী ওয়েন ছেং-এর তিব্বতে যাবার পর হান এবং তিব্বতীদের মধ্যে অর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড় হয়।

এই যুগে চীনা ব্যবসায়ীরা মধ্য-এশিয়া এবং পশ্চিম-এশিয়াতেও যাতায়াত শুরু করেন। আরব দেশ এবং অন্যান্য দেশসমূহ থেকেও বণিকেরা এবং ধর্ম প্রচারকেরা চীনে আসেন। এক সময়ে রাজধানী ছাংআনে বিদেশী বসবাসকারী-দের সংখ্যা দাঁড়ায় চার থেকে পাঁচ হাজার। ঐ শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং

সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়, এবং তার ফলে চীনবাসীদের পার্থিব ও সাংস্কৃতিক জীবন আরও শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে। ইয়াংসি নদীর তীরে এবং সমুদ্রের উপকূলে বহু সমৃদ্ধিশালী নগর ও শহর গড়ে ওঠে। দ্রব্য আমদানি-ব্যবসা ও জাহাজ-চলাচল তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই সবের জন্য থাং রাজবংশ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে ওঠে। এই যুগেই চীনা সংস্কৃতি কোরিয়া এবং জাপানে প্রসারিত হয়। এই যুগেই চীনের কাগজ তৈরি করার কৌশল চীন থেকে মধ্য-এশিয়াতে যায় এবং সেখান থেকে কয়েক শতাব্দী পর এই কৌশল আরব দেশের লোকেরা ইউরোপে প্রবর্তন করে যা পাশ্চাত্য দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্কলহ: স্যুয়ান জোং-এর রাজত্বের (৭১৩—৭৪১) প্রথম দিকে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব এবং শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্কলহ তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে শাসকশ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে তাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদ দেখা দেয়। যাযাবর জাতিবংশজাত দুইজন সেনাপতি আন লুশান এবং শি সিমিং বিদ্রোহ ঘোষণা করলে থাং রাজবংশের পতন শুরু হয়। তখন থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক সামরিক শাসকেরাও বিদ্রোহ করেন, আমলাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক কলহ চলতে থাকে এবং রাজদরবারের খোজা-পুরুষদের কর্তৃক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা শুরু হতে থাকে।

ইয়োচো সেনাশিবিরের সেনাপতি আন লুশান রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে রাজধানী ছাংআন দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শি সিমিং নামে তাঁর একজন অধীনস্থ সামরিক কর্মচারী বিদ্রোহী সেনাদের পরিচালনা করার ভার নিয়ে থাং সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালনা করেন। এই বিদ্রোহী সেনারা বহুসংখ্যক হান লোকেদের হত্যা করে। চীনের ইতিহাসে এই ঘটনা আন-শি বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

যদিও শেষ পর্যন্ত থাং সেনাবাহিনী আন-শি বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়, তবু এই বিদ্রোহের ফলে সারাদেশের. বিশেষ করে পীতনদী উপত্যকাঞ্চলের অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়। ছাংআন. লুওইয়াং এবং বহু নগর, শহর ও গ্রাম বিধ্বস্ত হয়।

সামরিক প্রশাসক নিযুক্তির ব্যবস্থা মূলতঃ থাং শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু আন-শি বিদ্রোহের পর এই সকল সামরিক প্রশাসকেরা

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হলেন। তাঁরা রাজ্যের কর নিজেরাই ভোগ করতে থাকেন, নিজেদের সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন উত্তরাধিকারীসূত্রে পদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা। এই ধরণের কয়েকজন সামরিক প্রশাসক ছাংআনের সরকারকে অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ স্বাধীন হন।

ছাংআনের সরকার রাজদরবারের খোজা-পুরুষদের কর্তৃত্বাধীনে এসেছিল। তারা সামরিক ক্ষমতা নিজেদের অধিকারে এনেছিল, সেনাবাহিনীর গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ তারাই করত এবং রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত তাঁদের নির্দেশে পালিত হত। এই খোজা-পুরুষেরা এমন কি একজন সম্রাটকে নির্বাসিত করে আর একজন সম্রাটকে মনোনীত করত। সম্রাট সিয়ান জোং (রাজত্বকাল ৮০৬—৮২০)-এর পরবর্তী ন'জন সম্রাটদের মধ্যে আট জনই ছিলেন খোজা-পুরুষদের মনোনীত ব্যক্তি।

ওয়েই এবং চিন রাজবংশদ্বয়ের শাসনকালে প্রচলিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সুপারিশ অনুযায়ী রাজকর্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থা সুই এবং থাং রাজবংশ বিলোপ করে দেয়, এবং তার পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর ফলে, সাধারণ ভূস্বামী এবং বণিক পরিবারের বহু যুবক রাজকার্যে যোগদান করতে সক্ষম হয়। এই রাজকর্মচারীদের সঙ্গে পুরানো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও আমলাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হত। সমাজের বিভিন্ন স্তরের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারীরা প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক উপগোষ্ঠী ও গুপ্ত সমিতি গঠন করেন এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম কয়েক দশক ধরে স্থায়ী থাকে।

কয়েকটি বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ: ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বণিকসম্প্রদায়, রাজকর্মচারী এবং বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে সংগ্রামের ফলে অসংখ্য কৃষক জমি থেকে বিতাড়িত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। কৃষকদের উপর শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে দেয়-করের ভার এবং নানাবিধ কর ও শুল্ক প্রদানের অসীম চাপ পড়ে। স্থানীয় দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারীরাও তাদের কাছ থেকে নানাবিধ দাবী করতে থাকে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে কৃষকেরা মরিয়া হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেন। ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ছিউ ফু'র (? —৮৬০) নেতৃত্বে একটি কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ঐ একই বছরে ফাং স্যুন (? —৮৬৯)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই দু'টিই ছিল স্থানীয় বিদ্রোহ, কিন্তু তাতে সূচীত হল দেশব্যাপী অভ্যুত্থান। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ছাংইউয়ান জেলায় (আধুনিক

হোনান প্রদেশে) ওয়াং সিয়ানচি'র (?—৮৭৮) নেতৃত্বে এবং পরের বছর শানতোং-এ হুয়াং ছাও-এর (?—৮৮৪) নেতৃত্বে এই দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়। রাজসেনাদের ব্যূহচক্র ভেদ করে কৃষকসেনারা হোনান এবং হুপেইতে অনুপ্রবেশ করেন। ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াং সিয়ানচি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান এবং তাঁর স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হুয়াং ছাও। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকসেনারা শানতোং থেকে হোনান, আনহুই এবং হুপেইতে প্রবেশ করেন। হুপেইতে ইয়াংসি নদী পার হয়ে এই বাহিনী দক্ষিণ-পূর্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে কুয়াংতোং-এ পৌঁছায়। ওখান থেকে এই বাহিনী কুয়াংসিতে প্রবেশ করে এবং পরে হুনান, হুপেই, চিয়াংসি এবং চিয়াংসু অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়ে এসে ইয়াংসি নদী পার হয়ে আনহুই ও হোনানে প্রবেশ করে। ৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষকসেনারা রাজধানী দখল করেন এবং হুয়াং ছাওকে প্রধান করে একটি সরকার গঠন করেন।

দু'বছর চার মাস ধরে কৃষকসেনারা ছাংআন নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হন। অতঃপর, থাং সরকার এবং পশ্চিম-তুর্কীদের শাখুও নামে একটি শাখা তাদের ছাংআন থেকে বিতাড়িত করে এবং স্বল্পকাল পরেই তারা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরপরই থাং রাজবংশের পতন হয়।

থাং রাজবংশের পতন এবং পাঁচ-রাজবংশ ও দশ রাজ্যের উত্থান: ৯০৭ খৃষ্টাব্দে চু ওয়েন থাং রাজবংশের শাসন উৎখাত করে পরবর্তী লিয়াং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পরই পীতনদীর অববাহিকা অঞ্চলে পরপর চারটি রাজ্যের পত্তন হয়, যথা পরবর্তী থাং, পরবর্তী চিন, পরবর্তী হান এবং পরবর্তী চৌ। চীনা ইতিহাসে এই সকল রাজবংশ সম্মিলিতভাবে পাঁচ রাজবংশ (৯০৭—৯৬০) নামে অভিহিত হয়।

এই একই সময়পর্বে চীনের বিভিন্ন স্থানে আরও দশটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয়। কাজেই চীন পুনরায় বিচ্ছেদের যুগে পড়ে।

এই একই সময়ে উত্তর-পূর্ব চীনের লিয়াওহো নদীর উপত্যকায় খিতান রাজ্যের (৯১৬—১১২৫) আবির্ভাব হয়। এই রাজ্য শানসী এবং হোপেই-এর উত্তরাঞ্চলের ষোলটি প্রিফেক্চার দখল করে রাজ্যের নাম দেয় লিয়াও, এবং ইয়ানচিংকে (আধুনিক পেইচিং) করা হয় এই রাজ্যের রাজধানী। লিয়াও রাজ্য ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

থাং রাজবংশের পতনের পর যুদ্ধকালীন ধ্বংসের ফলে দেশের অর্থনীতি প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতিহাসের বিবরণ অনুযায়ী থাং রাজবংশের শেষার্ধ থেকে পাঁচ-রাজবংশের প্রথমার্ধ সময়ের মধ্যে ছাংআনের পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকেরা "বছরের পর বছর জমি অনাবাদী রেখে পার্বত্য উপত্যকায় পালিয়ে বেড়ায়।" কয়েকটি নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ছাংআনের কেবলমাত্র কয়েকটি রাজ-প্রাসাদ, বৌদ্ধমঠ, রাজকার্যে ব্যবহৃত গৃহ এবং লোকদের বাসগৃহ যুদ্ধের অগ্নি-শিখা থেকে রেহাই পেয়েছিল। একটি ইতিহাসের বিবরণ অনুযায়ী লুওইয়াং-এর "মাটিতে মানুষের হাড় ছড়িয়ে ছিল এবং কাঁটাঝোপে পূর্ণ ছিল। একশরও কম পরিবার ওখানে বাস করত।" একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে "পশ্চিমের হানকু গিরিপথ থেকে পূর্বদিকের শানতোং পর্যন্ত এবং উত্তরেব হোনান থেকে দক্ষিণ দিকের ইয়াংসি নদী ও হুয়াই নদী উপত্যকা অঞ্চলের স্থানসমূহে পাখী ও মাছের প্রায় অস্তিত্ব ছিল না, জনপদ ছিল বিরল এবং সর্বত্র কবরের নীরবতা বিরাজ করত।"

বিভিন্ন রাজ্যের শাসকেরা নিজ নিজ অধিকারভুক্ত রাজ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য তাদের সেনা-বাহিনী বৃদ্ধি করতে তারা অত্যধিক কর ও শুল্ক প্রবর্তন করে লোকেদের চরম দুর্দশায় ফেলেন এবং কৃষকদেব বিভিন্ন প্রকারের বেগার শ্রমদানে বাধ্য করান। এর ফলে গ্রামগুলো আরও দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

পাঁচ-রাজবংশ এবং দশ রাজ্যের যুগে দেশে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য পরিস্থিতির জন্য চীনের বহু শহর বিশেষ করে দক্ষিণ দিকের ছেংতু, চিনলিং (নানচিং), ফুচৌ. হাংচৌ, কুয়াংচৌ, চিংচৌ, ছাংশা ইত্যাদি শহরগুলো রাজনীতির প্রাণ-কেন্দ্র রূপে পরিণত হয়। সামন্ত-জায়গীর শাসকেরা গ্রাম অঞ্চলগুলোকে নিদারুণ শোষণ করে শহরগুলোতে অর্থ ও সম্পদ সঞ্চয় করেন। তাই শহরগুলো ক্রমশঃ হস্তশিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিণত হয়।

থাং রাজবংশের সময় চীনের সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম: থাং যুগের সাহিত্যে কাব্যই প্রধান স্থান দখল করে নেয়। চীনা গীত ও কাব্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু থাং যুগে চীনা কাব্য তার গৌরব শিখরে উপনীত হয়। এই যুগে বহু প্রসিদ্ধ কবির জন্ম হয়, যেমন লি পাই (৭০১—৭৬২), তু ফু (৭১২—৭৭০) এবং পাই চ্যু-ই (৭৭২—৮৪৬)। এই তিনজন কবি চীনা কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

কবিরূপে পরিগণিত হন। থাং যুগে রচিত কবিতার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কবিতা এখনও বিদ্যমান আছে। লি পাই ছিলেন একজন সর্বজনীন- প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁর রচনা "বল্গাহীন ঘোড়ার মতো ধাবিত হয়।" তু ফু ছিলেন একজন বাস্তবধর্মী কবি। তাঁর কবিতা গাম্ভীর্য এবং আবেগপূর্ণ। তিনি থাং সমাজের, বিশেষ করে আন লুশান ও শি সিমিং-এর বিদ্রোহের আগে ও পরে কৃষকদের দুর্দশাপন্ন অবস্থা অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন তাঁর রচনায়। কাব্য স্বষ্টিতে পাই চ্যু-ই লোক-কাব্য রীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সমাজের আব-র্জনা তাঁর কাব্যে সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করেন। থাং রাজবংশের শেষার্ধের বিখ্যাত কবি যেমন তু মু (৮০৩—৮৫৩) এবং লি শাংইন (৮১৩—৮৫৮) তাঁদের কাব্যে স্বকীয় রীতি প্রয়োগ করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিফলিত করেছেন।

বিখ্যাত চিন্তাবিদ এবং প্রাবন্ধিক হান ইয়ু (৭৬৮—৮২৪) ছিলেন ছন্দহীন গদ্য রচনার প্রবক্তা। তিনি সাধারণ সাধুভাষায় সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনা প্রবর্তন করেন। তিনি কনফুসিয়াসবাদের সমর্থক ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম ও তাওবাদের বিরোধিতা করতেন। বিপ্লবী সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদ হিসেবে হান ইয়ু ছন্দহীন গদ্য প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃত ছিলেন, আর তাঁর এই রীতি উত্তর সোং যুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। উত্তর সোং-এর সময়ে এবং তার পরে আবির্ভূত যুক্তিবাদ-দর্শন বা নয়া কনফুসিয়াসবাদের পথিকৃতদের মধ্যেও হান ইয়ু ছিলেন একজন অন্যতম ব্যক্তি।

থাং যুগে শিল্প স্বষ্টি অত্যুচ্চ মান প্রাপ্ত হয় এবং বহু খ্যাতি-সম্পন্ন শিল্পী ও ভাস্করদের সমাবেশ হয়। উ তাওজি'র মানুষের ছবি অঙ্কন, ওয়াং ওয়েই (৬৯৯—৭৫৯)-এর নৈসর্গিক দৃশ্য অঙ্কন এবং তুনহুয়াং পর্বতগুহায় সংরক্ষিত থাং যুগের বহু দেয়াল-চিত্র চীনা শিল্প ইতিহাসে পথনির্দেশকরূপে চিরকাল বিরাজ করবে। ইয়াং হুইচি'র ভাস্কর্য গঠন এবং প্রকাশভঙ্গীতে অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে যশ অর্জন করেছে। থাং যুগের ঐশ্বর্যময় ভাস্কর্যের নমুনা তুনহুয়াং-এ সংরক্ষিত আছে। এই যুগে নৃত্য এবং সঙ্গীতও বিকাশলাভ করে।

আলোচ্য যুগে বিভিন্ন ধরণের ধর্ম প্রচলিত ছিল। উত্তর রাজবংশের শাসন-কালে চীনে জরাথুস্ট্রধর্ম প্রবর্তিত হয়। নেস্টোরিয়ান-খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, মনি-ধর্মও এই যুগে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ব্যাপক ধর্ম-বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম এবং তাওধর্ম হলেও প্রাধান্য লাভ করে বৌদ্ধধর্ম। থাং যুগে এই ধর্ম বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তারলাভ

করে এবং এই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকাশলাভ করে ধ্যান সম্প্রদায়। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ধর্মপ্রাণ এবং পণ্ডিত ভিক্ষুরা সুদূর ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। এইসব বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যুয়ান চুয়াং (হিউয়েন সাঙ ৫৯৬—৬৬৪) এবং ই চিং (৬৩৫—৭১৩)। তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে আহৃত বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

থাং যুগে বৌদ্ধধর্ম মানুষের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে। দান হিসেবে বৌদ্ধমঠগুলি জমি ও ফল-বাগান পেয়ে এবং বল-প্রয়োগ অথবা অন্যান্য উপায়ে দখল করে বৃহৎ ভূখণ্ড, চাষের জমি এবং শস্যাদি চূর্ণনার্থে জলস্রোত দ্বারা চালিত কলের অধিকারী হয়। এই মঠগুলি কৃষকদের মধ্যে এক ধরণের তেজারতী কারবারেও লিপ্ত থাকে। বৌদ্ধমঠগুলিকে কর-প্রদান থেকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার জন্য সম্রাট উ জোং-এর শাসনকালে (৮৪১—৮৪৬) রাজকোষের আয় গুরুতররূপে বিঘ্নিত হয়, তার জন্য ভিক্ষুদের সাংসারিক জীবনে ফিরে যাবাব জন্য একটি আদেশ জারী করতে হয়। কিন্তু স্যুয়ান জোং (রাজত্বকাল ৮৪৭—৮৫৯) সিংহাসনে আরোহণ করলে ভিক্ষুদের মন্দিরে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং বৌদ্ধধর্ম পুনরায় তার বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়।

সোং রাজবংশ (৯৬০—১১২৬)-এর দ্বারা চীনের একীকরণ: ৯৬০ খৃষ্টাব্দে, চাও খুয়াংইন (৯২৭—৯৭৬) নামে পরবর্তী চৌ রাজবংশের একজন সামরিক কর্মচারী একটি বিদ্রোহ সংঘটিত করে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শাসকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেন এবং সোং রাজবংশের পত্তন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল হোনানের খাইফেং নামক স্থান। ইতিহাসে এই রাজবংশ উত্তর সোং রাজবংশ নামে খ্যাত।

এই রাজবংশের শাসনের প্রথম কয়েকটি বছরের মধ্যেই দশ-রাজ্যের চিংনান, শু, দক্ষিণ-হান, দক্ষিণ-থাং এবং উইয়ুয়ে রাজ্যগুলোকে বশীভূত করা হয়। একমাত্র উত্তর শানসীর উত্তর-হান রাজ্য বহুদিন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই সকল রাজ্যের অবসানের পর পাঁচ-রাজবংশ এবং দশ রাজ্য সময়পর্বের বিচ্ছিন্ন চীনের হয় পুনরায় একীকরণ।

চাও খুয়াংইন যিনি পরে সোং সম্রাট থাইজু নামে পরিচিত হন, দেশের একী-

করণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সেজন্য তিনি শাসকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিভেদ না ঘটার একটি নীতি ঘোষিত করেন, উদ্দেশ্য নিজেকে এই বিভেদ থেকে মুক্ত রেখে যাতে জনগণের বিরোধিতা দমন করতে পারেন। এই রাজবংশের বৈদেশিক নীতি ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষাত্মক।

একটি শক্তিশালী রাজবংশ না হলেও সোং সরকার থাং রাজবংশের চেয়েও একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। থাং রাজবংশের শাসন-ব্যবস্থাতে অভিজাত বংশের রাজনৈতিক ঢং ছিল কিন্তু সোং সরকার সামরিক ও অর্থনীতিক উভয় ব্যবস্থাতে কঠোরভাবে আমলাতান্ত্রিক ঢং অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল। সামরিক ব্যাপারে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রের মন্ত্রীসভার হাতে ছিল। স্থানীয় অর্থনীতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও প্রেরিত রাজ-কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য সোং সরকার কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করে, যেমন সেচপ্রণালী-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং পতিত জমি উদ্ধারের জন্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও সোং রাজবংশের যুগে গ্রামীণ অর্থনীতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। এর প্রধান কারণ হল যে, থাং রাজবংশের শেষার্ধে কৃষক যুদ্ধের পরাজয় এবং থাং রাজত্ব ও পাঁচ রাজবংশের শাসনকাল থেকে ভূস্বামীদের জমির মালিকানা অধিকারের স্থিতিশীল অবস্থা। দেশের কর্ষণো-পযোগী জমির অধিকাংশই তখনও অভিজাত ব্যক্তি, ভূস্বামী এবং বণিকদের অধি-কারে ছিল যারা কর দিত না অথবা কোন শ্রমদান করত না। এই সকল বৃহৎ ভূস্বামীদের "রাজকর্মচারী পরিবার" অথবা "প্রভাবশালী পরিবার" বলে আখ্যা দেওয়া হত। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং তাও-পুরোহিতদেরও কর প্রদান ও শ্রমদান থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। তাদের যথাক্রমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পরিবার ও তাওভুক্ত পরিবার বলা হত। স্বল্পজমির অধিকারী কৃষকেরা, কারি-গরেরা এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা করের বোঝা বহন করতেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার: সোং রাজবংশের আমলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ-আকর, টিন এবং সীসা ইত্যাদি পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হত। জ্বালানী-দ্রব্য হিসেবে এবং লৌহ ঢালাইয়ে কয়লা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, এবং দু'শতরও অধিক প্রতিষ্ঠান খনি এবং ধাতুদ্রাবণের সঙ্গে জড়িত ছিল। জাহাজ নির্মাণের কৌশল অনেক অগ্রগতিলাভ করেছিল এবং মনুষ্য-চালিত চক্র-বৈঠাযুক্ত

জাহাজ সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। ইতিপূর্বেই নাবিকেরা কম্পাস ব্যবহার করতে জেনেছিলেন এবং যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার হত। সুতা-কাটা ও বয়ন-প্রণালী, কাগজ ও লাক্ষাদ্রব্য তৈরি, বিশেষ করে সুই এবং থাং সময়পর্বে উদ্ভাবিত মুদ্রণ-কৌশল ও চীনামাটির দ্রব্যতৈরি — যা চিন রাজবংশের আমলেই উন্নতি-লাভ করেছিল — ইত্যাদি শিল্প আরও অগ্রগতিলাভ করেছিল।

হাজার হাজার কর্মী সরকার-চালিত ধাতুদ্রাবণ কারখানা, বস্ত্রবয়ন-মিল এবং অস্ত্রনির্মাণ কারখানাতে নিযুক্ত ছিল , আর এই সকল কর্মীদের অধিকাংশই দিন-মজুরীরূপে কাজ করত। পাঁচ-রাজবংশ এবং দশ-রাজ্যের সময়েই নগর ও শহর-গুলো বিকাশলাভ করেছিল, কিন্তু এই সময়পর্বে এই সকল নগর ও শহর আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। কোন কোন শহরের চা, লবণ অথবা চালের ব্যব-সায়ীরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হয়েছিলেন বলে গৌরব বোধ করতেন।

সম্রাট চেন জোং-এর রাজত্বকালে (৯৯৮—১০২২) বিভিন্ন ধরণের কাগজের মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। হুণ্ডিরও ব্যবহার ছিল এবং তা কাগজের মুদ্রারূপে বাজারে চলতি ছিল।

ওয়াং আনশি (১০১৯—১০৮৬) কর্তৃক সংস্কার প্রচেষ্টা এবং তাঁর ব্যর্থতা : ভূস্বামী কর্তৃক জমি দখল, কর-প্রদান ব্যবস্থা, তেজারতী কারবার এবং বেগার শ্রমদান প্রথা গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করেছিল। সম্রাট চেন জোং-এর রাজত্বকালের প্রথম থেকে সোং রাজবংশ খিতান এবং পশ্চিম সিয়া রাজ্যদ্বয়কে বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ যে বিশাল পরিমাণের উপঢৌকন প্রদান করত তার ভার বিশেষ করে কৃষকদেরই বহন করতে হত। হোপেই এবং শানতোং-এ বৃহদাকারের দুর্ভিক্ষ হবার পর সম্রাট রেন জোং-এর রাজত্বকালে (১০২৩—৬৩) ভুখা-কৃষকদের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সেই সঙ্গে খিতানদের হুমকিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং যখন শেন জোং (রাজত্বকাল ১০৬৬—৮৫) সিংহাসনে আরোহণ করেন তার আগে থেকেই সোং রাজবংশ অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সংকটের সম্মুখীন হয়। সুতরাং ওয়াং আনশি কর্তৃক সংস্কার ছিল এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।

চীনের ইতিহাসে ওয়াং আনশি একজন অনবদ্য রাজনীতিবিদরূপে পরিগণিত হন। সমাজের দ্বন্দ্ব ও ব্যাধির মূল কারণ কি তা বুঝতে পেরে তিনি কয়েকটি সংস্কারমূলক পন্থা গ্রহণ করে অটলভাবে তা পালন করতে চেয়েছিলেন।

এই সংস্কারগুলোতে কৃষক, হস্ত-শিল্পের কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র জমিদারদের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বৃহৎ ভূস্বামী এবং বণিকসম্প্রদায়। যেমন তাঁর জমি জরিপ আইন এবং সম-করপ্রদান আইনের উদ্দেশ্য ছিল কর ফাঁকি দেয়া ভূস্বামীদের অধিকৃত জমির পরিমাণ অনুযায়ী কর দিতে বাধ্য করা। তাঁর সম-বণ্টন আইনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে বিত্তশালী বণিক এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীরা রাজ্যের সংকটময় পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। তাঁর অপক্ক ফসল আইন দ্বারা সরকার কর্তৃক কৃষকদের স্বল্প সুদের হারে টাকা ধার দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে ভূস্বামী এবং বিত্তশালী বণিকদের কর্তৃক কৃষকদের ফসল পাকবার আগে চড়া-সুদে টাকা ধার দেওয়ার পন্থা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। তাঁর বৃত্তি-অব্যাহতি আইন অনুযায়ী যে সকল বৃহৎ ভূস্বামী সরকারের কোন সেবা করতেন না তাদের শ্রমের পরিবর্তে অর্থপ্রদান করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য আইনের উদ্দেশ্য ছিল অসাধু বণিকদের দ্রব্যমূল্যে হেরফের করা থেকে নিবৃত্ত করা।

ওয়াং আনশি স্থানীয় বাহিনী গঠন এবং সামরিক কার্যে ব্যবহারের জন্য ঘোড়ার লালনপালন সম্পর্কে আইন প্রবর্তন করেন। তিনি সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন করেন ও নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেন এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পীতনদীর উত্তরাঞ্চলে ৩৬টি সেনাশিবির স্থাপিত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ ভূস্বামী ও বণিকদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা, আসন্ন শ্রেণীসংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখা এবং খিতান ও পশ্চিম সিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করা।

বৃহৎ ভূস্বামী এবং বণিকেরা, যাদের মধ্যে ছিলেন সিমা-কুয়াং (১০১৯—১০৮৬) ভূস্বামীশ্রেণীর আদর্শ প্রতিনিধি, তীব্রভাবে ওয়াং আনশি'র সংস্কারের বিরোধিতা করেন। সম্রাট শেন জোং-এর মৃত্যুর অনতিকাল পরই এই সকল সংস্কারমূলক আইনগুলো রহিত করা হয়। এর পর হুই জোং (রাজত্বকাল ১১০১—১১২৫)-এর মন্ত্রীরাও সংস্কার আনতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা "নূতন আইন" প্রবর্তন করেন। বস্তুতঃ এই সকল নূতন আইন নামেই নূতন ছিল, প্রকৃতপক্ষে এতে কৃষকদের প্রতি শোষণ আরও বৃদ্ধি পায় এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের স্বার্থহানি করা তো দূরের কথা তারা এতে আরও উপকৃত হয়। ফলস্বরূপ, সোং চিয়াং এবং ফাং লা (?—১১২১)-র নেতৃত্বে পরপর কয়েকটি কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

উত্তর সোং রাজবংশের পতন: সোং রাজবংশের তিনশত বিশ বছর শাসন-কালের মধ্যে চীনের উত্তর সীমান্তের বাইরে কয়েকটি উপজাতির উত্থান হয় এবং তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে যাদের চীনে অনুপ্রবেশ ঘটে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হল খিতান, তারপর ন্যুচেন এবং পরে মঙ্গোল উপজাতি।

সোং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা থাই জোং এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা বরাবর বহির্নীতিতে আপোষমূলক মনোভাব এবং অভ্যন্তরীণ নীতিতে উৎপীড়ন নীতি গ্রহণ করে স্বজাতিভুক্ত লোকেদের দমন করার জন্য জাতীয় সম্পদের অপচয় করেন। তারা বার বার বহিঃআক্রমণকারীদের হাতে মাতৃভূমির ভূখণ্ড সমর্পণ করে দারুণ অপমানকর শর্তে শান্তি স্থাপিত করে।

১০০৪ খৃষ্টাব্দে সোং রাজবংশ কর্তৃক লিয়াও (খিতান)-এর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে শুরু হয় কয়েকটি জাতীয় মর্যাদা-হানিকর ঘটনা। এই চুক্তি স্বাক্ষর করে সোং শাসকেরা খিতানদের বাৎসরিক ১০০,০০০ আউন্স রৌপ্য এবং ২০০,০০০ গাঁট সিল্ক উপঢৌকন দিয়ে সাময়িকভাবে শান্তি ক্রয় করেন।

খিতানদের আক্রমণের সময়েই ছিয়াং জাতির একটি শাখা আধুনিক নিংসিয়া, কানসু এবং উত্তর সেনসী অঞ্চল দখল করে পশ্চিম সিয়া রাজ্য (১০৩৮—১২২৭) প্রতিষ্ঠিত করে। তারা অনবরত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে হামলা করত। সোং রাজসরকার তাদেরও রৌপ্য এবং সিল্ক দান করে আপোষ রফা করতে চেষ্টা করতেন।

১১১৫ খৃষ্টাব্দে চীনের উত্তর-পূর্বে ন্যুচেন জাতির আবির্ভাব হয় এবং তারা চিন রাজ্য (১১১৫—১২৩৪) প্রতিষ্ঠিত করে। সোং শাসকেরা খিতানদের আক্রমণ করার জন্য ন্যুচেনদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এই আশায় যাতে তাদের সহায়তায় ইয়ানচিং ফিরে পেতে পারেন। ন্যুচেন খিতানদের পরাস্ত করে, কিন্তু ইয়ানচিং সোং রাজ্যকে প্রত্যার্পণ না করে এই স্থান তারা নিজেদেরই অধিকারে রাখে।

অতঃপর, ন্যুচেনরা দক্ষিণ দিকে অভিযান শুরু করে সোং রাজবংশের অবসান ঘটাতে। সোং সম্রাট হুই জোং এবং তাঁর শাসকচক্র ভোগবিলাসে কালযাপন করে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারা আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেয়ে দুর্লভ ফুলের গাছ রোপণ এবং রাজপ্রাসাদ ও উদ্যানকে শোভনীয়

করে তোলাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে ন্যুচেনরা যখন সোং রাজধানী খাইফেং দখল করে, তখন তারা সম্রাট হুই জোংকে যিনি ইতিমধ্যে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন এবং তার উত্তরাধিকারী পুত্র সম্রাট ছিন জোংকে বন্দী করে। সেই সঙ্গে উত্তর সোং রাজবংশের পতন হয়।

দক্ষিণ সোং রাজবংশের (১১২৭—১২৭৯) পত্তন: ১১২৭ খৃষ্টাব্দে হুই জোং-এর আর একজন পুত্র সম্রাট কাও জোং (রাজত্বকাল ১১২৭—৬২)-এর নেতৃত্বে কিছু বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারী ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে লিন-আন (হাংচৌ)-এ একটি নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইতিহাসে তা দক্ষিণ সোং রাজবংশ নামে খ্যাত।

ঐ সময়ে ন্যুচেনরা নিরন্তর পীতনদী অববাহিকা আক্রমণ করত এবং কৃষকেরা তাদের সঙ্গে প্রায়ই সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন। জাতীয় বীর সোং সেনাপতি ইয়ুয়ে ফেই (১১০৩—৪১) একটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করে ন্যুচেনদের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানলেন। কিন্তু তখনকার দক্ষিণ সোং সরকার কয়েকজন আপোষপ্রিয় ব্যক্তিদের অধিকারে ছিল এবং তাদের নেতা ছিল ছিন হুই। তাবা ইতিমধ্যেই হুয়াই নদীর উত্তরে এবং পশ্চিমে তাসানকুয়ান গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ন্যুচেনদের দান করে দিয়েছিল। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলে সাময়িকভাবে শান্তি বজায় রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা শত্রুদের তুষ্ট করার জন্য কৃষকদের সশস্ত্রবাহিনীকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে এবং ইয়ুয়ে ফেইকে হত্যা করে ও সীমান্ত থেকে সোং সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে আসে।

তা সত্বেও ন্যুচেনরা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ করতে করতে তারা ইয়াংসি নদীর তীরে পেঁ ৗছল। কিন্তু জনগণের এবং দক্ষিণা-ঞ্চলের সশস্ত্রবাহিনীর অটল প্রতিরোধের ফলে দক্ষিণ সোং রাজবংশ অবশেষে ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ইতোমধ্যে উত্তর চীনের বহু সংখ্যক রাজকর্মচারী, ভূস্বামী এবং বণিকেরা পালিয়ে দক্ষিণ চীনে এসেছিলেন। তারা সঙ্গে আনেন তাদের অবক্ষয়ী জীবনযাপন-ধারা। তারা স্থানীয় লোকেদের উপর বেগার শ্রমদানপ্রথা চালু করেন এবং অসহনীয় কর ধার্য করেন।

রাজনৈতিক কেন্দ্র দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হবার জন্য দক্ষিণ সোং-এর

রাজধানী লিনআন একটি জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হয়। আরও বহু নগর ও শহর গড়ে ওঠে। উত্তর সোং-এর সময়ে চিয়ানখাং (আধুনিক নানচিং) প্রি-ফেক্চারের অধীনে চোদ্দটি শহর ও বিশটিরও অধিক গঞ্জ ছিল। এই সকল শহর ও গঞ্জগুলো আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। কুয়াংচৌ, মিংচৌ (আধুনিক চেচিয়াং প্রদেশের নিংপো) এবং ছুয়ানচৌ (আধুনিক ফুচিয়ানের চিনচিয়াং) বহির্বাণিজ্যের বন্দররূপে গড়ে ওঠে। এই সকল বন্দরে বাণিজ্যবিষয়ে ভার-প্রাপ্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন এবং তাঁরা শুল্ক আদায় করতেন। বহু বিদেশী বণিক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এখানে আসতেন, এবং কুয়াংচৌতে একটি এলাকা ছিল যেখানে কেবলমাত্র বিদেশীরা বসবাস করতেন। ছেংতু, চিয়াংলিং এবং সুচৌ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এই শহরগুলোতে হস্তশিল্প অসামান্য উন্নতিলাভ করে। সরকারী এবং ব্যক্তিগত অধিকারে বারুদ ও অস্ত্র তৈরি, সমুদ্র-যাত্রার উপযোগী জাহাজ তৈরি এবং বস্ত্রবয়ন প্রণালীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ফুচিয়ান, কুয়াংতোং ও কুয়াং-সিতে শিমুলগাছের চাষ হত এবং পরে এর চাষ ইয়াংসি নদীর মধ্য-অব-বাহিকায় বিস্তারলাভ করে। এইভাবে তন্তু-শিল্পে আর একটি উপাদানের উদ্ভব হয়।

দক্ষিণ সোং রাজবংশের পতন : ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ওনোন নদীর উপত্যকায় মঙ্গোল যাযাবর-জাতি চেঙ্গিস খানের (১১৫৫—-—১২২৭) নেতৃত্বে আবির্ভূত হয় এবং পৃথিবীতে একটি প্রবল পরাক্রমশালী শক্তিতে পরিণত হয়। ১২১৮ থেকে ১২৫৩ খৃষ্টাব্দ — এই তিন দশকের মধ্যে এই মঙ্গোল জাতি ঝটিকার ন্যায় প্রায় সারা পৃথিবীর উপর ধাবিত হয়েছিল। তারা পশ্চিম অঞ্চলের বহু রাজ্য এবং পশ্চিম সিয়া রাজ্যকে পরাস্ত করে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং সম্পূর্ণ মধ্য-এশিয়া, রাশিয়া এবং বহু ইউরোপীয় দেশকে তাদের অধিকারে আনতে সক্ষম হয়। ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে তারা চীনে ন্যুচেন শাসনের অবসান ঘটায়।

পরবর্তী ৪৬ বৎসর ধরে দক্ষিণ সোং রাজবংশ মঙ্গোলদের আক্রমণের ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকত। মঙ্গোলরা মুখোমুখি আক্রমণ না করে একটি চক্রবৎ কৌশল অবলম্বন করল। মঙ্গোল সেনারা ছিংহাইয়ের তৃণভূমি ভেদ করে প্রথমে ইয়ুন্নান ও তিব্বত এবং পরে সিছুয়ান দখল করে। ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে, কুবলাই খানের (রাজত্বকাল ১২৬০—৯৪) নেতৃত্বে মঙ্গোল সেনারা দক্ষিণ-সোং রাজবংশের

রাজধানী লিনআন অধিকার করে। কুবলাই খান পরে ইউয়ান রাজবংশের ইতিহাসে সম্রাট শি জু নামে অভিহিত হন। ওয়েন থিয়ানসিয়াং (১২৩৬—১২৮২), চাং শিচিয়ে (? —১২৭৯) এবং লু সিউফু (১২৩৮—৭৯) এই তিনজন জাতীয় বীর নামে খ্যাত ব্যক্তির নেতৃত্বে জনগণ ও সোং সেনারা প্রবল প্রতিরোধ করেও অবশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুসেনাদের দ্বারা পরাজিত হয়। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলরা কুয়াংতোং অধিকার করে সোং-এর সর্বশেষ সেনাবাহিনীর অংশকে ধ্বংস করে। এইভাবে সমগ্র চীন মঙ্গোলদের আধিপত্যে আসে।

মুদ্রণ কৌশল এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি: সুই এবং থাং যুগেই সুদূরপ্রসারিত মুদ্রণ কৌশল উদ্ভাবিত হয়। এর ফলে ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং অগ্রগতিলাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

মুদ্রণ কৌশল উদ্ভাবনের পূর্বে সমস্ত চীনা গ্রন্থ হাতে লিখে নকল করা হত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে কাঠের উপর লিপি খোদাই করে কাঠের ছাঁচ তৈরি হয়ে তা মুদ্রিত হত। ৮৬০—৮৭৩ খৃষ্টাব্দে থাং রাজবংশের শাসনকালে সুন্দর সুন্দর কাঠের ছাঁচ তৈরি করে নানা অভিধান, বর্ষপঞ্জী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছিল। পাঁচ-রাজবংশের রাজত্বকালে খোদাই কৌশল আরও উন্নতি-লাভ করেছিল এবং ব্যাপকভাবে কাঠের ছাঁচ ব্যবহৃত হত। ৯৩২ খৃষ্টাব্দে পরবর্তী থাং রাজসরকারের আমলে কনফুসিয়াসের "নয়টি গ্রন্থ" কাঠের ছাঁচের সাহায্যে মুদ্রিত হয়েছিল। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলে এবং বিশেষ করে সিছুয়ানে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ এইভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। ৯৮১ খৃষ্টাব্দে ৫০৪৮ খণ্ডবিশিষ্ট বৌদ্ধ-ত্রিপিটক গ্রন্থের মুদ্রিত সংখ্যা লোকেরা পেতে পারত।

সোং রাজবংশের সম্রাট রেন জোং-এর রাজত্বকালে (১০২৩—১০৬৩) মুদ্রণ কৌশল সমুচ্চ মান ও নৈপুণ্য লাভ করে। পি শেং নামক এক ব্যক্তি আঠালমাটি দিয়ে পৃথক পৃথক মুদ্রাক্ষর তৈরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর পর বৃহদায়তনের গ্রন্থ যেমন "থাইফিং রাজত্বকালের রাজকীয় জ্ঞানকোষ", "লিয়াং রাজবংশের শেষ যুগের সাহিত্য-সঙ্কলন", এবং "সম্রাট ও মন্ত্রীদের জীবনী তথ্য-সঙ্কলন" মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থগুলো প্রত্যেকটি এক হাজার খণ্ডে বিভক্ত। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রবর্তনের ফলে পূর্বেকার হস্তলিখিত বেলনাকারে পাকান পুস্তক সুতার বাঁধাই-করা সমকোণী চতুর্ভুজ আকার ধারণ করল এবং পুস্তক প্রকাশনার সংখ্যাও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। উত্তর সোং রাজবংশের সরকারী গ্রন্থালয়ে ৭০,০০০

পুস্তক ছিল। কোন কোন ব্যক্তিগত সংগ্রহকারীদের গ্রন্থালয়ে ১00,000 পুস্তকও সংগৃহীত ছিল।

ব্যাপক পুস্তক প্রকাশনার ফলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণতঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রই বিস্তারলাভ করে এবং বিভিন্ন বিদ্যার বিশেষ বিশেষ শাখাও অগ্রগতিলাভ করে। সোং রাজবংশের তুই জোং-এর রাজত্বকালে প্রণীত "ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী" তে ৮৯৩টি বনৌষধির ও তাদের গুণ সম্বন্ধে একটি তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই একই যুগে লি চিয়ে লিখিত "স্থাপত্যশিল্প নির্মাণকৌশল"-এ চীনা গৃহনির্মাণের পদ্ধতি এবং চিত্র ও রং সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকে থাং রাজবংশের যুগ থেকে উত্তর সোং রাজবংশ পর্যন্ত চীনা স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানা যায়। সোং রাজবংশের রেন জোং-এর রাজত্বকালে সঙ্কলিত "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কৌশল" নামক পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদে বারুদ তৈরির পুংখানুপুংখ বিববণ দেওয়া হয়েছে।

সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল কনফুসিয়াস দর্শনভুক্ত যুক্তিবাদ দর্শন বা নব্য-কনফুসিয়াসবাদ নামে একটি নূতন শাখার আবির্ভাব। এই দর্শন, বৌদ্ধদর্শন বিশেষ করে তার ধ্যান-সম্প্রদায়ের দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ কিনা কনফুসিয়াস ভাবধারা আরও অধিবিদ্যায় পরিণত হয়। ছেং ই (১0৩৩ —১১0৭), চু সী (১১৩0—১২00) এই দু'জন ব্যক্তি নব্য-কনফুসিয়াসবাদ দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করার দক্ষতাও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিলাভ করে। ঔইয়াং সিউ (১00৭—৭২) রচিত "পাঁচরাজবংশের ইতিহাস", সিমা কুয়াং (১0১৯—৮৬) রচিত "ইতিহাস দর্পণ" এবং চেং ছিয়াও (১১0৪—৬২) রচিত "ইতিহাস সঙ্কলন" এবং ইউয়ান শু (১১৩১—১২0৫) রচিত "ইতিহাস দর্পণে উল্লিখিত ঘটনার তথ্য" প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ বলে সর্বজনস্বীকৃত।

সোং রাজবংশ সময়কার সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধান অবদান হল 'ছি' নামে একটি নূতন রীতিতে লিখিত পদ্য রচনা। স্বর এবং অনুরূপ ধ্বনি-সাদৃশ্যতে সীমাবদ্ধ হওয়া ব্যতীত এই ধরণের রচনায় বাক্যের পরিধিতে কোন সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশভঙ্গী ব্যক্ত করতে এই রচনা পূর্বে ব্যবহৃত কাব্য রচনার রীতির চেয়ে উপযোগী ছিল। সোং রাজবংশের কালে যে সকল উল্লেখযোগ্য 'ছি' রীতি অনুরাগী কবির আবির্ভাব হয়েছিল

তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিন ছিচি (১১৪০—১২০৭) এবং মহিলা কবি লি ছিংচাও (১০৮১— ?)।

ইউয়ান রাজবংশের পত্তন (১২৭১—১৩৬৮): ১২৭১ খৃষ্টাব্দে কুবলাই খান ইউয়ান রাজবংশের পত্তন করেন এবং ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ সোং রাজবংশকে পরাস্ত করেন। মঙ্গোল শাসনের ৮৯ বৎসরে হান এবং অন্যান্য জাতিসত্তার লোকেরা জাতীয় ও শ্রেণীগত অত্যাচার ভোগ করে।

ইউয়ান রাজবংশ রাজ্যের অধিবাসীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ছিল মঙ্গোলীয় এবং তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল সেমু লোকেরা (এরা পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসেছিল)। এর পরের শ্রেণী ছিল হান জাতির লোকেরা, এবং সর্বনিম্ন শ্রেণী ছিল দক্ষিণ চীনের হান অধিবাসীরা।

দক্ষিণ চীনের হান অধিবাসী সমেত সমগ্র হান লোকেদের জাতীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদ থেকে এবং উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। তাঁরা স্থানীয় স্তরের কর্মচারী হতে পারতেন, তবে তাঁদের কোন মঙ্গোলীয় অথবা সেমু জাতির লোকের পরিচালনাধীনে কাজ করতে হত। তাদের অনুমতি ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

কুবলাই খানের একচ্ছত্র শাসনাধীনে কৃষি উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হয় এবং উত্তর চীনে তা কিছুটা উন্নতিলাভ করে। কিন্তু সবদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, মঙ্গোলীয় অভিজাত ব্যক্তিদের শাসন চীনের সামাজিক আর্থনীতির অগ্রগতিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ভূমি গ্রাস করতে মঙ্গোলীয়রা যে নির্মম পন্থা অবলম্বন করত চীনের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। উত্তর পীতনদীর বিশাল ভূখণ্ড পশুচারণ তৃণভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। পীতনদীর দক্ষিণাঞ্চলেও ভূমি গ্রাস করা হয়েছিল, কিন্তু এই অঞ্চলের অবস্থা উত্তরাঞ্চলের তুলনায় ভাল ছিল। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ কূলবর্তী স্থানে দক্ষিণ-সোং রাজবংশ সময়কার অবস্থা বজায় ছিল।

খিতান এবং দক্ষিণ সোং রাজবংশের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জমি মঙ্গোলীয় অভিজাতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই জমির পরিমাণ ২০ ছিং* থেকে

* ১ছিং —১০০ মু, অথবা ৬.৬৬ হেক্টর বা ১৬.৪ একর

৫০০০ ছিং পর্যন্ত ছিল। বহু জেলাতে কৃষকদের আবাদী জমি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মঙ্গোলীয় সেনা শিবিরকে দেয়া হয় অথবা বৌদ্ধবিহার-কে দান করা হয়। ইউয়ান সম্রাট উ জোং-এর রাজত্বকালে (১৩০৮—১১) ২০০টি 'সেনা শিবির-চাষভূমি' ছিল এবং এদের মোট আয়তন ছিল ১৭২,০০০ছিং। বৌদ্ধবিহারকে অবিশ্বাস্য পরিমাণের ভূমিদান করা হয়েছিল। একমাত্র হুশেং বৌদ্ধবিহারকে সম্রাট শুন তি (১৩৩৩—৬৮) ১৬২,০০০ ছিং ভূমি দান করেছিলেন। রাজকুমারেরা, রাজকর্মচারীরা এবং পুরোহিতেরা অবাধে সর্ব-সাধারণের জমি গ্রাস করে পশুচারণ ভূমিতে পরিণত করতেন অথবা খাজনা নিয়ে চাষ করতে দিতেন। ইয়াংসি নদীর মধ্য ও নিম্ন-অববাহিকায় হান জাতীয় ভূস্বামীরাও বিনা বাধায় জমি কেড়ে নিতেন। কোন কোন জেলাতে চাষের জমির ছ'ভাগের পাঁচ ভাগ ভূস্বামীদের অধিকারভুক্ত ছিল, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন বাৎসরিক ২০০,০০০ অথবা ৩০০,০০০ শি* খাজনা হিসেবে আয় করতেন এবং তাদের অধীনে দশ হাজার পর্যন্ত কৃষক পরিবার শ্রম করত।

ভূমি গ্রাস করা ছাড়া ইউয়ান শাসকেরা কৃষকদের ঘোড়া কেড়ে নিয়ে সামরিক কাজে ব্যবহার করত। একটি হিসাব অনুযায়ী, এই রাজবংশের স্বল্প শাসনকালে কৃষকদের কাছ থেকে ৭০০,০০০ ঘোড়া কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই সকল ঘোড়া উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের শকট এবং লাঙ্গল চালনার জন্য ব্যবহৃত হত। ঘোড়া কেড়ে নেবার ফলে কৃষি উৎপাদনের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন হয়। বহু সংখ্যক শকটযান এবং নৌকা সামরিক কাজে লাগান হয়েছিল। এই দুটি অবস্থার ফলে গ্রামে যান-চলাচল ব্যবস্থায় খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

উত্তর চীনের অধিকাংশ কৃষকেরা ভূমি, ঘোড়া, শকট-যান এবং নৌকা থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়ে মঙ্গোলদের দাসে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের জমি চাষ করতে অথবা বিনা পারিশ্রমিকে গরু ও ভেড়া চারণ করতে বাধ্য করান হত। দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ কৃষক বৃহৎ ভূ-স্বামীদের প্রজারূপে ভূমি-করের চেয়েও অধিক খাজনা দিতে বাধ্য হত। তাদের অন্যান্য ধরণের বেগার খাটতে হত। কোন কোন জেলাতে ভূস্বামীদেরকে

* ১শি = প্রায় ১ পিকুল

তাদের প্রজাদের ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রয় করা অথবা অন্য ভূস্বামীদের ভাড়া দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল।

যে সকল কৃষক নিজেদের ভূমি রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের ভূমি-কর এবং মাথাপিছু-কর দিতে হত। প্রতি মু জমির কর ছিল তিন শেং খাদ্যশস্য এবং মাথাপিছু করের পরিমাণ ছিল তিন শি খাদ্যশস্য। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ ভূখণ্ডে এই কর-বাবদ চাল ও নগদ মুদ্রা দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, যেমন এক-তৃতীয়াংশ চাল এবং বাকী অংশ নগদ মুদ্রা। বেগার শ্রমেও সিল্ক এবং রৌপ্য দিয়ে রেহাই পাওয়া যেত। এই উচ্চ কর ও বাধ্যতামূলক শ্রমদান বহু কৃষকদের বাধ্য করল তাদের জমি মঙ্গোলীয় অভিজাত ব্যক্তিদের অর্পণ করতে এবং তাদের প্রজা হয়ে থাকতে।

ইউয়ান রাজবংশ যুগের কারিগরি শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য: ইউয়ান রাজবংশ যুগে কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ঘটলেও অভিজাত পরিবারদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করার তাগিদে হস্তশিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করেছিল, এবং উৎপাদনে উচ্চমান প্রাপ্ত হয়েছিল রাজসরকারের পরিচালনাধীনে হস্তশিল্পসমূহ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, বাঁশ, কাঠ, যসম, পাথর এবং জেল্লা-দেয়া চীনামাটি-নির্মিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহু কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। ইট তৈরির পাঁজা এবং চামড়া পাকা করার কারখানা ও অস্ত্রাদির কারখানাও স্থাপিত হয়েছিল। লৌহ-ঢালাই দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল, একটি শুধু লৌহ ঢালাই করত আর একটি করত ইস্পাত তৈরি। চর্মশিল্প তিনভাগে বিভক্ত ছিল — চামড়া পাকা করা, নরম করা ও মুণ্ডন করা। অস্ত্রনির্মাণ শিল্পে ধনুক, ধনুকের জ্যা, তীর, বর্ম এবং জিন তৈরি করার জন্য পৃথক পৃথক শাখা ছিল।

শহরের ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে হস্তশিল্পও অনুরূপ উন্নতিলাভ করেছিল। "মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত" অনুযায়ী হাংচৌ নগরে এইরূপ প্রচুর ব্যক্তিগত কারখানা ছিল। সরকারী হস্তশিল্প কারখানা এবং অস্ত্রনির্মাণ কারখানাতে নিযুক্ত হাজার হাজার কর্মীরা দাস-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল এবং তারা যে মজুরি পেত তা দিয়ে জীবনযাপন করা খুবই কঠিন ছিল। এই সকল মজদুরদের সরকারী অথবা সামরিক কারিগর বলে আখ্যা দেওয়া হত। দিন মজুরির ভিত্তিতেও মজদুর নিযুক্ত হত এবং তাদের বেসামরিক কারিগর বলা হত।

কুবলাই খানের রাজত্বের আমলে অধুনা শানতোং প্রদেশের অন্তর্গত হুইথোং খাল খনন করা হয়েছিল। কুও শৌচিং (১২৩১—১৩১৬) নামে ইউয়ান যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক থোংহুই নামে খাল (থোংচৌ থেকে পেইচিং পর্যন্ত) খনন পরিকল্পনা ও কার্যকরী করেন। এই খাল খননের ফলে পেইচিং থেকে দক্ষিণ চীনের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর হাংচৌ-এর সঙ্গে সংযোগকারী মহা খাল (তা-ইয়ুনহো) সম্পূর্ণ হয়। এই বৃহৎ খাল থাকায় উত্তর এবং দক্ষিণ চীনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট সুবিধা হয়। ইয়াংসি নদী থেকে শানতোং ব-দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করে পাইহো মোহানা পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের জন্য একটি জলপথ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। কাগজের মুদ্রার বিপুল প্রচলন ছিল। কুয়াংচৌ, ছুয়ান-চৌ, ছিংইউয়ান (নিংপো), শাংহাই, কানফু, ওয়েনচৌ এবং হাংচৌ সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। ডাকবাহক এবং নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ী প্রবর্তনের ফলে অন্তর্দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশের বহু ব্যক্তি চীনে আসতেন। তারা সঙ্গে আনতেন পণ্যদ্রব্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। এই বিদেশীরা চীনা সংস্কৃতিও পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে যেতেন। ভিনিস-দেশীয় মার্কো পোলো দীর্ঘ পনের বছর মঙ্গোল খান দরবারে কাজ করেছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে চীনদেশের সম্পদ ও গৌরব কাহিনী পাশ্চাত্যে প্রচার করেন। তাতে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের চীনা সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ইউয়ান রাজবংশ আমলের সাহিত্য এবং ধর্ম : জা চ্যু নামে পরিচিত নাটক ইউয়ান রাজবংশের যুগে উৎকর্ষ লাভ করে উচ্চতর মানে পৌছল। এই যুগের ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, তখন একশতরও অধিক নাট্যকার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কুয়ান হানছিং, ওয়াং শিফু এবং মা চিইউয়ান এবং আরও কয়েকজন মঙ্গোলীয় নাট্যকার। উপন্যাস রচনাও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই যুগের একটি বিখ্যাত উপন্যাস হল শি নাইআন লিখিত "শুই হু চুয়ান" অর্থাৎ জলাবিলের বীরনায়কগণ।

হান সংস্কৃতির প্রভাবে এসে মঙ্গোল এবং সেমু জাতির ব্যক্তিরাও সাহিত্য ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছিলেন। মঙ্গোলেরা ধর্মের প্রতি এক উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা গোঁড়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন। তবুও ইসলাম ধর্ম ও নেস্টোরীয়ান খৃষ্টধর্ম প্রচার ও

বিস্তারে বাধা দিতেন না। কিন্তু, কখনো কখনো তাঁরা তাওবাদীদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করতেন।

মঙ্গোল অভিজাত ব্যক্তিদের শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট কৃষক বিদ্রোহ: কুবলাই খানের রাজত্বকালে ইউয়ান রাজবংশ তার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে পৌঁছায়। তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজবংশের পতন শুরু হয়। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে রাজকুমারদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয় এবং ঘন ঘন শাসকের পরিবর্তন হতে থাকে। শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্কলহ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পৌঁছায় এবং ১৩০৭ থেকে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরপর আটজন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিজাত ব্যক্তি, রাজকর্মচারী এবং শক্তিশালী ভূস্বামীদের উৎপীড়ন ও অন্যায় দাবী এবং তার সঙ্গে বন্যা, খরা ও দুর্ভিক্ষ সব মিলে হান লোকেদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ইউয়ান রাজবংশের শেষ সম্রাট শুন তি'র শাসনকালে এক বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

ইউয়ান শাসনের বিরুদ্ধে হান কৃষকদের সংগ্রাম দক্ষিণ সোং রাজবংশের পতনের পর থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছিল। উত্তর চীনে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে 'শ্বেতপদ্ম ধর্ম সম্প্রদায়' নাম দিয়ে বহু অভ্যুত্থানে যোগদান করেন। দক্ষিণ চীনে কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা ছিল আরও অধিক। "ইউয়ান রাজবংশের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে: "ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চল অধিকৃত হবার এক দশক পরে দু'শতটি স্থানে ডাকাত ও দস্যুদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।" এই গ্রন্থে আরও উল্লিখিত হয়েছে: "ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলে চার শতরও অধিক ডাকাত ও দস্যু অধ্যুষিত স্থান ছিল।" এই সকল অভ্যুত্থান ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে আর একটি কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আর এই বিদ্রোহের ধ্বজা ধরেন লিউ ফুথোং (? —১৩৬৩), স্যু শৌহুই (? —১৩৬০) এবং কুও জিসিং (? —১৩৫৫)। এদের পদাঙ্কানুসরণ করে সংঘটিত হয় ছেন ইয়ৌলিয়াং (১৩২০—১৩৬৩), চাং শিছেং (১৩২১—৬৭) এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে আরও পরপর কয়েকটি অভ্যুত্থান। সমগ্র পীতনদী, হুয়াইহো এবং ইয়াংসি নদী উপত্যকা অঞ্চলগুলোতে ইউয়ান শাসক এবং তাদের দুষ্কর্মে সহযোগী হান ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলাকালীন বিবদমান নেতারা দেশকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে নিজ নিজ অধিকার বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। অবশেষে, কুও জিসিং-এর

অধীনস্থ চু ইউয়ানচাং (১৩২৮—৯৮) নামে একজন সেনাপতি ইউয়ান শাসনের উৎখাত করে এবং তার বিরোধীদের পরাস্ত করে মিং রাজবংশের পত্তন করেন।

৪. মিং রাজবংশ এবং ছিং রাজবংশ (চতুর্দশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী)

মিং রাজবংশ (১৩৬৮—১৬৪৪): ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মিং রাজবংশের পত্তন হয়। এই রাজবংশের রাজধানী ছিল নানচিং। ইতিহাসে মিং সম্রাট থাই জু নামে খ্যাত চু ইউয়ানচাং এক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পেইচিং থেকে ইউয়ান সম্রাট শুন তি এবং মঙ্গোল অভিজাত ব্যক্তিদের বিতাড়িত করে ইউয়ান রাজবংশের নিষ্ঠুর শাসনের অবসান ঘটালে চীনা ইতিহাসে পুনরায় আবির্ভাব হয় আর একটি পরাক্রমশালী রাজবংশ।

মঙ্গোল অভিজাতদের বিতাড়িত করে চু ইউয়ানচাং বিদ্রোহী নেতাদের বিনাশ করেন এবং তার যে সকল সেনাপতি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বলে তিনি সন্দেহ করলেন তাদের তিনি হত্যা করেন। সমস্ত ক্ষমতা নিজের কর্তৃত্বে রেখে তিনি এক স্বৈরতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত শাসন কায়েম করেন। তিনি সামরিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা পৃথক করে ছয়টি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন ও তাদের হাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভার দেন। এই পরিষদ সরাসরি তাঁর নিকট দায়ী থাকত।

চু ইউয়ানচাং-এর মৃত্যুর পর তাঁর চতুর্থ পুত্র যিনি সম্রাট ছেং জু (১৩৬০—১৪২৪) নামে পরে পরিচিত হন, ভ্রাতুষ্পুত্র চিয়ান ওয়েন তিকে সিংহাসনচ্যুত করে নানচিং থেকে পেইচিং-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ছেং জু এবং স্যুয়ান জোং-এর রাজত্বকালে মিং রাজবংশ তার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে ওঠে। চেং হো (১৩৭১—১৪৩৫) নামে রাজ-দরবারের একজন খোজা-পুরুষ একটি সশস্ত্র নৌবহরের নেতৃত্ব করে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সাতবার দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জ ও ভারত মহাসাগরে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, এবং সেই সকল দেশের অধি-বাসীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে কৃতকার্য হয়ে-ছিলেন। এরপর বহু চীনবাসী ঐ সকল দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং

স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনীতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করেন। চেং হো সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বকূল পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন।

মিং রাজবংশের রাজত্বের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে মঙ্গোল অভিজাতদের পুনরায় অনুপ্রবেশ রোধ করতে বহুবার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে মঙ্গোলিয়াকে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু এই সকল আক্রমণে কোন চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা যায় নি। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট ইং জোং সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধ সংগ্রাম নিজে পরিচালনা করতে গেলে মঙ্গোল সেনারা মিং সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে সম্রাটকে বন্দী করে। মিং রাজবংশের সঙ্গে মঙ্গোলদের কলহ দীর্ঘ-স্থায়ী হয়। উত্তর-পূর্ব চীনের সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্যে মিং রাজবংশের প্রথম যুগের শাসকেরা ঐ সব অঞ্চলে বহু সামরিক জেলা, সেনা-শিবির এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। যেমন, এক সময়ে আধুনিক হেইলোংচিয়াং প্রদেশের খৌমিয়াওচিয়ে অঞ্চলে একটি সামরিক জেলা এবং আধুনিক চিলিন প্রদেশের চিয়ানচৌতে একটি সেনা-শিবির স্থাপিত হয়।

ভূমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত এবং মুদ্রায় খাজনা ব্যবস্থার শুরু: মঙ্গোলদের বিতাড়িত করে সম্রাট চু ইউয়ানচাং সমাজের অর্থনীতিক পুনরুদ্ধার এবং অগ্রগতির উপযোগী কয়েকটি ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে পতিত জমি উদ্ধারের কাজে উৎসাহ দান করা হয়, সেচপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন হয় এবং তুলা চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সেই সঙ্গে কর হ্রাস করা হয়, জমির খাজনা কিছুটা মকুব করা হয় এবং বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের বীজ বিতরণ করা হয়। এই সকল ব্যবস্থাব ফলে শানতোং, হোপেই, হোনান এবং হুয়াইহো নদী উপত্যকা অঞ্চলসমূহে যুদ্ধের জন্য যে সব জমি পতিত হয়ে পড়েছিল সেসব স্থানে পুনরায় খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য ফসল বপন করা হয়।

মিং রাজবংশের আমলে সম্রাট, অভিজাত ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীরা সকলেই জমি দখল করে বিরাট জমিদারি করতে সচেষ্ট ছিলেন। এক সময়ে রাজপরি-বারের খামার জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৭,০০০ ছিং। সম্রাটদের কোন কোন প্রিয় আত্মীয় এবং রাজদরবারে খোজা-পুরুষেরা পৃথকভাবে ৩৩২টি খামারের অধিকারী ছিলেন এবং এই সব খামারের জমির মোট পরিমাণ ছিল ২০,০০০ ছিং। দুইজন রাজকুমার লু এবং ফু যথাক্রমে ৪০,০০০ এবং ২০,০০০ ছিং জমির

মালিক হয়েছিলেন। ডিউক ও মার্কুইস খেতাবধারী ব্যক্তিদের এবং মন্ত্রীদের প্রত্যেকের খামার জমির পরিমাণ সাধারণতঃ ১০০ ছিং-এর কম ছিল না। তারা ক্রয় করে, রাজকীয় দান হিসেবে অথবা জবরদখল করে নিজেদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতেন। অধিকাংশ ভূস্বামী জমি জবরদখলে লিপ্ত ছিল। মিং রাজবংশের শেষার্ধের একজন দেশপ্রেমিক পণ্ডিত কু ইয়ানউ (১৬১৩—১৬৮২) লিখেছেন, "উ (সুচৌ)-এর লোকসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ ছিল জমির মালিক, বাকী আর সকলে ছিল ভূমিহীন।" এ থেকে মিং রাজবংশের শেষার্ধে জমির অধিকার যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তা জানতে পারি।

এই যুগে জমি দু'ধরণের ছিল — রাজার জমি এবং সাধারণ লোকের জমি। প্রথমোক্ত ধরণের জমি ছিল সারা দেশের মোট আবাদী জমির সাত ভাগের এক ভাগ। সুচৌ এবং সোংচিয়াং-এ এই দু' ধরণের জমির আনুপাতিক হার ছিল ১৫ : ১, অর্থাৎ সাধারণ লোকের অধিকারভুক্ত একখণ্ড জমি হলে রাজার জমি ছিল পনের খণ্ড। রাজার জমির কর ছিল মু-প্রতি ৫.৩ শেং, আর সাধারণ লোকের জমির কর ছিল মু-প্রতি ৩.৩ শেং। আরও অন্য ধরণের জমি ছিল, যেমন "উঁচু করের জমি" এবং বাজেয়াপ্ত-জমি। এই জমির করের পরিমাণ ছিল আরও বেশী, কোন কোন জেলায় এই করের পরিমাণ ছিল মু-প্রতি চার তৌ, * এমনকি এক শিও ধার্য হত।

ভূমি-কর বছরে গ্রীষ্মকাল এবং শরৎকালে দুবার খাদ্যশস্য, অথবা রৌপ্য বা কাগজের মুদ্রা দিয়ে দিতে হত। সম্রাট শেন জোং-এর রাজত্বকালে ভূমি-কর, বেগার শ্রমদান এবং অন্যান্য কর বা খাজনা সব মিলে একটি মাত্র করের ব্যবস্থা করা হয়। করের পরিমাণ অধিকৃত জমির আয়তন অনুযায়ী নির্ধারিত হত এবং তা রৌপ্যের মাধ্যমে দেয়া হত। এই প্রথাকে বলা হত "সার্বিক আইন," এবং তাতে মুদ্রায় খাজনা দেয়ার প্রথা চীনে প্রচলিত হয়।

হস্তশিল্প-কারখানার অগ্রগতি, নাগরিক অর্থনীতির বিকাশলাভ এবং ইউরোপীয়দের আগমন : হস্তশিল্পের অগ্রগতিতে মিং রাজবংশ পূর্ববর্তী অন্যান্য রাজবংশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর মুখ্য কারণ ছিল কারিগরদের আধা-ক্রীত-

* এক তৌ = এক পিকুল

দাস অবস্থা থেকে মুক্তি। আর গৌণ কারণ ছিল ইউয়ান রাজবংশের আমলে পাশ্চাত্য দেশ থেকে আগত হস্তশিল্পের নানা কৌশল।

লৌহ গলান, জাহাজ নির্মাণ, সুতা এবং বস্ত্রবয়ন, মুদ্রণ এবং গালার দ্রব্য ও চীনামাটির দ্রব্যতৈরি কৌশল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিলাভ করেছিল।

হোপেই প্রদেশের জুনহুয়ার লৌহ কারখানা, পিলিন (চিয়াংসুর উচিন)-এর মুদ্রণশালা এবং সুচৌতে ব্যবহৃত খণ্ড খণ্ড সীসা বা কাঠের অক্ষর তৈরী, সুচৌ ও হাংচৌ-এর সুতিবস্ত্র-তৈরীর তাঁতশালা, শানতোং প্রদেশের ইতু-এর কাঁচ তৈরি কারখানা, কুয়াংতোং এবং ফুচিয়ান-এর জাহাজ নির্মাণ কারখানা খুব বিখ্যাত ছিল। বিশেষ করে চিংতেচেন নামক স্থানে বছরে হাজার হাজার চীনামাটির জিনিস তৈরি হত; ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে ১৫৯,০০০টি জিনিস এখানে উৎপাদিত হয়েছিল। এই সব হস্তকৃত শিল্পদ্রব্য উৎপাদন কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে অথবা ব্যক্তিগত পরিবারের পক্ষে এককভাবে করা আর সম্ভব ছিল না। সেজন্য শুরু হল সমষ্টিগত উৎপাদনের কারখানা। তাদের উৎপাদনের রীতিতে পুঁজি-বাদের অঙ্কুর রোপিত হল। সুতরাং, যদি বলা যায় যে পশ্চিম চৌ হল সামন্ততন্ত্রের সূচনা পর্ব তাহলে বলা চলে মিং রাজবংশের মধ্যভাগ হল চীন দেশে সামন্ততন্ত্রের শেষ পর্ব।

সম্রাট চু ইউয়ানচাং-এর আদেশে কৃষকদের তুলা চাষে বাধ্য করানোর ফলে সুতা তৈরি এবং বস্ত্রবয়ন একটি সম্পূরক পেশাতে পরিণত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ব্যবসায়ীরা গ্রামে সুতা তৈরি ও তাঁতিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনা করে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আগাম চুক্তি করতেন। এর পরের শতাব্দীতে কোন কোন জেলার কৃষক-তাঁতিরা ব্যবসায়ী-দের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি এবং উপাদান বস্তু গ্রহণ করে দিন মজুরিতে পরিণত হয়েছিলেন।

নিজেদের একাধিকার স্বার্থ রক্ষার জন্য হস্তশিল্পের কারিগরেরা গিল্‌ড গঠন করলেন, কিন্তু তাতে গিল্‌ডের অধিকর্তাদেরই বিশেষ অধিকার রক্ষিত হয়েছিল। এই গিল্‌ডগুলো মজদুর নিয়োগ এবং উপঢৌকন আদায় করার কাজেও রাজ-সরকারকে সাহায্য করত।

মিং রাজবংশের শাসনকালে পেইচিং এবং নানচিং সমেত তেত্রিশটি বৃহৎ

বাণিজ্যিক নগর গড়ে উঠেছিল। এই সকল নগরের মধ্যে আটটি ছিল উত্তর চীনে অবস্থিত এবং এগারটি ছিল চেচিয়াং এবং চিয়াংসু প্রদেশে।

বণিকদেরও নিজস্ব সংগঠন ছিল। কিছু কিছু ছিল একই ধরণের ব্যবসায় লিপ্ত গিল্ড, আর ছিল যাত্রীনিবাস যেখানে শুধু একই প্রদেশ অথবা নগরের লোকদের বাস করতে দেয়া হত। উভয় সংগঠনই থাং এবং সোং রাজবংশ আমলের গিল্ডের ভিত্তিতে অগ্রগতিলাভ করেছিল।

মিং রাজবংশের প্রথমার্ধে বৈদেশিক বাণিজ্যও অগ্রগতিলাভ করেছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্যদ্রব্য বহন করে পর্তুগীজদের জাহাজ কুয়াংতোং বন্দরে পৌঁছালে চীনের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। এরপর ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশীয় ব্যবসায়ীরা আসে এবং তাদের অনুসরণ করে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে আসে ডাচ; ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আসে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা।

বণিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছিল খৃষ্টানধর্মের ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের যাজকরা। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে মাতিও রিসি (১৫৫২—১৬১০) নামক একজন ইতালীয় জেসুইত ধর্মযাজক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমে কুয়াংতোং-এ এবং পরে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পেইচিং-এ আসেন। তারপর আরও বহু ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকেরা চীনে আসেন।

কৃষক-যুদ্ধ এবং মিং রাজবংশের পতন : মিং রাজবংশের সবচেয়ে গৌর-বোজ্জ্বল শাসনকাল প্রায় ষাট বছর স্থায়ী ছিল। সম্রাট শি জোং-এর শাসনের পরবর্তী এক শতাব্দী অর্থাৎ ১৫২১ থেকে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মিং রাজবংশের গৌরব দ্রুত ক্ষয় হতে দেখা যায়। তাতারেরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আক্রমণ শুরু করে এবং জাপানী জলদস্যুরা দক্ষিণ-পূর্ব চীনে হামলা করতে থাকে। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পর মাঞ্চুরা তাদের চিনরাজ্য স্থাপিত করলে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ গুরুতর রূপ ধারণ করে।

মিং রাজ-দরবারের ক্ষমতা খোজা-পুরুষেরা হস্তগত করেছিল। তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরকারী পদ থেকে সরিয়ে দেবার ফলে শিক্ষিত সমাজের কিছু ব্যক্তি তোংলিন নামে একটি দল গঠন করে খোজা-পুরুষদের বিরোধিতা করেন। শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিস্তারলাভ করতে থাকে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে দুর্নীতি দেখা দেয় এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা কর

ও শুল্ক আদায়ের ফলে লোকেরা মরিয়া হয়ে ওঠে। মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে লিয়াওতোং-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার নামে রাজ-সরকার আর একটি নূতন কর ধার্য করে লোকেদের উপর আরও ভার চাপিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ।

এই সকল কৃষক বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয় গুরুতর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শানসী প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে। কৃষক, সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনা এবং বেকার বার্তাবাহক সকলেই ক্ষুধার তাড়নায় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ইয়ান-আন এবং সুইতে'তে অবস্থিত সেনা-শিবিরের সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তারা পরে কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে। কৃষকদের ক্ষুধার তাড়নায় সংগঠিত এই বিদ্রোহের মুখ্য নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিচি'র লি জিছেং (১৬০৬—১৬৪৫) এবং ইয়ানআনের চাং সিয়ানচোং (১৬০৬—১৬৪৬)। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহের নেতারা হোনানের ইংইয়াং-এ এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এই সম্মেলনে তেরটি পরিবারগোষ্ঠী এবং বাহাত্তরটি সেনাবাহিনী-দলের সদস্যেরা যোগদান করেন।

চাং সিয়ানচোং তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করে হোনান, আনহুই, হুপেই এবং হুনান-এর মধ্য দিয়ে সিচুয়ানে প্রবেশ করে। লি জিছেং-এর অধীনে কৃষক সেনারা ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পীতনদী পার হয়ে শানসীতে পৌঁছায় এবং উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। খাইইউয়ান, তাথোং এবং চ্যুইয়োংকুয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে এই সেনাবাহিনী পেইচিং-এ প্রবেশ করে। মিং রাজবংশের শেষ সম্রাট ছোং চেন (১৬২৮—১৬৪৪) শহরের বাইরে যেতে অকৃতকার্য হয়ে রাজ-প্রাসাদের পিছনে অবস্থিত চিংশান-এ (কয়লার পাহাড়) আত্মহত্যা করেন। তার মৃত্যুর পর মিং রাজবংশের পতন হয়।

মিং রাজবংশের আমলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব উদ্দীপনা: সোং, ইউয়ান এবং মিং রাজবংশের শাসকদের সরকারী সমর্থনপ্রাপ্ত ও আশীর্বাদপুষ্ট ছিল ছেং ই এবং চু শি'র নব্য-কনফুসিয়াসবাদ। কিন্তু মিং রাজবংশের শাসনের মধ্যভাগে নব্য-কনফুসিয়াসবাদের অধঃপতন হয় এবং শিক্ষিত সমাজের এক অংশের ব্যক্তিদের দ্বারা ধিকৃত হয়। ছেং ও চু-এর শঠতাপূর্ণ এবং বিচারবুদ্ধিহীন পাণ্ডিত্যের বিরোধিতা করে ওয়াং শৌরেন (১৪৭২—১৫২৮) "জ্ঞান এবং অনুশীলনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন" করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। মিং রাজবংশের

আমলে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নব্য-কনফুসিয়াসবাদী। মিং রাজবংশের মধ্যভাগ থেকে ছিং রাজবংশের প্রথমার্ধ সময়ের মধ্যে তাঁর আত্মবাদী ভাবাদর্শ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। অন্য দুটি ভিন্ন মতবাদ-পন্থীরাও ছেং এবং চু'র শূন্যগর্ভ ও অসার মতের বিরোধিতা করেন। "বিশ্বজনীন বিদ্যা" মতবাদের একটি পন্থী ব্যাপকভাবে পুস্তক পাঠ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। অন্য আর এক পন্থী ইতিহাস এবং ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠের প্রতি জোর দেন, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে তার বাস্তব প্রয়োগ করা। এই পন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গবেষণারও পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে সোং ইংসিং রচিত "থিয়ান কোং খাই উ" (প্রকৃতির সৃষ্টি থেকে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার) এবং লি শিচেন (১৫১৮—১৫৯৩) রচিত' "পেন ছাও কাং মু" (ভৈষজবিদ্যা) গ্রন্থ দু'টির নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বিশদভাবে কারিগরী উৎপাদনের ধারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও খনিজবিদ্যা আলোচিত হয়েছে এবং সুসম্বদ্ধভাবে উদ্ভিদ্‌সমূহের শ্রেণীভাগ করা হয়েছে।

মিং রাজবংশের আমলে পাশ্চাত্যের গণিত-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, পঞ্জিকা প্রণয়ন-প্রণালী, জলসেচ ব্যবস্থা প্রণালী, কারিগরী শিল্প, ভূগোল ও শারীরবৃত্ত চীনদেশে প্রবর্তন করা হয়, এবং স্যু কুয়াংছি (১৫৬২—১৬৩৩) ও লি চিজাও (? —১৬৩০)-এর মতন চীনা পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। মিং রাজবংশের আমলে পুঁজিবাদের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং সমাজে নূতন অর্থনীতিক উপাদানের জন্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নূতন হাওয়া শুরু হয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সফলতা অর্জিত হয়। নাটক রচনায় উত্তরের 'জা চ্যু'-এর স্থানে দক্ষিণের 'নানছ্যু' প্রাধান্য পায়। সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষত্ব ছিল চলিত ভাষায় উপন্যাস রচনা। "তিন রাজত্বের বীর-কাহিনী", "পশ্চিমে তীর্থযাত্রা", "দেব-দেবতার কাহিনী" এবং "স্বর্ণ-পদ্ম" ইত্যাদি এই যুগের বিখ্যাত উপন্যাস।

শানহাইকুয়ান গিরিপথ দিয়ে মাঞ্চুদের আগমন এবং হান জাতির মাঞ্চু-বিরোধী সংগ্রাম: মাঞ্চুরা ছিল ন্যুচেন জাতির একটি শাখা। তাদের আদি নিবাস মুতান এবং সুঙ্গারি নদীর সঙ্গমস্থলে। সেখানে তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল

কৃষি এবং পশু-পালন। সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা অনগ্রসর ছিল।

পনের খৃষ্টাব্দের আশির দশকে মাঞ্চুরা তাদের নেতা নুরহাচির নেতৃত্বে অন্যান্য কয়েকটি উপজাতিকে নিজেদের বশে এনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে নুরহাচি চিন নামে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের নাম পরে পরিবর্তন করে দেয়া হয় ছিং। এই রাজ্য ক্রমশঃ সুজি নদী উপত্যকা থেকে তালিন নদী উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে নুরহাচি, যিনি পরে ছিং সম্রাট থাই জু নামে পরিচিত হন, মিং রাজবংশের লিয়াওইয়াং নগর দখল করে সেখানে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তিনি রাজধানী শেনইয়াং-এ স্থানান্তরিত করেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সম্রাট থাই জোং নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন শাসক মঙ্গোলিয়া জয় করেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বহু নগর ও গ্রাম্য এলাকা অধিকার করতে করতে শানহাইকুয়ান গিরিপথের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

যখন মাঞ্চু সেনারা শানহাইকুয়ানে (এখানে চীনের মহাপ্রাচীর সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে) প্রবেশ করতে যাবে ঠিক সেই সময়ে কৃষক নেতা লি জিছেং পেইচিং-এ-প্রবেশ করেন। শানহাইকুয়ানে অবস্থিত মিং-এর সেনাশিবিরের সেনাপতি উ সানকুই স্বদেশবাসীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাঞ্চু সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করে চীনের মহাপ্রাচীর অতিক্রম করেন। ইত্যবসরে মাঞ্চু সম্রাট থাই জোং-এর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র ফু লিন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। মাঞ্চু সেনারা বিশ্বাসঘাতক উ সানকুই এবং তার সেনাবাহিনীর পরিচালনায় লি জিছেং-এর কৃষক বাহিনীকে পরাস্ত করে পেইচিং অধিকার করে। ফুলিন নিজেকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং ছিং সম্রাট শি জু (রাজত্বকাল ১৬৪৪— ১৬৬১) নামে পরিচিত হন।

মিং রাজদরবারের বহু সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী ছিং শাসকদের পক্ষে যোগদান করেন এবং স্বদেশবাসী হানদের প্রতিরোধ সংগ্রাম দমন করার জন্য তাদের নূতন প্রভুদের সেবা করতে সচেষ্ট হন। তবে, কোন কোন মিং অভিজাত ব্যক্তি ও রাজকর্মচারী জনগণের সাহায্যে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই সকল প্রতিরোধ সংগ্রামে কয়েকজন বিখ্যাত জাতীয় বীর যেমন শি খেফা (?—১৬৪৫) ও চেং ছেংকোং যিনি বিদেশে খোসিঙ্গা (১৬২৪—১৬৬২)

নামে খ্যাত, এবং লি জেছেং-এর কর্মচারী লি চিন (? —১৬৪৯) ও লি লাইহেং (?–১৬৬৪) এবং চাং সিয়ানচোং-এর কর্মচারী লি তিংকুও (? —১৬৬২) এই সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। লি তিংকুও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনকে তের বছর মাঞ্চুদের অধিকার থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। তিনি ঐ অঞ্চলের শেষ ইঞ্চি জমি রক্ষার জন্য প্রাণপণ করে সংগ্রাম করেন। চেং ছেংকোং থাইওয়ান থেকে মাঞ্চুবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যান। একমাত্র তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পরই ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুসেনারা থাইওয়ান দ্বীপ অধিকার করতে কৃতকার্য হয়।

ছিং রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি এবং পতন: ছিং রাজবংশ তার অস্তিত্বের প্রথম দেড় শতাব্দী ধরে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অবস্থান করে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাঞ্চু অভিজাত ব্যক্তির উপর নির্ভর করে চীন দেশ শাসন করতে এবং হানজাতির বিরোধিতার ভয়ে মাঞ্চু শাসকেরা চরম শোষণ-নীতি অবলম্বন করতে পারে নি। তাই সমাজের উৎপাদন শক্তি অগ্রগতিলাভ করতে থাকে, গ্রামীণ আর্থনীতির বিকাশ হতে থাকে, এবং আবাদী জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪০কোটি। রাজস্বও অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। সম্রাট খাং সি (১৬৬২—১৭২২) এবং সম্রাট ছিয়ান লোং (১৭৩৬—১৭৯৫)-এর রাজত্বকালে চীনের একীকরণ আরও সুদৃঢ় হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ছিং রাজসরকার মঙ্গোল ও জুংগারদের বিরুদ্ধে তিনবার অভিযান চালিয়ে তাদের বিদ্রোহ দমন করে এবং তিব্বতে সেনাশিবির স্থাপিত করে ও সেনাবাহিনীর রক্ষাধীনে ষষ্ঠ দালাই লামাকে লামাধর্মের পবিত্র শহর লাসাতে পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থা করে। ছিং রাজ-সরকার তিব্বতের স্থানীয় সরকারের কর্তব্য এবং গঠনব্যবস্থা নির্ধারিত করে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে যে আদেশ জারী করে তাতে বলা হয় যে. তিব্বতের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক রাজকর্মচারী হিসেবে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হবে। এইরূপে তিব্বত কেন্দ্রীয় রাজ-সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে।

ছিয়ান লোং-এর রাজত্বকাল ছিং রাজবংশের স্বর্ণ-যুগ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পর ছিং সেনারা সিনচিয়াং-এর জুংগার এবং উইগুরদের বশীভূত করে। ইতোমধ্যে ছিং রাজসরকার তিব্বতে আরও সৈন্য পাঠিয়ে তার ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করে ; এর ফলে, তিব্বত এবং সিনচিয়াং-এ ছিং শাসন আরও সুদৃঢ় হয়।

ছিয়ান লোং-এর রাজত্বের শেষের কয়েক বছরে কুশাসন ও ভ্রষ্টাচার পরি-

লক্ষিত হয়। যখন তাঁর উত্তরাধিকারী চিয়া ছিং (রাজত্বকাল ১৭৯৬—১৮২০) সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বহু নিপীড়িত লোক, বিশেষ করে হানেরা বিদ্রোহ করে এবং ছিং রাজবংশের পতন শুরু হয়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে শানতোং-এর ওয়াং লুন নামে একজন কৃষক নেতা মাঞ্চু-বিরোধী বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেন। এর পরই শুরু হয় কানসুতে হুই মুসলমানদের অভ্যুত্থান এবং হুনানে ও কুইচৌতে মিয়াও জাতিদের অভ্যুত্থান। চিয়া ছিং-এর রাজত্বের কালে 'শ্বেত-পদ্ম সম্প্রদায়' এবং 'দেবকল্প সম্প্রদায়' নামে দু'টি গুপ্ত সংঘ কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। 'শ্বেত-পদ্ম সম্প্রদায়'-এর বিদ্রোহ ন'বছর স্থায়ী থাকে এবং হুপেই, সিচুয়ান ও সেনসী ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করে। এর ফলে ছিং শাসন অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। 'স্বর্গ-মর্ত্য সংঘ' এবং 'অগ্রজ ভ্রাতা পিতা সংঘ' দক্ষিণ চীনের বহু স্থানে অভ্যুত্থান সংঘটিত করে। এই সকল স্থানীয় অভ্যুত্থান ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করতে থাকে এবং সম্রাট তাও কুয়াং-এর রাজত্বকালে (১৮২১—১৮৫০) থাইফিং স্বর্গরাজ্যের বিরাট কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

ছিং রাজবংশের শাসনব্যবস্থা : ছিং রাজবংশের রাজনৈতিক সংগঠন সাধারণতঃ মিং রাজত্বের ধাঁচে গঠিত হয়েছিল, তবে ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত ছিল। কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এক মহামন্ত্রীমণ্ডলীর অধীনে ছিল। এই মণ্ডলী সরাসরি সম্রাটের তত্ত্বাবধীনে সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো পরি-চালনা করতেন। মন্ত্রীরা এই মণ্ডলীর আদেশ পালন করে চলতেন।

পরাভূত হান লোকেদের প্রতি চরম উৎপীড়ন-নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। মাঞ্চু সেনাদের দ্বারা গঠিত আটটি সেনা-শিবির এবং হানজাতিভুক্ত লোকেদের নিয়ে গঠিত সবুজ সেনাবাহিনী বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং সারাদেশকে সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছিল। মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে অশোভন ভাষা ব্যবহার করার অপবাদ দিয়ে মাঞ্চুবিরোধী মনোভাব প্রশমিত করার জন্য ছিং রাজ-সরকার বহু হান জাতীয় লেখকদের নির্যাতন করার চেষ্টা করতেন। হান লোকেরা কেন্দ্রের অথবা জেলাগুলিতে রাজকর্মচারী রূপে নিযুক্ত হতে পারতেন, কিন্তু কোন কোন পদ তাদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। যদিও মঙ্গোলদের রাজত্বের আমলের তুলনায় হানদের বিরুদ্ধে জাতীয় বৈষম্য এতটা

প্রকট ছিল না, তবু তাদের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তা ছিল কঠোর ও ব্যাপক।

ইউয়ান শাসকদের মতনই ছিং শাসকেরা অবাধে জমি জবরদখল করতেন। মিং রাজপরিবারের ও অভিজাত ব্যক্তিদের সব খামার জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কিছু কিছু জমি মাঞ্চু রাজপরিবাব দখল করেছিলেন এবং অবশিষ্ট জমি মাঞ্চু রাজকুমারদের এবং আটটি অঞ্চলের সেনাদের দেওয়া হয়েছিল। "ছিং রাজবংশের সংবিধি" এবং "ছিং রাজবংশের দলিল ও নথি" অনুযায়ী রাজপরিবারের অধীনে খামারের সংখ্যা ছিল ৮৬৮ এবং আটটি অঞ্চলের রাজপরিবারের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের অধীনে ছিল ১,৪০৭টি বড় খামার, ২৫৯টি ছোট খামার, ৩৭৫টি বড় ফলবাগান ও ১০২টি ছোট ফলবাগান। আটটি অঞ্চলের সেনাশিবির আস্তাবল এবং সামরিক কাজের জন্য ৩০ লক্ষ মু জমি দখল করেছিল।

রাজত্বের শুরুতে মাঞ্চুরা মিং আমলে অনুসৃত 'সার্বিক কর প্রথা' প্রচলিত করেছিল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তারা মাথা-পিছু কর এবং অন্য নানাবিধ কর ও শুল্ক একত্র করে ভূমি-কর নামে একটি মাত্র করপ্রদান প্রথা প্রবর্তন করেছিল। এই করপ্রদান প্রথা মিং রাজ্যের করব্যবস্থা থেকে আরও নিখুঁত ছিল।

আফিম যুদ্ধের পূর্বে শিল্প ও বাণিজ্য: স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, সীসা, পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা এবং কয়লা ইত্যাদি খনিজ-পদার্থ নিষ্কাশনের কাজ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল। একটি লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কুয়াংসি প্রদেশে দশ বা তারও অধিক খনি ছিল এবং প্রত্যেকটি খনিতে দশ সহস্রাধিক লোক নিযুক্ত ছিল। ইয়ুন্নানে ছিল ৪৫টি খনি। এই সকল খনির মধ্যে কোন কোন খনি রাজ-সরকারের অধীনস্থ উদ্যোগ ছিল, কোন কোন খনির কাজে সরকার আর্থিক সাহায্য করতেন ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন, আবার কোন কোন খনি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ছিল। সিছুয়ানে লবণ তৈরি শিল্প খুব উন্নত ছিল। চিয়াংসির চিংতেচেন-এর চীনামাটির কারখানায় বিশদীকৃত শ্রম-বণ্টন প্রথা প্রচলিত ছিল। কুয়াংতোং প্রদেশের চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলির প্রত্যেকটিতে পাঁচ শতাধিক কর্মী নিযুক্ত ছিল। সম্রাট তাও কুয়াং-এর রাজত্বকালে কুয়াংতোং প্রদেশের সুতা এবং বস্ত্রবয়ন কারখানায় মোট ৫০,০০০ লোক নিযুক্ত ছিল। এছাড়া, চিয়াংসু এবং চেচিয়াং-এর সিল্ক ও সাটিন-কাপড়, সিছুয়ানের বুটিদার রেশমী কাপড়, শানসীর সাধারণ সাটিন-কাপড় এবং শান-

তোং ও হোনানের সুতীকাপড় এই যুগের প্রসিদ্ধ হস্তশিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য ছিল। মিং রাজবংশের আমলে যে পুঁজিবাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তা আরও অগ্রগতিলাভ করল।

ব্যবসায়ীদের জগতে ইয়াংচৌ-এর লবণ-ব্যবসায়ীরা এবং শানসীর পোদ্দার-পরিবারেরা সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। শানসীর পোদ্দার পরিবারেরাই হলেন বিশেষ লক্ষণীয়, কারণ তাদের মধ্যে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের টাকা পাঠানো, টাকা জমা রাখা, টাকা ধার দেয়া এবং রাজসরকারের রাজস্ব আদায় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য অগ্রগতিলাভ করেছিল এবং ১৬৫৫—৬০ খৃষ্টাব্দে চীন এবং জারশাসিত রাশিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নারচিন্স্ক সন্ধি এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত খিয়াচতা সন্ধির দ্বারা এই দু'দেশের মধ্য এবং পূর্ব সীমানা নির্ধারিত হয় এবং নিয়মিত বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগীজ, স্পেন এবং ওলন্দাজ দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যসম্পর্ক পূর্বের ন্যায় চালু ছিল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকেরা কুয়াংচৌতে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (তখন কারখানা বলা হত) প্রতিষ্ঠিত করেছিল; অতঃপর চীনদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ বিস্তারলাভ করতে থাকে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ম্যাকারটনি বিশেষ দূতরূপে চীন দেশে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ বণিকদের চৌশান, নিংপো এবং থিয়ানচিন বন্দরে ব্যবসা করার জন্য অনুমতিলাভ। তাঁর এই প্রার্থনা ছিং সম্রাট প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন অব্যাহত রাখার জন্য ছিং রাজসরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'রুদ্ধদ্বার' নীতি অবলম্বন করেছিল। কেবলমাত্র কুয়াংচৌতেই বিদেশী বণিকদের ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং এই সকল বণিকেরা 'কোং হাং' নামে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত গিল্ডের মাধ্যমেই ব্যবসা করতে পারতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সারা পৃথিবীতে বাণিজ্যের ক্রিয়াকলাপ বিস্তারে সচেষ্ট হয়। চীন এক বিরাট ভূখণ্ড, জনবহুল এবং প্রাকৃতিক সম্পদসম্পন্ন দেশ হিসেবে ব্যবসায়ের এক আদর্শ স্থান বলে পরিগণিত হয়েছিল। এই সম্ভাবনাসূচক বাজারে বিদেশীদের অনুপ্রবেশের পরিণতি হল

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আফিম যুদ্ধ যখন ইংরেজ আক্রমণকারীরা বন্দুক নিয়ে চীনের দ্বার খুলবার জন্য অগ্রসর হল। বৈদেশিক পুঁজিবাদ এবং দেশের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো ক্রমশঃ একতাবদ্ধ হয়ে চীনে পুঁজিবাদের অগ্রসর রোধ করার চক্রান্ত করল। তখনই চীন দেশে সূচীত হল আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ।

আফিম যুদ্ধের পূর্বে চীনা সংস্কৃতি: ওয়াং শৌরেনের দর্শন যা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ক্রমশঃ ভেঙ্গে যাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্ভব হয়েছিল এবং সামন্ততন্ত্রের শেষ পর্যায়ে মতাদর্শের ক্ষেত্রে এক প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল ছিং রাজবংশের আবির্ভাবে তার প্রভাব ব্যাহত হল। অবশ্য একথা সত্য যে মিং যুগের শেষে এবং ছিং যুগের শুরুতে হুয়াং জোংসি'র (১৬১০—৯৫) মতন এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা 'ওয়াং শৌরেনের শিক্ষা প্রচার করতেন, কিন্তু তা ছিল এই দর্শনের ক্ষীণ-প্রতিধ্বনি মাত্র। এই মতবাদের বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন কু ইয়ানউ (১৬১৩—১৬৮২) যিনি ছেং ই ও চু সী'র তত্ত্বের প্রচার করতেন এবং 'ওয়াং ফুচি (১৬১৯—১৬৯২) যিনি জড়বাদ মনোভাবের প্রবক্তা ছিলেন। ওয়াং ফুচি ছিলেন একজন মহান চিন্তাবিদ; তাঁর চিন্তাধারাতে প্রাথমিক বুর্জোয়া দর্শনের আভাষ পাওয়া যায়।

সম্রাট খাং সী'র রাজত্বকালে, বেলজিয়ামবাসী ফারদিনাণ্ড ভারবিয়েস্ত এবং অন্যান্য ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা চীনে এসেছিলেন। তাঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করতেন এবং রাজসরকারকে ইতিহাস গ্রন্থগুলো সংশোধন করতে সাহায্য করতেন। 'ওয়াং সীছান (১৬২৮—১৬৮২) এবং মেই 'ওয়েনতিং-এর ১৬৩৩—১৭২১ মতন চীনা পণ্ডিতেরাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ছিয়ান লোং এবং চিয়া ছিং-এর রাজত্বকালে ছিং শাসকেরা সংস্কৃতির প্রতি স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ও দমন করার মনোভাব নিয়ে ভীতি প্রদর্শন করার ফলে বহু চীনা পণ্ডিত আর হুয়াং জোংসি, কু ইয়ানউ এবং ওয়াং ফুচি'র উপযোগবাদ অনুসরণ করতে না পেরে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা ও অধ্যয়নের কাজে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এই কাজে তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিলেন।

ছিং রাজবংশের প্রথমার্ধে মিং রাজত্বকালের খুন্‌শান নাটক প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ছিয়ান লোং-এর রাজত্বের পর নাট্য রূপ হিসেবে পেইচিং অপেরা ক্রমশঃ এর স্থান দখল করে নেয়। এই যুগে বহু উপন্যাস কথ্যভাষায় লিখিত হয়েছিল। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে বিখ্যাত হল 'লাল মহাপুরীর স্বপ্ন' (হোং লৌ মেং) এবং 'পণ্ডিতমণ্ডলী'(রু লিন ওয়াই শি)।

আধুনিক যুগ

(পুরনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়)

১. আফিম যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মধ্যে চীনের বিভিন্ন স্থানে নিরন্তর যে সকল গণ-অভ্যুত্থান হচ্ছিল তা থেকে বুঝা-গিয়েছিল যে, ছিং অভিজাতদের নেতৃত্বে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীশ্রেণীর শাসন গুরুতরভাবে ক্রমবর্ধমান সংকটের সম্মুখীন হতে চলেছে। ঠিক এই সময়ে, লুণ্ঠনকারীর ন্যায় বিদেশী পুঁজিবাদী আক্রমণকারীরা অবৈধভাবে আফিম ব্যবসার সাথে সাথে চীনের ওপর আক্রমণ হানতে থাকে এবং অবশেষে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত করে।

অবৈধ আফিম ব্যবসা এবং আফিম সেবন নিষিদ্ধ: সামন্ততান্ত্রিক চীনের সুবিশাল গ্রামীণ এলাকায় গৃহজাত হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্র ধরণের চাষাবাদ প্রথা অভিন্ন ছিল। এই বাস্তব পরিস্থিতির ফলে ইংরেজ পুঁজিবাদীদের নিজস্ব সুতীবস্ত্র চীনের বিরাট বাজারে বিক্রয় করার আশা পূরণ হওয়া সহজ ছিল না। ইংরেজ বণিকদের চীনে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী রৌপ্যের মাধ্যমে সিল্ক এবং চা ক্রয় করতে অনিচ্ছুক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কয়েক দশকে, কুয়াংতোং-এর রাজকর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজসে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘুষ প্রদান করে অথবা চোরাই চালান করে বিরাট পরিমাণের আফিম চীন দেশে আমদানি করত। এই অবৈধ ব্যব-সায়ের ফলে চীনের প্রচুর সম্পদ বিদেশে পাচার হয়। এই ধরণের হীন ব্যবসায়ে আমেরিকা এবং অন্যান্য বিদেশী বণিকেরাও লিপ্ত ছিল। এক হিসাব অনুযায়ী

বহু বছর ধরে দুই কোটি রৌপ্য ডলার মূল্যের তিরিশ হাজার পেটি আফিম প্রতি বছরে এইভাবে চীনে আমদানি করা হয়েছিল। মূল্য হিসেবে এক বিরাট পরিমাণের রৌপ্য চীনের বাইরে চলে যাবার ফলে লোকেদের উপর বিরাট আর্থিক চাপের সৃষ্টি হল এবং চীনের সামাজিক উৎপাদন গুরুতররূপে ব্যাহত হল। ছিং রাজসরকারকে এক গুরুতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হল। শাসকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা আফিম আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু লিন জেস্যু (১৭৮৫—১৮৫০)-এর নেতৃত্বে এক অংশ রাজকর্মচারী কঠোরভাবে আফিম ব্যবসা নিষিদ্ধ করার জন্য দাবি জানালেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট তাও কুয়াং এই বিষয়ে তদন্ত এবং আফিম ব্যবসা বন্ধ করার জন্য কুয়াংচৌতে লিন জেস্যুকে রাজ-প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করলেন। স্থানীয় লোকের সমর্থনের শক্তিতে লিন জেস্যু কুয়াংচৌ-এর বিদেশী আফিম ব্যবসায়ী এবং আইনভঙ্গকারী চীনা রাজকর্মচারী, সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি ও বণিকদের বিরুদ্ধে অটলভাবে সংগ্রাম করলেন। ইংরেজ বণিকেরা তাদের কন্সাল ও প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন চার্লস এলিয়টের মাধ্যমে ১০ লক্ষ কিলো-গ্রাম ওজনের আফিম সমর্পণ করলেন। তরা জুন হুমেন নামক স্থানে জনসমক্ষে এইসব আফিম দাহ করা হল। আফিমের চোরা কারবার সমূলে ধ্বংস করার জন্য লিন জেস্যু একটি ঘোষণা জারি করে আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক বিদেশী জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার আগে একটি মুচলেকা দিয়ে বলতে হবে যে ঐ জাহাজে কোন আফিম আনা হচ্ছে না।

কিন্তু আফিম ব্যবসায়ীরা তাদের এই দুর্বৃত্তিপূর্ণ ব্যবসা বন্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের পক্ষ নিয়ে এলিয়ট ইংরেজ সরকারকে একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনী চীনে পাঠাবার এবং সমস্ত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কুয়াংচৌ ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

১৮৪০—৪২ সালের যুদ্ধ: লিন জেস্যুর দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে ইংরেজ পদাতিক সেনা ও নৌবাহিনী কুয়াংচৌতে অবতরণ করতে ব্যর্থ হল। ১৮৪০ সালে ইংরেজ সেনাবাহিনী আরও উত্তর দিকে অভিযান শুরু করল। এই বাহিনী সিয়ামেন-এ (অ্যাময়) পৌঁছালে ফুচিয়ান এবং চেচিয়াং প্রদেশের ভাইসরয় তেং থিংচেন (১৭৭৫—১৮৪৬)-এর অধীনস্থ চীনা সেনাবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। জুলাই মাসে ইংরেজ সেনাবাহিনী চেচিয়াং-

এর উপকূলে অবস্থিত তিংহাই অধিকার করে খিয়ানচিনের নিকটবর্তী হাইহো নদীর মোহানার দিকে অগ্রসর হল। ছিং রাজসরকার আক্রমণকারীদের সঙ্গে আপোস করার সংকল্প নিয়ে লিন ও তেং উভয়কেই পদচ্যুত করলেন এবং চিলির (আধুনিক হোপেই প্রদেশ) ভাইসরয় ছি শানকে শান্তি স্থাপনের জন্য আলোচনা করতে কুয়াংচৌতে পাঠালেন।

১৮৪১ সালে ছি শান কুয়াংচৌয়ের সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিলেন, রাজসরকারের সঙ্গে বিনা আলোচনায় ইংরেজদের হংকং অধিকার করার অনুমতি দিলেন, এবং আফিম পুড়িয়ে ফেলার জন্য ইংরেজ বণিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু সম্রাট তাও কুয়াং এই সব অবমাননাকর শান্তির শর্তাবলী অনুমোদন করতে অস্বীকার করলেন। তিনি ছি শানকে পদচ্যুত করলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজ সেনারা হুমেন আক্রমণ করল। নৌ-সেনাপতি কুয়ান খিয়ানফেই চারশতরও অধিক সেনা নিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে তারা সকলেই নিহত হলেন। ইংরেজ সেনাদের যুদ্ধ-জাহাজ হুমেনে প্রবেশ করল।

এই ঘটনার তিন মাস পরে, ছিং রাজসরকারের ই শান নামে একজন সেনাপতি ইংরেজ আক্রমণকারীদের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্রে হস্তাক্ষর করলেন এবং তাদের কুয়াংচৌ শহরে প্রবেশ না করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬০ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করলেন।

ইংরেজ আক্রমণকারী সেনাদের নৃশংসতা এবং ছিং রাজসরকারের কর্মচারীদের কলঙ্ককর বিশ্বাসঘাতকতা জনগণের মনে ক্রোধের সঞ্চার করল। হাজার হাজার লোক কুয়াংচৌ শহরের উত্তরপশ্চিমের সানইউয়ানলি নামক স্থানে জমায়েত হয়ে ফিং ইং থুয়ান (ইংরেজ হানাদার দমন সেনাদল) গঠন করল। ৩০শে মে, এই দল সহস্রাধিক ইংরেজ সেনাদের ঘেরাও করতে সক্ষম হল। কুয়াংতোং প্রদেশের ইংরেজ-বিরোধী অন্যান্য সংগঠনও তাতে অংশগ্রহণ করল। তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে ইংরেজ আক্রমণকারীরা আরও দৌরাত্ম্য করা থেকে বিরত হল। চীনের বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এই হল সর্বপ্রথম ঘটনা।

১৮৪১ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে এক বছরের মধ্যে ইংরেজ আক্র-

মণকারী সেনারা চীনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে বহুবার হানা দিয়েছিল এবং চেচিয়াং ও চিয়াংসু প্রদেশে বিরাট ক্ষতিসাধন করে নানচিং শহর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পথে সর্বত্র তারা জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সংগ্রামে কয়েকজন রাজকর্মচারী এবং সেনাপতিও মাতৃভূমির প্রতি স্বদেশভক্তিপূর্ণ কার্যকলাপ দেখিয়েছিলেন। চিয়াংসু, আনহুই ও চিয়াংসির ভাইসরয় ইয়ু ছিয়ান চেচিয়াং প্রদেশের চেনহাই নামক স্থান রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। জেনারেল ছেন হুয়াছেং তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত উসোং গড় নিজের অধিকারে রেখেছিলেন। ছিং সেনাবাহিনী আত্মবিশ্বাসের অভাবে, বিশেষ করে মাঞ্চু রাজকর্মচারীদের নীতিভ্রষ্টের ফলে এবং সেনাপতিদের অপদার্থতার জন্য বিদেশী আক্রমণের প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। সম্রাট তাও কুয়াং-এর নেতৃত্বে শাসকচক্র সর্বপ্রকার প্রতিরোধ থেকে বিরত হলেন এবং আক্রমণকারীদের প্রতি হীনভাবে মাথা হেঁট করলেন।

নানকিং, ওয়াংহিয়া এবং হোয়াম্পোয়ার সন্ধি: ১৮৪২ সালের ২৯শে আগস্টে স্বাক্ষরিত নানকিং সন্ধির শর্তানুযায়ী হংকং ইংরেজদের অধিকারে এল, চীন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২১,০০০,০০০ রৌপ্য-মুদ্রা দিতে বাধ্য হল; এবং কুয়াংচৌ, সিয়ামেন, ফুচৌ, নিংপো, ও শাংহাই এই পাঁচটি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হল। এই সন্ধিতে আরও একটি শর্ত ছিল যে, চীনে পণ্য-দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের হার চীন এবং ব্রিটেনের যৌথভাবে স্বীকৃত হতে হবে। এই ধরণের শর্তারোপ এবং এর সঙ্গে ১৮৪৩ সালের পাঁচটি বন্দর উন্মুক্ত করার ঘোষণা ও অন্যান্য দলিল অনুযায়ী বাণিজ্যদূতদের ক্রিয়াকলাপের অঞ্চলের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দান গুরুতররূপে চীনের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করল। ব্রিটেন এবং তার পরে চীনে আগত কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা একতরফাভাবে 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ' বলে স্বীকৃতি আদায় করে নিল। এইভাবে চীনা জনগণ পররাজ্য আক্রমণকারী পুঁজিবাদী শক্তির দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ হল।

ব্রিটেনের পদাঙ্কনুসরণ করে এল আমেরিকা এবং ফরাসীরা। তারাও চীনের কাছ থেকে আরও অধিকার ও বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিল। আমেরিকা ছিল ব্রিটেন কর্তৃক চীন আক্রমণের দুষ্কর্মের সহযোগী। ১৮৪৪ সালে, আমেরিকা ছিং সরকারকে ওয়াংহিয়া সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করল। এই সন্ধির

ফলে চীন উপকূলবর্তী বাণিজ্যের অধিকার হারালো। এই চুক্তিতে বিদেশী দূতদের আদায়ীকৃত অধিকার প্রয়োগ আরও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত করা হল। ফরাসী রণপোতের সাহায্যে ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তার হতে থাকল এবং ধর্ম আক্রমণের একটি হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হল। হোয়াম্পোয়ার চীন-ফরাসী সন্ধি ছিল চীন-ব্রিটেন এবং চীন-আমেরিকা সন্ধির নামান্তর মাত্র। চীন-ফরাসী সন্ধিতে চীন দেশে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয়া হল।

চীনা জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম ঃ 'নানকিং সন্ধি' স্বাক্ষরিত হবার পর কুয়াংচৌবাসীরা বিদেশীদের ঐ শহরে প্রবেশের অধিকার মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন। ফুচৌতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। কিন্তু ইংরেজ কন্সাল তার দফতরের অট্টালিকায় ইংরেজ পতাকা না তোলার শর্ত মেনে নিতে রাজী হলে ইংরেজদের ফুচৌতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। কুয়াংচৌবাসীরা 'শেং ফিং শে স্যুয়ে' (শান্তি-সমিতি) নামে এবং অন্যান্য অস্ত্রসজ্জিত জনসংগঠন তৈরি করে ইংরেজ আক্রমণকারীদের এবং আত্মসমর্পণকারী ম্যাণ্ডারিন্ (চীনা রাজকর্মচারী)-দের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম শুরু করল। এইভাবে দশ বছরের অধিক তারা ইংরেজদের কুয়াংচৌ শহরে প্রবেশাধিকার অসম্ভব করে তুলেছিল। ১৮৪৫ সালে, 'শেং ফিং শে স্যুয়ে' কুয়াংচৌ-এর শাসককে পদচ্যুত করার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করল এবং ১৮৪৯ সালে কুয়াংচৌ বন্দরে ইংরেজ কামানবাহী জাহাজের উপস্থিতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। এই সকল আন্দোলন ও বিক্ষোভ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। শান্তি-সমিতির সদস্যসংখ্যা কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষে বৃদ্ধি পেল। স্বভাবতঃ, সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণী এই দেশহিতৈষী শক্তিকে সুনজরে দেখল না। থাইফিং বিদ্রোহের যুগে ১৮৫৫ সালে কুয়াংতোং এবং কুয়াংসির ভাইসরয় ইয়ে মিংছেন শান্তি-সমিতির ৭৫,০০০ সদস্যকে হত্যা করালেন।

বিদেশী আক্রমণকারীদের বিস্তার: "নানকিং সন্ধি' হস্তাক্ষরের পর বিদেশী পণ্যদ্রব্য আমদানির ফলে গ্রামে হস্তকৃতশিল্প ব্যবসা ব্যাহত হয় এবং এই শিল্প সঙ্কটের সম্মুখীন হল। কিন্তু ইংরেজদের তৈরি পণ্যদ্রব্য, বিশেষ করে সুতীবস্ত্র চীনের বাজার দখল করতে পারল না এবং দশ বছরের অধিক এর ব্যবসা খুব নগণ্য ছিল। অন্যদিকে, চীনের চা ও সিল্ক রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকল। এর ফলে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে চীন অধিকতর লাভবান হল। সঙ্গে সঙ্গে

ইংরেজদের আফিম চোরাই কারবার চীনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে থাকল। ১৮৫০ সালে আফিম আমদানির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার পেটির অধিক ছিল। ইংরেজ পুঁজিবাদীরা এই ধারণা পোষণ করত যে মাঞ্চেস্টারের তৈরী সুতীবস্ত্র বিক্রয়ে চীনের বাজার বিরাট। সুতরাং তারা উত্তর চীন এবং ইয়াংসি নদীকূলবর্তী স্থানে তাদের জন্য আরও কয়েকটি বন্দর উন্মুক্ত করার দাবী করল এবং চীনে তাদের পণ্যদ্রব্য আমদানি সহজতর করার জন্য চাপের সৃষ্টি করল। আমেরিকা এবং ফরাসী দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীও ইংরেজদের সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী ছিল। ১৮৫৪ সাল থেকে এই ত্রিশক্তি "সকল সন্ধি সংশোধন করার জন্য" ছিং রাজসরকারের প্রতি চাপের সৃষ্টি করল। এই সময়েই রাশিয়ার জার-সরকারও উত্তর চীনে তার আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ শুরু করল। ১৮৫৭ সালে, রাশিয়ার দূত পুতাতিন থিয়ানচিনে এলেন এবং এর পরের বছর শাংহাইতে এসে তিনি চীনের বিভিন্ন উপকূলবর্তী বন্দরগুলোতে বাণিজ্যের অধিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাজসরকার তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করলেন। পুতাতিন তখন ইংরেজ, আমেরিকা ও ফরাসী — এই তিন শক্তির সঙ্গে যোগসাজসে যুক্তভাবে চীন আক্রমণে লিপ্ত হলেন।

১৮৫৬—৬০ সালের যুদ্ধ: ১৮৫৬ সালের অক্টোবর মাসে তথাকথিত "The Arrow Case" নৌ-ঘটনার মিথ্যা ওজরে ইংরেজ সেনা কুয়াংচৌ আক্রমণ করলে শুরু হল দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ। এই ঘটনার সত্য তথ্য হল: হুকুম মত একদল চীনা রাজকর্মচারী চীনা জাহাজ 'Arrow'তে অবস্থানকারী কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে গেলে ইংরেজরা তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দিল এই বলে যে ঐ জাহাজ হংকং-এ ইংরেজ জাহাজ হিসেবে নথিভুক্ত। প্রকৃত-পক্ষে ঐ জাহাজের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে ইংরেজ জাহাজ বলে দাবী করার কোন যুক্তি ছিল না। ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, চীনের বিরোধিতায় ভীত হবার কারণ নেই কেন না ছিং রাজকর্মচারীদের দমননীতির ফলে কুয়াংচৌতে চীনবাসীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবুও কুয়াংচৌ-এর গণসেনারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইংরেজ আক্রমণকারী সেনাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আক্রমণকারীদের সঙ্গে আপোষকামী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা গণসেনাদের প্রতি আরও দমন-নীতি অবলম্বন করে অবশেষে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল।

কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর, অবৈধভাবে কুয়াংসিতে প্রবেশকারী পেরে স্যাপডেলেন নামে একজন ফরাসীয় ক্যাথলিক পাদ্রীকে হত্যা করার ঘটনার ওজরে ফরাসী ইংরেজদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হল, এবং ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের সম্মিলিত ফৌজ কুয়াংচৌ আক্রমণ করল। এর পরের বছর এই সম্মিলিত ফৌজ কুয়াংচৌ অধিকার করে উত্তর চীনের দিকে অগ্রসর হল এবং ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে তাকু বন্দরে প্রবেশ করে মে মাসে থিয়ানচিন দখল করল। থাইফিং স্বর্গীয়রাজ্যের গণ-বিদ্রোহ দমন করতে অতি ব্যস্ত থাকার দরুন ছিং রাজসরকারের বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতরাং, এই সরকার অনতিবিলম্বে চীনা-ব্রিটিশ, চীনা-ফরাসী, চীনা-আমেরিকা এবং চীনা-রুশ সন্ধিসমূহ হস্তাক্ষর করলেন যা 'থিয়ানচিন সন্ধি' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই সকল সন্ধিতে ইংরেজ এবং ফরাসী আক্রমণ-কারীদের যুদ্ধের খরচা বাবদ ক্ষতিপূরণ দেয়া ছাড়া ছয়টি সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর যথা নিউচুয়াং, তেংচৌ, থাইনান, তানশুই, ছাওচৌ ও ছিয়োংচৌ এবং ইয়াংসি নদীর উপকূলবর্তী চারটি শহর যথা হানখৌ, চিউচিয়াং, নানচিং ও চেন-চিয়াং বাণিজ্য বন্দররূপে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হল। শুল্ক-দফতরে বিদেশী-দের নিয়োগের দাবী, বিদেশীদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি, বিদেশী পাদ্রীদের অবাধে ধর্মপ্রচার এবং বিদেশী রণপোতের চীনের বিভিন্ন বন্দরে প্রবেশাধিকার ছিং সরকার স্বীকার করে নিল। ১৮৫৯ সালে শাংহাইতে আরও বিশদ আলোচনার ফলে আফিম ব্যবসা বৈধ ঘোষিত হল, সিল্ক ও চা রপ্তানি এবং আফিম আমদানি বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত আম-দানি-রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক শতকরা পাঁচ শতাংশ সমহারে ধার্য করা হল। যাতায়াত শুল্ক ধার্য হল শতকরা ২.৫ ভাগ।

১৮৫৯ সালে 'থিয়ানচিন সন্ধি' অনুমোদন লাভ করার জন্য ইংরেজ এবং ফরাসী দূতেরা সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে পেইচিং অভিমুখে যাত্রা করল। কিন্তু ছিং সরকারের নির্দিষ্ট পথে না গিয়ে তারা জোর করে তাকু বন্দর দিয়ে যাবার জন্য জিদ ধরল। আমেরিকার রণপোতের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও চীনা রক্ষা-বাহিনীর প্রতিআক্রমণের ফলে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে, ইংরেজ এবং ফরাসীর এক বিরাট সেনাবাহিনী তাকু ও থিয়ানচিনে অবতরণ করতে সক্ষম হল এবং তারা পেইচিং-এ প্রবেশ করল। তারা ইউয়ান-

মিংইউয়ানে (পুরানো সামার-প্যালেস) অগ্নি-সংযোগ করল এবং যথেচ্ছাচারভাবে বহু লুণ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হল। সম্রাট সিয়ান ফেং রেহে-তে পালিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা কুমার কোংকে আক্রমণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কুমার কোং (১৮৩২—১৮৯৮) শুল্ক-কর থেকে ১৬০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য আদায় করে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হলেন; বিদেশী দূতদের পেইচিং-এ বাস করার অনুমতি দিলেন; এবং থিয়ানচিনকে সন্ধিভুক্ত বন্দর হিসেবে মেনে নিলেন। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের তাদের অধিকৃত এলাকায় চীনা মজদুর নিয়োগের অনুমতি দিলেন; তাতে প্রকৃতপক্ষে চীনবাসীরা বিদেশী আক্রমণকারীদের দাসরূপে কাজ করার জন্য বিক্রীত হলেন। কুয়াংতোং প্রদেশের কৌলুন শহরের একাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দেয়া হল। ক্যাথলিক পাদ্রীদের তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হল। গণ-বিদ্রোহ দমনে বিদেশী দস্যুদের সহযোগিতার বিনিময়ে ছিং রাজসরকার নির্লজ্জভাবে তাদের লালসাপূর্ণ সব দাবী মেনে নিলেন।

দুবারের আফিম যুদ্ধের পর চীনের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বিদেশী পুঁজিবাদী বোম্বেটেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চীনা জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে কণ্ঠরোধ করতে থাকল এবং সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর রোধ করে চীনকে একটি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে পরিণত করল।

২. থাইফিং বিদ্রোহ

থাইফিং বিদ্রোহের শুরু এবং তার প্রাথমিক সাফল্য : ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বিদেশী পুঁজিবাদ কর্তৃক চীন আক্রমণ এবং তার সঙ্গে অধিক পরিমাণে আফিম আমদানির ফলে চীনা কৃষকেরা আগের চেয়ে আরও শোষণের সম্মুখীন হলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে বিরাট পরিমাণের খেসারতের অর্থ সংগ্রহের জন্য ছিং রাজসরকার কৃষকদের প্রতি আরও বোঝা চাপিয়ে দিলেন। দারিদ্র্য, দেউলিয়া অবস্থা এবং অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে মরিয়া হয়ে কৃষ-

কেরা প্রতিরোধ করার জন্য রুখে দাঁড়ালেন। অতিরিক্ত করের বোঝার জন্যও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এবং হস্তশিল্পের কারিগরেরা বিপুল সংখ্যায় গুপ্ত সমিতিগুলোতে যোগ দিলেন। অধিকন্তু, অতিরিক্ত বন্দর উন্মুক্ত করে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী-দের জন্য নির্দিষ্ট যানবাহনের পথ পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকেরা, বিশেষ করে কুলি এবং মাঝিদের মনে বিদেশী আক্রমণের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হল এবং তাঁরা বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। চীনের বিভিন্ন প্রান্তে ছিং-বিরোধী অভ্যুত্থান যার শিকড় আগেই দৃঢ় হয়েছিল নূতন করে আবার ঘটতে থাকল এবং পরে দেশব্যাপী থাইফিং বিদ্রোহের সঙ্গে এক হয়ে গেল। ঐ একই যুগে সংঘটিত বিভিন্ন জাতিসত্তার অভ্যুত্থানগুলিও কিছুটা থাইফিং বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবিত হল।

থাইফিং অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন হোং সিউছ্যুয়ান (১৮১৪—১৮৬৪) নামে একজন দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক কৃষক পরিবারে। তিনি কুয়াংতোং প্রদেশের হুয়াসিয়ান জেলার অধিবাসী ছিলেন। স্বর্গ-মর্ত্য সমিতি প্রচারিত ছিং-বিরোধী মনোভাবের কথা তাঁর জানা ছিল। পরে তিনি বিদেশী পাদ্রীদের কাছ থেকে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ সালে, তিনি 'পাই শাংতি হুই' অর্থাৎ 'ঈশ্বরভক্ত সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে 'ঈশ্বর' এবং 'খ্রীষ্ট'র নামে জনগণকে বিপ্লব সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ করলেন। খৃষ্টধর্মের কয়েকটি সাধারণ মতবাদ গ্রহণ করে হোং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমতা এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সম্পর্কে তাত্ত্বিক শিক্ষা ও তার প্রচারকার্য করতে থাকলেন। বহু গরীব কৃষকেরা তাঁর ভক্ত হল। যে সব ভূস্বামী এবং বণিক রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভূস্বামীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন তাদেরও অনেকে হোং-এর সংগঠনে যোগদান করলেন। ১৮৪৭ সাল থেকে তিনি এবং ফেং ইয়ুনশান (১৮২১—১৮৫২) নামে আর একজন নেতা তাদের অনুগামীদের নিয়ে ভূস্বামীদের সশস্ত্র সেনাদের বিরুদ্ধে একের পর এক তীব্র সংগ্রাম চালনা করলেন। পরে হোং সাতজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি নেতৃত্বমণ্ডল গঠন করলেন। ১৮৫১ সালের ১১ই রী, কুয়াংসি প্রদেশের কুইফিং জেলার অন্তর্গত চিনথিয়ান গ্রামে অভ্যুত্থান শুরু করলেন এবং একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন, যার নাম তিনি দিলেন 'থাইফিং স্বর্গীয় রাজ্য'।

থাইফিং সেনারা দ্রুতগতিতে রাজসরকারের সেনাব্যূহ ভেদ করে কুইলিন ও

ছাংশা আক্রমণ করলেন এবং ইয়ুয়েচৌ, উছাং ও হানখৌ অধিকার করে ইয়াংসি নদীর কূল ধরে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। তিন বছরের মধ্যে তাঁরা কুয়াংসি থেকে নানচিং-এ পেঁীছতে সক্ষম হলেন। থাইফিং সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দশ লক্ষ সৈন্যসম্পন্ন এক বিরাট বাহিনীতে পরিণত হল। তাঁরা প্রধানতঃ রাজকর্মচারী, প্রভাবশালী আমীরওমরাহ, ভূস্বামী এবং সুদখোর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত হলেন। অভিযানের সময় তাঁরা যে সব স্থান অতিক্রম করে চললেন সেই সব স্থানে তাঁরা ভূমিকর আদায়ের রেজিস্টার, জমির দলিল এবং ঋণপত্র সব পুড়িয়ে দিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁরা এই সব ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এর জন্যে তাঁদের অভিযানের পথের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের কৃষকেরা বিপুল সংখ্যায় থাইফিং সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন এবং তাঁরাই এই বিপ্লবী বাহিনীর মূল শক্তিতে পরিণত হলেন। শহরের ছিং-বিরোধী বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির বহু হস্তশিল্প কারিগর এবং দরিদ্র ব্যক্তিও থাইফিং সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন।

১৮৫৩ সালে থাইফিং বিদ্রোহীরা নানচিং-এ একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ সরকার সর্বপ্রথমে "স্বর্গরাজ্যের ভূমি-ব্যবস্থা" ঘোষণা করলেন যাতে জমিদারি-ভূমিসত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে প্রত্যেক কৃষকের জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত জমির অধিকারী হবার নীতি গৃহীত হল। থাইফিং স্বর্গরাজ্যের ভূমি সম্পর্কে মতবাদে একদিকে প্রকাশিত হল সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী চরিত্র, অন্যদিকে প্রকাশিত হল এই নীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ সম-আয়তন জমি-বণ্টন করে সম্পত্তির উপর সর্বসাধারণের মালিকানা-প্রথা প্রবর্তনের অলীক-কল্পনা। নিঃসন্দেহ, এই কল্পনা কার্যকরী হতে পারেনি। নগর এবং শহরে থাইফিংরা হস্তশিল্প-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ের কারখানা খোলার জন্য উৎসাহ দিলেন এবং তাতে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেল। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করলেন এবং লঘু-কর ও কর-আদায় ব্যবস্থা সহজ করলেন। এই সব পদক্ষেপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অগ্রগতিলাভ করল এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে সিল্ক ও চা রপ্তানি হল। আফিম ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হল।

থাইফিং স্বর্গীয় রাজ্যের ব্যর্থতা: নানচিং অধিকার করার পর থাইফিংরা

একটি সাঙ্ঘাতিক কৌশলগত ভুল করলেন। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের মূল কেন্দ্র পেইচিং আক্রমণ করলেন না বা বিদেশী পুঁজিবাদীদের ঘাঁটি শাংহাইও অধিকার করলেন না। ১৮৫৩ সালে, তাঁরা চীনের উত্তর দিকে অভিযান চালনার জন্য লিন ফেংসিয়াং (?—১৮৫৫) এবং লি খাইফাংকে (১৮২৪—১৮৫৫) নেতৃত্ব গ্রহণের আদেশ দিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা থিয়ানচিনের উপকণ্ঠে পেঁীছালেন, কিন্তু পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে থিয়ানচিন অধিকার করতে পারলেন না। ইয়াংসি নদীর পশ্চিম দিকে শি তাখাই-এর (১৮৩১—১৮৬৩) নেতৃত্বাধীন থাইফিং সেনাবাহিনীকে জেং কুওফান-(১৮১১—১৮৭২)-এর নেতৃত্বে ভূস্বামীদের সেনাবাহিনী বাধা দিল। ছিং সেনাবাহিনীর মনোবল ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু ছিং শাসকদের স্বার্থে জেং কুওফান মধ্য এবং ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক এবং হিংস্র ঘাতক ছিলেন এবং তার 'হুনান সেনাবাহিনী' থাইফিং সেনাবাহিনীর এক দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

১৮৫৬ সালে থাইফিং নেতাদের মধ্যে প্রবল মত-পার্থক্যের ফলে বিভেদের সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ভূস্বামী ও বিত্তশালী বণিক পরিবার থেকে আগত ওয়েই ছাংহুই (?—১৮৫৬)। তিনি কৃষক পরিবার থেকে আগত তাদের একজন শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ ইয়াং সিউছিংকে হত্যা করলেন এবং তার কয়েক হাজার সেনাদের প্রাণনাশ করলেন। এর পর অবশ্য ওয়েই নিজেও নিহত হলেন। আরেকজন ভূস্বামী পরিবার থেকে আগত সেনাপতি শি তাখাই থাইফিংদের মূল সেনাবাহিনী থেকে তার অধীনস্থ সেনাদের সরিয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অভিযান পরিচালনা শুরু করলেন। এইভাবে থাইফিং বিদ্রোহের শক্তি বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং সামরিক উদ্যোগ গ্রহণ করার আগ্রহ অদৃশ্য হল। থাইফিংদের সংগ্রামের শেষের কয়েকটি বছরে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কৃষক পরিবার থেকে আগত দুজন সুদক্ষ যুব সেনাপতি লি সিউছেং (১৮২৩—১৮৬৪) এবং ছেং ইয়ুছাং (১৮৩৭—১৮৬২)।

দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের পর ছিং রাজশাসকদের কাছ থেকে পুঁজিবাদী শক্তিরা তাদের লুণ্ঠনমূলক সব দাবী আদায় করে নিয়েছিল। সুতরাং ছিং রাজসরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখা এবং নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তারা থাইফিং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করতে মনস্থির করল। ১৮৬০

সালে F.T. Ward নামে একজন আমেরিকাবাসী ভাড়াটে সৈনিক শাংহাই থেকে বিদেশী বাউণ্ডুলদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করলেন এবং ছিং সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় থাইফিংদের নিয়ন্ত্রণাধীন নগর ও শহরগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠনে লিপ্ত হলেন। 'সর্বদা বিজেতা-বাহিনী' নামে অভিহিত এই ভাড়াটে সেনাদের সত্যিকারের যুদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল না। তারা বার বার লি সিউছেং-এর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী দ্বারা পরাজিত হল। ১৮৬৩ সালের শুরুতে, ছিং রাজবংশের একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনানায়ক লি হোংচাং 'সর্বদা বিজেতা-বাহিনী' পুনর্গঠনের জন্য ইংরেজ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজ সেনাবাহিনীতে কর্মরত চীনা অফিসার ও সেনাদের 'বিজেতা বাহিনী'তে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হল। এর কিছু দিন পরই ছিং রাজসরকার ইংরেজ অফিসার C.G. Gordon কে লি হোংচাঙের পরি-চালনাধীনে 'বিজেতা বাহিনীর' অধিনায়করূপে নিযুক্ত করলেন। এই দুজন ব্যক্তি সুচৌ শহরের থাইফিং শিবিরভুক্ত কিছু দোদুল্যমানচিত্তের লোকেদের প্রলুব্ধ করে তাদের সুচৌ শহরকে ছিং সেনাবাহিনীর কাছে সমর্পণ করার জন্য নানাপ্রকার জঘন্য এবং অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, ছিং সেনাবাহিনী এবং তথাকথিত 'বিজেতা বাহিনী' সুচৌ শহরে প্রবেশ করল এবং সেখানে লি হোংচাং ও তার বাহিনী নির্দয়ভাবে গণহত্যা ও লুণ্ঠন করল।

এদিকে চীনে অবস্থিত ফরাসী সামরিক ও নৌ-সেনাবাহিনী চেচিয়াং প্রদেশে থাইফিংদের দমন করার কাজে নিয়োজিত ছিং সেনাপতি জুও জোংথাংকে (১৮১২—১৮৮৫) সাহায্য করছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। সুতরাং থাইফিংবাহিনীর পক্ষে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ১৮৬৪ সালের ১লা জুন হোং সিউছ্যুয়ান অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। ১৯শে জুলাই নানচিং শহরের পতন হল। কিন্তু প্রতিরোধ বাহিনীর একজনও অফিসার বা সৈনিক আত্মসমর্পণ করলেন না। অনেকে শত্রুব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন, আবার অনেকে আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। লি সিউছেংকে বন্দী করা হল এবং পরে জেং কুওফান তাকে হত্যা করলেন।

থাইফিং বিপ্লব একটি কৃষকদের অভ্যুত্থান হলেও এই বিপ্লব সামন্ততন্ত্র এবং বিদেশী পুঁজিবাদী আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করার এই দুটি দায়িত্ব গ্রহণ

করেছিল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষক এবং একনিষ্ঠ বিপ্লবী-নেতারা নিজেদের বিপ্লবী মুক্তির আদর্শের জন্য সংগ্রাম ও প্রাণদান করেছিলেন। যদিও এর তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁরা চীনা মজদুর-জনতার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুদের প্রতি অনমনীয় মনোভাবের গৌরবময় ঐতিহ্য পালন করেছিলেন।

শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বহীন শুধুমাত্র কৃষকদের যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়াই অবধারিত ছিল। কিন্তু থাইফিং বিপ্লব ছিং রাজবংশের শাসনকে নড়বড়ে করে দিল এবং পুঁজিবাদী শক্তিদের চীনকে বশীভূত করার দিবা-স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করল।

নিয়ান বাহিনী এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার অভ্যুত্থান : থাইফিং স্বর্গীয় রাজ্যের সহযোগী নিয়ান বাহিনী উত্তর চীনের কৃষক-বিপ্লবের প্রধান অবলম্বন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এই নিয়ান বাহিনী আনহুই এবং হোনান প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছিল। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত তারা থাইফিং বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যুদ্ধ করেছিল এবং বহু সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু এই দুটি বিপ্লবী শক্তি ঐক্য স্থাপন করে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করতে সক্ষম হয় নি। নিয়ান বাহিনীতে সাংগঠনিক শৃংখলার অভাব ছিল এবং অন্তর্কলহের জন্য এই বাহিনী বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে নি। থাইফিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ছিং রাজসরকার নিয়ান বাহিনীকে দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকল এবং অবশেষে ১৮৬৮ সালে এই বাহিনীকে বিনাশ করল।

বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতি ছিং রাজসরকার বরাবর অতি প্রতিক্রিয়াশীল শাসন চালিয়ে এসেছে। হান লোকেদের মতো বিভিন্ন জাতিসত্তাও ছিং রাজাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছিল এবং বশীভূত হতে অস্বীকার করেছিল। থাইফিং বিপ্লব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সব জাতিসত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের ব্যাপকভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল। এই সকল অভ্যুত্থানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মিয়াও এবং হুই (মুসলিম) জাতিসত্তাদের অভ্যুত্থান।

১৮৫০ সালের পর থেকে কুইচৌ প্রদেশের মিয়াও লোকেরা যে সকল অভ্যুত্থান করেছিল তা বিশ বছর (১৮৫৪—১৮৭২) ধরে স্থায়ী ছিল। এক সময়ে তারা শি তাখাই'র নেতৃত্বে থাইফিং সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করে-

ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই সব অভ্যুত্থান দমন করার জন্য চরম হিংস্র পন্থা অবলম্বন করে বিপুল জনসংখ্যার বিনাশ করল। তারা দশ লক্ষ লোক নিহত করলেও মিয়াওদের দমন করতে ব্যর্থ হল।

ইয়ুন্নান প্রদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তারাও ছিং রাজবংশের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৫ সালে এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হুইলোকেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করল। পশ্চিম ইয়ুন্নানের ইয়োংছাং নামক স্থানের অভ্যুত্থান অচিরেই একটি বিরাট আন্দোলনের আকার ধারণ করল। এই অভ্যুত্থানের সময় তু ওয়েনসিউ (? —১৮৭৩) নামে একজন মুসলমান নেতৃত্বের অধিকার পেলেন। ছিং রাজবংশের শাসন অবসানকল্পে একতার উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্তা এক পতাকার নীচে দাঁড়ালেন। ১৮৬৭ সালে তু ওয়েনসিউ ২00,000 লোকের একটি বাহিনীকে খুনমিং আক্রমণ করতে পাঠালেন। ১৮৬৯ সালের শেষে খুনমিং শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস হল এবং তিনি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। ১৮৭৩ সালে তাঁর অধিকৃত তালি শহরের পতন হল এবং তিনি নিজে বিষপান করে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর পরাজয়ের পর ছিং সেনাবাহিনী ইয়ুন্নান প্রদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্তা লোকেদের হত্যা করল।

১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে সেনসী এবং কানসু প্রদেশদ্বয়ের হুই লোকেরা থাইফিং বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। থাইফিং সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর ছিং রাজসরকার কুখ্যাত সামন্ত সেনাপতি এবং জল্লাদ জুও জোংথাং-এর অধীনে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীকে ঐ দুই প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে, জুও হুই-বিদ্রোহীদের উত্তর সেনসী পর্যন্ত ধাওয়া করে তাদের ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করলেন, এবং তাঁর বাহিনীকে নিয়ে কানসুর দিকে অগ্রসর হলেন। পাঁচ বছর ধরে সংঘর্ষের পর তিনি হুই-বিদ্রোহীদের সব ঘাঁটি ধ্বংস করতে সক্ষম হলেন। যে সকল হুই-শরণার্থী কানসু প্রদেশে তাদের শক্ত-ঘাঁটি সুচৌতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি তাদের প্রায় সকলকেই হত্যা করলেন।

১৮৬৪ সালে, সিনচিয়াং-এর বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকেরাও ছিং রাজবংশের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তাদের এই সংগ্রাম ১৮৭৬ সালে জুও জোংথাং-এর বিরাট বাহিনী দমন করেছিল। জুও দক্ষিণ সিনচিয়াং-এ

ইংরেজদের পোষ্য অত্যাচারী ইয়াকুব বেগের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে বিনাশ করে সিনচিয়াংবাসীদের সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। এই দিক থেকে বলা যেতে পারে যে জুও জোংথাং চীনা জনগণের হিতার্থে কিছু কাজ করেন।

বিভিন্ন জাতিসত্তার এই সকল উত্থান থাইফিং এবং নিয়ান সেনাবাহিনীর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল। সারা চীনে বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকেরা ছিং রাজবংশের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল-দের বর্বর হত্যাকাণ্ড জনগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কণ্ঠরোধ করতে পারে নি। বরঞ্চ, তা তাদের প্রতিরোধ করার ইচ্ছাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

৩. উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের এবং আশির দশকের সময়কার চীনের অবস্থা

আধা-উপনিবেশে পরিণত চীন: দুটি আফিম যুদ্ধের পর চীন ক্রমশঃ আধা-উপনিবেশে পরিণত হতে থাকে। দেশের এবং বাহিরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা চীনবাসীদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধকে দমন করার জন্য হাত মেলালে চীন দ্রুত আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় পরিণত হওয়ার দিকে এগুতে থাকল। থাইফিং বিদ্রোহ ছিং রাজবংশের শাসনের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছিল। নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য শাসকেরা জনসাধারণের প্রতি অধিকতর দমন নীতি প্রয়োগ করল এবং বিদেশী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আরও সহযোগিতা করতে থাকল। রাজমাতা সম্রাজ্ঞী ছি সী'র (১৮৩৫—১৯০৮) নিয়ন্ত্রণাধীনে সামন্ততান্ত্রিক শাসকেরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জেং কুওফানের নেতৃত্বে হুনানের সামন্তসেনাধিপতিচক্রের এবং লি হোংচাং-এর নেতৃত্বে সামন্ত-সেনাধিপতিচক্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ১৮৭০ সালের পর থেকে দু দশকেরও অধিক লি হোংচাং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পেইইয়াং (উত্তর) নৌ ও পদাতিক বাহিনীকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিলেন এবং জনসাধারণের প্রতি দমন নীতি প্রয়োগ করেছিলেন।

দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ফলে কৃষি উৎপাদনে প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়েছিল। কিন্তু

আশির দশকে উৎপাদন ক্রমশঃ স্বাভাবিক হতে থাকে। আগের মতোই ভূস্বামী-শ্রেণী তাদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত করার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। তার ফলে, সাধারণ লোকেদের জীবনযাপনের মানের অবনতি হতে থাকে। আর্থিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণের জন্য অধঃপতিত ছিং শাসকেরা কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র হস্তশিল্প কারিগরদের উপর চাপিয়ে দিল নতুন নতুন করের বোঝা। যেমন, অতিরিক্ত-কর, আভ্যন্তরীণ চলাচল-কর এবং অন্যান্য আরোপিত-কর। ঐ একই সময়ে বিদেশী পুঁজিবাদীরা নামেমাত্র শতকরা পাঁচ শতাংশ সমহারের আমদানি-শুল্ক এবং ২.৫ শতাংশ চলাচল-শুল্ক প্রদান ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বিপুল পরিমাণের কম-দামী সুতো, সুতীদ্রব্য, কেরোসিন তৈল এবং তামাক-পাতা চীনে আমদানি করতে থাকে। এর ফলে গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র ইত্যাদি প্রধান প্রধান সম্পূরক বৃত্তি ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে এবং কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করে অধিকমূল্য দিয়ে আমদানিকৃত বিদেশীদ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হন। বিদেশী এবং মেসিনের তৈরী দ্রব্য আমদানির ফলে নগর ও শহরের কোন কোন হস্তকৃত শিল্পের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে চীনের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার মোটমূল্য ১০০ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০০ মিলিয়ন টেইল শুল্কদপ্তরের রৌপ্যমুদ্রা। আমদানী-দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল আফিম এবং শিল্পকারখানায় উৎপাদিত বস্ত্র। আর চা, সিল্ক, তুলো এবং অন্যান্য কাঁচামাল ছিল প্রধান প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। বিদেশী জাহাজগুলোর সমুদ্র-উপকূলে ও নদী উপকূল অঞ্চলে যানবাহন চলাচলের একচেটিয়া অধিকার ছিল। শুল্কদপ্তর এবং সমুদ্র-উপকূল পাহারার ব্যবস্থা একজন বিদেশী ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। চীন দেশের ব্যাঙ্ক এবং অর্থ-লগ্নী ব্যবসা বিদেশী ব্যাঙ্ক যথা ইংরেজদের হংকং এবং শাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ও চার্টাড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং চায়না'র কর্তৃত্বে ছিল। দুটি বিরাট পাহাড়ের মতো সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং বিদেশী অর্থনীতিক দাসত্ব চীনবাসীদের দাবিয়ে রেখেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক আমলাদের 'পাশ্চাত্যকরণ' আন্দোলন এবং চীনদেশে আধুনিক শিল্পপণ্যোৎপাদক পুঁজিবাদের সূচনা: আলোচিত যুগে সামন্ত সেনাধিপতিদের এবং ম্যাণ্ডারিন অর্থাৎ আমলাদের একাংশ চীনকে 'পাশ্চাত্যকরণ' করার

দাবী জানাতে থাকেন। তাদের এই 'পাশ্চাত্যকরণের' উদ্দেশ্য ছিল পতনোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে চাঙ্গা করে তুলে চীনকে পুঁজিবাদী দেশ সমূহের শক্তি এবং কারিগরী-দক্ষতার উপর নির্ভরশীল করা। এই 'পাশ্চাত্যকরণ' আন্দোলনের প্রধান নায়কেরা ছিলেন হুনান এবং আনহুই প্রদেশ দুটির সামন্ত সেনাধিপতিদের চক্র। ষাটের এবং সত্তরের দশকে চীনকে শক্তিশালী করার ধ্বনি তুলে এই দুটি প্রদেশের সামন্ত-সেনাধিপতিরা সমরাস্ত্র তৈরি করার কারখানা স্থাপিত করল। এই সকল কারখানার প্রয়োজনীয় পুঁজি যুগিয়েছিল রাজসরকার এবং পরিচালনার ভার ছিল আমলা এবং মুৎসুদ্দিদের ওপর। প্রধানতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্যই বিদেশী যন্ত্রবিৎ নিযুক্ত হত এবং বিদেশী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হত। এইসব কারখানা সামন্ততান্ত্রিক সরকার চালিত শিল্পের অনুরূপ পন্থায় পরিচালিত হত।

'পাশ্চাত্যকরণ' আন্দোলনের নেতারা জাহাজ পরিবহণ এবং খনিজ শিল্পতেও মাথা গলিয়েছিলেন। এই ধরণের শিল্পের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ১৮৭২ সালে লি হোংচাং কর্তৃক স্থাপিত এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী পুঁজিপুষ্ট 'চায়না ম্যারচণ্টস স্টিমশিপ নেভিগেশন কোম্পানী'। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মতো শেয়ারের ব্যবস্থা থাকলেও এই কোম্পানী সম্পূর্ণ সামন্ত সেনাধিপতি এবং মুৎসুদ্দিদের কর্তৃত্বাধীন ছিল; এর পরিচালনা ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের বা অংশীদারদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার কোন অধিকার ছিল না।

আশির দশকে এক ধরণের তথাকথিত 'সরকারী-তত্ত্বাবধান এবং বণিক-পরিচালিত' শিল্পসমূহ বেশ বিকাশলাভ করতে থাকে। আসলে এইসব শিল্পে বণিকেরা পুঁজি যোগাতেন এবং রাজকর্মচারীরা তার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন। এই ধরণের একটি শিল্প ছিল ১৮৮২ সালে পরিকল্পিত শাংহাই সুতীবস্ত্র মিল যা বাস্তবে দশ বছর পরে উৎপাদন শুরু করে। অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের হাতে পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকায় এইসব শিল্পগুলিকে প্রায়ই বিপুল আর্থিক ক্ষতি বহন করতে হত। সুতরাং জনসাধারণ এই ধরণের উদ্যোগের প্রতি আস্থা হারায় এবং কেউ আর তাতে পুঁজি নিয়োগ করতে ভরসা পেত না।

সত্তরের দশকে কোন কোন চীনা পুঁজিপতি কুয়াংতোং, শাংহাই, উহান ইত্যাদি স্থানে ক্ষুদ্রাকারের ধাতুর কারখানা, কাগজ তৈরির কারখানা, দিয়াশলাই

তৈরি কারখানা এবং রেশম কারখানা স্থাপিত করেন। এইগুলি ছিল চীনা পুঁজি বিনিয়োগে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত শিল্প। কিন্তু বিদেশী-পুঁজিবাদ এবং স্বদেশীয় সামন্তবাদের যুগপৎ চাপের ফলে এই শিল্পগুলির বিকাশলাভের সুযোগ ছিল না। 'পাশ্চাত্যকরণ' পক্ষপাতী আমলাদের হাতে নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকায় তারা এইসব উদ্যোগগুলিকে নিজেদের ভোগ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করতে সচেষ্ট হয় এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর গঠন এবং বিকাশের সব পথকে রুদ্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

যে সামাজিক অবস্থার জন্য চীনে শিল্পপণ্যোৎপাদী পুঁজিবাদ উদ্ভবের শুরু হয়েছিল সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কোন কোন বুদ্ধিজীবী দেশে বুর্জোয়া ধরণের রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী তুলতে থাকেন। যেমন, শাংহাই এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকটি ব্যবসা সংস্থার মালিক চেং কুয়ানইন 'শেং শি ওয়েই ইয়ান' (শান্তি ও প্রাচুর্যের সময়কার সাবধান বাণী) নামে একটি পুস্তক লেখেন। এই পুস্তকে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, চীনের পক্ষে শুধু পাশ্চাত্যদেশবাসীদের শিল্প প্রযুক্তিবিদ্যাই গ্রহণ করা নয় তাদের রাজনীতিও গ্রহণ করা উচিত হবে। এই রাজনীতি বলতে অবশ্য তিনি বুর্জোয়া রাজনীতির কথাই বুঝিয়েছিলেন। চেচিয়াং এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের ভূসম্পত্তির অধিকারী বিত্তশালী ব্যক্তিরা পার্লামেণ্টারী প্রথায় একটি সংসদ গঠনের দাবী জানিয়েছিলেন। এই দাবীতে ব্যক্ত হয়েছিল চেচিয়াং এবং চিয়াংসু অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীতে পরিণত হবার সংস্কারসাধনেচ্ছু মনোভাব।

চীনের সীমান্ত অঞ্চলে বিদেশী পুঁজিবাদীদের আরও অবৈধ সীমালঙ্ঘন: বিদেশী পুঁজিবাদী লুণ্ঠনকারীদের লালসার সীমার শেষ ছিল না। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য এবং সামরিক যানবাহন চলাচলের জন্য যোগাযোগ পথের দূরত্ব হ্রাস পেল। প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আমদানী করার ফলে ১৮৭৩ সালে শাংহাই এবং অন্যান্য শহরে ব্যবসায়ে মন্দাভাবের সৃষ্টি হল। তবুও, বিদেশী পুঁজিবাদীরা মরিয়া হয়ে তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য আরও বাজার খুঁজতে থাকল। এর পরিণতি হল, প্রত্যেক বিদেশী শক্তি চীনের সীমান্তে পরপর নতুন আক্রমণ শুরু করল যাতে কিনা ঐ সব স্থানে ঘাঁটি করে তারা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায়

তাদের পণ্যদ্রব্য বাজারজাত করার অথবা কাঁচামাল সংগ্রহ করার একচেটিয়া অধিকার পেতে পারে। জাপান কর্তৃক চীনের অধীনে সামন্ত রাজ্য লিউছিউ আক্রমণে সাহায্য করা ছাড়া চীনের ভূখণ্ড খাইওয়ান আক্রমণের সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে, C.W. Le Gendre নামে আমেরিকার একজন অবসরপ্রাপ্ত কন্সাল এবং কিছু সংখ্যক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদাতিক ও নৌ-বাহিনীর অফিসার জাপানী সেনাপতি ওকুমা এবং সাইগোর অধীনে জাপ-সেনাবাহিনীকে খাইওয়ানের দক্ষিণ-প্রান্তে লাংছিয়াও নামক স্থানে অবতরণ করার জন্য তাদের সঙ্গে যোগ দেন ও পরিচালনা করেন। খাইওয়ানবাসীরা দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করলে তারা অগ্রসর হতে ব্যর্থ হল। ১৮৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট U.S. Grant চীন এবং জাপানের মধ্যে সালিসি হিসেবে লিউছিউ দুদেশের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য অনুরোধ করলে চীন তা প্রত্যাখ্যান করল। অবশ্য, ১৮৮১ সালে জাপান সারা লিউছিউ অধিকার করল।

বর্মাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার পর ব্রিটেন চীনের ইয়ুন্নান প্রদেশের দিকে তার আগ্রাসনী হাত বাড়াতে থাকে। ১৮৭৬ সালে, ব্রিটেন ছিং রাজসরকারকে 'চেফু (ইয়ানথাই) সন্ধি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য করল। এই সন্ধির বলে ব্রিটেন ইয়ুন্নান, সিচুয়ান, তিব্বত, ছিংহাই এবং কানসুতে সামরিক ও অর্থনীতিক কার্যকলাপ করার সুবিধা পেল।

ফরাসীও ভিয়েতনামে আক্রমণাত্মক অনুপ্রবেশ করার পর ইয়ুন্নানের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। ফরাসীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ তীব্রতর হবার ফলে সংঘটিত হল ১৮৮৩—৮৫ সালের চীন-ফরাসী যুদ্ধ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে বড় শক্তি ছিল লিউ ইয়োংফু-র (১৮৩৭—১৯১৬) নেতৃত্বাধীন "কৃষ্ণ পতাকা বাহিনী"। লিউ ইয়োংফু ছিলেন কুয়াংসি প্রদেশের কৃষক-বিদ্রোহের একজন প্রাক্তন নেতা। পরে, তিনি চীন-ভিয়েতনাম সীমান্তে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে সত্তর বৎসর বয়স্ক আরেকজন প্রধান সেনাপতি ফেং জিছাই (১৮১৮—১৯০৩) চেননানকুয়ান-এ (অধুনা ইয়ৌইকুয়ান) আক্রমণকারী ফরাসী সেনাবাহিনীকে নিদারুণভাবে পরাজিত করলেন আর এই পরাজয়ের ফলে ফরাসী রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করতে হল। তা সত্ত্বেও, ক্ষমতাসীন

লি হোংচাং ফরাসীদের সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং অপমানসূচক সন্ধি করার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন।

দুই দশক ধরে যে সব আমলা এবং সামন্ত সেনাধিপতি অস্ত্র তৈরি শিল্প গড়ে তুলেছিলেন, তাদের উত্থাপিত 'পাশ্চাত্যকরণ' চীন-ফরাসী যুদ্ধে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হল। আর এই ব্যর্থতা দশ বছর পর ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে আরও প্রকট হয়ে উঠল।

৪. চীন-জাপান যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা চীন খণ্ডবিখণ্ড হবার সংকট

জাপান কর্তৃক কোরিয়া এবং চীন দখলের মতলব: চীনের সঙ্গে কোরিয়ার সম্পর্ক 'ঠোট ও দাঁতের মধ্যে সম্পর্কে'র মতো ছিল। দু'হাজার বছর ধরে এই দু'দেশের মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক এবং অর্থনীতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ষোল শতাব্দীর শেষার্ধে হিদেইয়োশি'র অধীনে জাপ-সৈন্যরা কোরিয়া আক্রমণ করলে কোরিয়াবাসীরা তাদের নৌ-সেনাপতি লি সুনসিন-এর নেতৃত্বে এবং চীনের মিং সম্রাট প্রেরিত সেনাদের সহযোগিতায় ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। এর ফলে এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্য আরও দৃঢ়তর হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে, অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের মেইজি সংস্কারের পর, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে জাপানে পুঁজিবাদ অগ্রগতিলাভ করতে থাকে। পরবর্তীকালে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী তানাকার বিবৃতি থেকে জানা যায় যে জাপানের আগ্রাসনের পরিকল্পনা ছিল পর্যায়ক্রমে কোরিয়া, চীনের থাইওয়ান এবং উত্তরপূর্ব চীন, মঙ্গোলিয়া, সমগ্র চীন এবং সমগ্র বিশ্ব আক্রমণ করা। লিউছিউ এবং থাইওয়ান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাপান কোরিয়াও আক্রমণ করল। ১৮৭৫ সালে একটি জাপ-যুদ্ধজাহাজ কাংহোয়া দ্বীপের কূলে অনুপ্রবেশ করার পরই জাপান কোরিয়াকে কয়েকটি বাণিজ্যিক বন্দর উন্মুক্ত এবং কোরিয়া উপকূল জরিপ করার দাবী গ্রহণ করতে বাধ্য করল। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ যুদ্ধে সাহায্যের পরিবর্তে ছিং রাজসরকার

কোরিয়াকে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী এবং জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোপন পরামর্শ দিল এই আশা নিয়ে হয়ত তাতে জাপানকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু জাপানের আক্রমণ প্রতিদিন বিস্তারলাভ করতে থাকল।

১৮৮২ সালে কোরিয়ার শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্কলহের আবির্ভাব হলে জাপান সেই সুযোগ গ্রহণ করে কোরিয়াতে তার সেনাবাহিনী পাঠাল এবং ১৮৮৪ সালে রাজপ্রাসাদ অধিকার করল। এই সময় কোরিয়াবাসীদের সঙ্গে চীনা সৈনিকরা একযোগে যুদ্ধ করে জাপানীদের পরাজিত করলেন। ছিং রাজসরকার জার রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। তখন, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় কোরিয়াতে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হল।

১৮৯৪—৯৫-এর চীন-জাপান যুদ্ধঃ ১৮৯৪ সালে কোরিয়াবাসীগণ তোং-হাক সোসাইটি (প্রাচ্যবিদ্যা সঙ্ঘ)-এর নেতৃত্বে সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কোরিয়া সরকার ছিং সরকারের সাহায্যের জন্য আবেদন জানাল। এই সুযোগ গ্রহণ করে জাপান কোরিয়া আক্রমণ করল। চীনা সৈন্য কোরিয়া পৌঁছুবার আগেই তোংহাক সোসাইটির উত্থানের সমাপ্তি ঘটেছিল। জাপান সরকারের নিকট একটি কূটনীতিক প্রতি-বেদনে ছিং সরকার কোরিয়া উপদ্বীপ থেকে চীন এবং জাপানী উভয় রাজ্যের সেনাবাহিনীকে সরিয়ে আনবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু জাপান কোরিয়া ছাড়তে অস্বীকার করল, কোরিয়ার রাজাকে বন্দী করল এবং রাজধানী সিউল শহরে যাবার সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করল। জাপানের প্ররোচনার ফলে চীন এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল।

এই যুদ্ধে বহু চীনা সৈনিক এবং সামরিক অফিসার বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পদাতিক সেনাবাহিনীর অফিসার জুও পাওকুই (?—১৮৯৪) এবং নৌ-বাহিনীর অফিসার তেং শিছাং (?—১৮৯৪) এবং তাদের সেনারা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। জুও এবং তেং উভয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। সম্রাট কুয়াং স্যু (রাজত্বকাল ১৮৭৫—১৯০৮) এবং বিত্তমন্ত্রী ওয়েং থোংহো (১৮৩০—১৯০৪)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধাকাংক্ষী দলের পরিকল্পনা ছিল যে যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করবেন, যুদ্ধে সাফল্যলাভের

বাস্তব পন্থা অবলম্বনের কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। রাজমাতা ছি সি এবং লি হোংচাং-এর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণকারী দল যুদ্ধের জন্য কোন প্রস্তুতি না করে জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাশিয়া এবং ব্রিটেনের দ্বারস্থ হলেন। এই আত্মসমর্পণকারী দল তখন খুব প্রভাবশালী হওয়াতে চীনকে পরাজয় বরণ করতে হল এবং কোরিয়া, লিয়াওতোং উপদ্বীপ ও ওয়েইহাইওয়েই জাপানের অধিকারে এল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান ছিং রাজসরকারকে বাধ্য করল "সিম-নোসেকি সন্ধি" স্বাক্ষর করতে। এই সন্ধি অনুযায়ী চীন (১) লিয়াওতোং উপদ্বীপ, থাইওয়ান ও ফেংহু দ্বীপের ওপর জাপানের অধিকার মেনে নিল; (২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জাপানকে ২০ কোটি রৌপ্যমুদ্রা দিতে স্বীকৃত হল, এবং (৩) সন্ধিভুক্ত বন্দরে জাপানীদের শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অনুমতি দিল।

জাপানের হাতে থাইওয়ানকে সমর্পণ করার খবর জানবার পর এই দ্বীপে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে থাকে এবং লিউ ইয়োংফু'র নেতৃত্বে জাপানীদের বিরুদ্ধে ছ মাস যুদ্ধ চালনা করেন। চীনের মূল-ভূখণ্ডের নিবাসীরাও তাদের বীর ভ্রাতাদের উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন ও সাহায্য করেন। কিন্তু ছিং রাজসরকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে থাইওয়ানে রসদ যাওয়ার পথ বন্ধ করল। লিউ ইয়োংফু এবং বীর থাইওয়ানবাসীদের সংগ্রাম চালনা করা আর সম্ভব হল না। ১৮৯৫ থেকে ১৯৪৫ সালে থাইওয়ান চীনের পুনরাধিকারে আসা পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী এই দ্বীপের অধিবাসীগণ মাতৃভূমির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

জাপান কর্তৃক কোরিয়া এবং লিয়াওতোং উপদ্বীপ দখল উত্তরপূর্ব চীনের ওপর জার-রাশিয়ার মতলব পরিপূরণে বাধা সৃষ্টি করল। সুতরাং, জার্মানি এবং ফ্রান্সের সহযোগিতা অর্জন করে রাশিয়া জাপানকে লিয়াওতোং উপদ্বীপ চীনকে প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য করল। ব্রিটেন জার-রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করলেও জাপান যে চীনের মূলভূখণ্ডের কোন অংশের ওপর অধিকার প্রাপ্ত হোক তা ব্রিটেনের ইচ্ছা ছিল না। সেজন্য ব্রিটেন রাশিয়ার এই পদক্ষেপের প্রতি নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাপান নিরুপায় হয়ে চীনকে লিয়াওতোং উপদ্বীপ প্রত্যার্পণ করল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরও অতিরিক্ত ৩ কোটি রৌপ্যমুদ্রা চীনের কাছ থেকে আদায় করে নিল।

চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের 'প্রভাব-বলয়' সৃষ্টি : চীন-জাপান যুদ্ধের আগেই বিশ্ব পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া কারবার শুরু হল এবং বিদেশে পুঁজি রপ্তানি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। 'সিমনোসেকি সন্ধি'র শর্ত অনুসারে সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধে চীনে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হল। তারপর থেকে, চীনে মূলধন রপ্তানি এই সব শক্তির চীন আগ্রাসনের একটি প্রধান অঙ্গে পরিণত হল। চীনদেশে নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করার সুবিধার জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চীনকে খণ্ডবিখণ্ড করে, তাদের কথায়, নিজেদের 'প্রভাব-বলয়' সৃষ্টি করল। ১৮৯৫ সাল থেকে এই সব শক্তি তাদের কার্যকলাপের ঘাঁটির জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু করল। চীন খণ্ডবিখণ্ড হবার পরম সঙ্কটের সম্মুখীন হল।

১৮৯৫ সালে, ফ্রান্স ইয়ুন্নান প্রদেশভুক্ত মেংউ ও উদে জেলা দুটি দাবী করে তা নিজের অধিকারে নিল এবং ভিয়েতনাম থেকে ইয়ুন্নান ও কুয়াংসি পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত করল। অতঃপর, ইয়ুন্নান এবং পার্শ্ববর্তী দুটি প্রদেশ কুয়াংতোং ও কুয়াংসিতে খনি খনন করার অধিকার দাবী করল। ১৮৯৭ সালে, ফ্রান্স ছিং রাজসরকারের কাছ থেকে যে ঘোষণা আদায় করল তাতে স্বীকৃত হল, চীন হাইনান দ্বীপ অথবা ঐ দ্বীপের সম্মুখস্থ মূলভূখণ্ডের কোন অংশ কোন শক্তিকেই ইজারা দেবে না। ১৮৯৮ সালে ফ্রান্স কুয়াংচৌওয়ান-এর 'ইজারা' নিল।

ইয়ুন্নান এবং কুয়াংতোং ও কুয়াংসি যে একমাত্র ফরাসীদের 'প্রভাব-বলয়' রূপে পরিণত হোক ব্রিটেন তা বরদাস্ত না করতে পেরে ইয়ুন্নানের ইয়েরেনশান ও কুয়াংসির সিচিয়াং (পশ্চিম নদী) নদীর উপকূলবর্তী উচৌ ও অন্যান্য শহরগুলিকে 'সন্ধিভুক্ত বন্দর' হিসেবে উন্মুক্ত করার দাবী করল। ১৮৯৮ সালে ব্রিটেন জার রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমভার বজায় রাখার জন্য শানতোং প্রদেশের ওয়েই হাই ওয়েইতে 'ইজারা'র অধিকার নিল; আর ফরাসীদের বিরুদ্ধে সমভার বজায় রাখার জন্য কৌলুন উপদ্বীপ, হংকং এবং তাফেং ও শেনচেন উপসাগরের নিকটবর্তী বিভিন্ন দ্বীপ ও উপদ্বীপের 'ইজারা' নিল।

১৮৯৭ সালে, জার্মানি বলপূর্বক চিয়াওচৌ উপসাগরের 'ইজারা' নিল এবং চিয়াওচৌ-চিনান রেলপথ নির্মাণ করল। এই রেলপথের ৩০ লি * পার্শ্ববর্তী

* ১লি = $\frac{1}{2}$ কিলোমিটর অথবা মোটামুটি $\frac{1}{3}$ মাইল

এলাকায় জার্মানি খনি খনন করার অধিকারও আদায় করল এবং ইংরেজদের সহযোগে থিয়ানচিন—ফুখৌ রেলপথ নির্মাণ করল।

দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সময় চীনের দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করে জার রাশিয়া হেইলোংচিয়াং নদীর উত্তর, উসুলি নদীর পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম চীনে অবস্থিত সিনচিয়াং প্রদেশের সীমান্ত এলাকার মোট দেড় মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার চীনের বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করেছিল। ১৮৯৮ সালে রাশিয়া ল্যুশুন (পোর্ট আর্থার) এবং তালিয়ান (দাইরেন)-এ 'ইজারা' নেবার এবং পূর্ব রেলপথ নির্মাণ করার অধিকার পেল। পেইচিং—হানখৌ এবং চেংতিং—থাইইউয়ান দুটি রেলপথও নির্মাণ করার অধিকার পেল (প্রথমোক্ত রেলপথ নির্মাণে রাশিয়ার পক্ষে বেলজিয়াম আলোচনা করেছিল)। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রিটেন চীনের মহাপ্রাচীরের অন্যদিকে রেলপথ নির্মাণের জন্য ছিং রাজসরকারকে টাকা ধার দিল। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একসময়ে তীব্র আকার ধারণ করল। ১৮৯৯ সালে এই দু'দেশের মধ্যে এক বোঝাপড়ায় স্থির হল যে ছাংচিয়াং নদী অববাহিকা অঞ্চলে ব্রিটেন রেলপথ নির্মাণ করবে এবং মহাপ্রাচীরের উত্তরের দিকে নির্মাণ করবে রাশিয়া।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা চীনে যেভাবে তাদের 'প্রভাব-বলয়' ভাগ করে নিয়েছিল তা হল : মহাপ্রাচীরের উত্তর দিকের ভূখণ্ডের দাবীদার হল জার রাশিয়া ; ছাংচিয়াং নদী অববাহিকা অঞ্চলের হল গ্রেট ব্রিটেন ; শানতোং-এর হল জার্মানি ; ইয়ুন্নান, কুয়াংতোং এবং কুয়াংসি প্রদেশসমূহের আংশিক হল গ্রেট ব্রিটেন এবং আংশিক হল ফরাসী ; এবং ফুচিয়ান হল জাপানের। এইভাবে ক্রমশঃ সমগ্র চীনের বিখণ্ডীকরণ শুরু হল।

চীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন 'প্রভাব-বলয়' না থাকায় ১৮৯৯ সালে ঐ রাষ্ট্র তথাকথিত মুক্তদ্বার নীতি ঘোষণা করল। এই নীতি অনুযায়ী একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ইজারাধীন স্থান এবং তথাকথিত 'প্রভাব-বলয়' সমূহ উন্মুক্ত করতে বলা হল যাতে কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চীন এবং চীনবাসীদের শোষণের সমান সুযোগ ও সুবিধা পেতে পারে। এই ঘোষণায় আরেক দিকে সমগ্র চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের পুঁজি বিনিয়োগ করার কথা বলা হল যাতে কিনা চীন তাদের সকলের সমভোগী-উপনিবেশে পরিণত হতে পারে। সর্বপ্রথম ব্রিটেন এই নীতি সমর্থন করল এবং তারপরে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি

তাদের সমর্থন জানাল। এইরূপ ছলনাপূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য তার আগ্রাসনী কার্যকলাপ শুরু করল।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আজ্ঞাবাহী দাসরূপে ছিং রাজসরকার: রাজমাতা ছি সি'র নেতৃত্বে একদল আমলা ও ভূস্বামী নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য বিদেশী পণ্যদ্রব্য আমদানী পছন্দ করতেন। আরেকদিকে ঐ দলই যা কিছু পুঁজিবাদী ধরণের হত তার বিরোধিতা করতেন। এঁরা ছিলেন রক্ষণশীল দল। লি হোং চাং-এর নেতৃত্বে ছিল আর এক অংশ আমলা ও ভূস্বামী যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালরূপে কাজ করতেন; তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন যাতে কিনা তাঁরা অধিক পুরস্কারের আশায় তাদের আরও ভালভাবে সেবা করতে পারে। এই দল 'পাশ্চাত্যকরণ' চক্র নামে অভিহিত হল। এই দুটি দলের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তা হল তারা উভয়ই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের আজ্ঞাবাহী দাস।

'সিমনোসেকি সন্ধি' স্বাক্ষরের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা চীনে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, রেলপথ নির্মাণ এবং খনি খননের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থবিনিয়োগ করেছিল। এইভাবে তারা চীনের অর্থনীতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্বপূর্ণ অধিকারী হল। ব্রিটেন এবং জার রাশিয়া ৩৭০ মিলিয়ন রৌপ্যমুদ্রা (tael) চীনকে রাজনৈতিক ঋণ মঞ্জুর করল। যেহেতু এই ঋণ পরিশোধের জন্য আমদানী শুল্ক জামিন অর্থরূপে ধার্য হয়েছিল, সেহেতু ব্রিটেন ও জার রাশিয়া ছিং রাজসরকারের আর্থিক ব্যবস্থা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়ন্ত্রণাধিকার পেল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ইচ্ছা রূপায়ণে লি হোংচাং ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ১৮৯৬ সালে, তিনি একজন জারের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রাশিয়াতে গিয়েছিলেন এবং পরে তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেন। তিনি জার রাশিয়া থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে 'চীন-রাশিয়া চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই চুক্তিতে উত্তরপূর্ব চীন রাশিয়ার নিকট বিক্রীত হল। চীনের দুজন ভাইসরয় চাং চিতোং (১৮৩৭—১৯০৯) এবং লিউ খুন-ই (১৮৩০—১৯০১) লি হোংচাং-এর রাশিয়া-সমর্থক নীতির প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানি ও

জাপানের দালাল; তাঁরা নিজেদের দেশের ক্ষতি করে এইসব দেশকে বহু অধিকার ও সুবিধা প্রদান করেছিলেন।

চীনের দুর্নীতিপরায়ণ শাসকশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বার্থে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দুর্বৃত্তদল নিজেদের ইচ্ছামতো এবং জঘন্যভাবে চীনকে লুণ্ঠন করতে থাকল। লেনিন যথার্থই বলেছেন: "...ইউরোপের সকল সরকার চীনকে ভাগ করে নিতে শুরু করেছে। কিন্তু তা তারা প্রকাশ্যে না করে চোরের মতো গোপনে করছে। পিশাচেরা যেমন মৃতদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এরাও চীনকে নিয়ে ঠিক তেমনি করছে।..." (Lenin, Collected Works, Vol. 4, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1960,p 374) এই ধরণের একদিকে চীনের বিশাল জনগণকে দাসত্বে পরিণত করল, আরেকদিকে দেশে গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করল বিপ্লবে অগ্রগতি লাভের এক পরিস্থিতি।

৫. ১৮৯৮ সালের বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন

বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংস্কারমূলক ধ্যানধারণার উদ্ভব: ঊনবিংশ শতাব্দীর আশি দশকের শুরু থেকে চীনের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে শাংহাই এবং কুয়াংতোং-এ চীন-জাপান যুদ্ধের পরিণতি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ধরণের বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কারমূলক ধ্যানধারণার উদ্ভব হতে থাকে। এই ধ্যানধারণা মূর্ত হয়ে উঠল রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীতে। ১৮৯৫ সালে, 'সিমনোসেকি সন্ধি' স্বাক্ষরের প্রাক্কালে কুয়াংতোং-এর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি খাং ইয়ৌওয়েই (১৮৫৮—১৯২৯) যিনি তখন রাজকীয় পরীক্ষা দেবার জন্য পেইচিং-এ অপেক্ষা করছিলেন, তিনি সম্রাট কুয়াং স্যু'র নিকট একটি স্মারকপত্র পেশ করলেন। ১৩০০ অন্যান্য পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপিতে তিনি এই সন্ধির বিরোধিতা করলেন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি কর্মসূচী নিবেদন করলেন। তখন থেকে শুরু হল এই "সংস্কার আন্দোলন"।'

চীন-জাপান যুদ্ধ সমাপ্তির পর চীনের সামাজিক এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে শুরু করেছিল। পাশ্চাত্যকরণের পক্ষপাতী

আমলাদের নিয়ন্ত্রিত সরকারী অর্থে প্রতিষ্ঠিত শিল্প বাধ্য হল ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দিতে। প্রায় তিন দশক ধরে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার ও তার আমলারা সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং শিল্পের ওপর একচেটিয়া অধিকার পাবার চেষ্টা করেছিল এবং তারা ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে শিল্পকে অগ্রসর হতে দেয়নি। চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ে প্রমাণিত হল সরকারী-পরিচালিত আধুনিক যুদ্ধোপকরণ তৈরির কারখানা-শিল্প এবং আধুনিক পদাতিক ও নৌ-সেনাবাহিনীর অসারতা। যেহেতু ঐ সন্ধিতে বিদেশীদের চীনে অবাধে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেহেতু ছিং রাজসরকার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার সরকারী স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন এবং তন্তু-শিল্পের অগ্রগতিতে উৎসাহ দেবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিলেন। ১৮৯৮ সালে, যুদ্ধোপকরণ অস্ত্র তৈরি কারখানা খুলবার জন্য ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগেরও উৎসাহ দেয়া হল।

১৮৯৫ সালের পর থেকে জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশলাভ হতে থাকে। শাংহাই, নিংপো, উসি, সুচৌ, হাংচৌ এবং নানথোং ইত্যাদি শহরে নূতন নূতন সুতিবস্ত্রের মিল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৯৭ সালের মধ্যে চিয়াংসু, চেচিয়াং এবং হুপেই প্রদেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত সুতিবস্ত্রের মিল ও সিল্ক-তৈরি কারখানার সংখ্যা ছিল তিরিশ। চীনের শিল্প প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে চিয়াংসু প্রদেশের নানথোং সুতিবস্ত্র মিল প্রতিষ্ঠা একটি বিরাট ঘটনা বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু, সাম্রাজ্য-বাদীদের শিল্পসংস্থার চাপ ও প্রতিযোগিতার দরুন এই সকল জাতীয় শিল্পসংস্থা-গুলির পক্ষে টিকে থাকা সহজ ছিল না। বিদেশী পুঁজিবাদীদের লগ্নীকৃত কার-খানা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রচুর পুঁজি থাকাতে ও অসম সন্ধিসমূহে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধার বলে এই সকল কারখানা চীনের জাতীয় শিল্পের অগ্রগতিকে রোধ করে রেখেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল রাজসরকার বারবার খনি খননের এবং রেলপথ নির্মাণের অধিকার দেবার চুক্তি স্বাক্ষরিত করে চীনের ভারীশিল্পের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিলেন এবং তাতে লঘুশিল্পের অগ্রগতিলাভেরও কোন নিশ্চয়তা রইল না। নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিরা সচেতন হলেন এবং তাঁদের অধি-কার রক্ষার জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন।

একই সময়ে ১৮৯৪—৯৫ এর যুদ্ধে চীনের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং বিদেশী

শক্তিসমূহের দ্বারা চীন খণ্ডবিখণ্ড হবার আশংকায় চীনের কয়েকজন পুঁজিবাদী ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক সংস্কার দাবীর জন্য অনুপ্রাণিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদেশ থেকে শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করলেই চলবে না, আর তাতে চীনের অবস্থারও উন্নতি হবে না। তাঁদের আশা ছিল যে, রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে চীন পুঁজিবাদের পথ নিতে পারবে। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর ইচ্ছার সঙ্গে অভিন্ন ছিল।

১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা: এই সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খাং ইয়ৌওয়েই, লিয়াং ছিছাও (১৮৭৩—১৯২৮), থান সিথোং (১৮৬৬—১৮৯৮) এবং ইয়ান ফু (১৮৫৩—১৯০১)। এঁদের নেতা ছিলেন খাং ইয়ৌওয়েই। ইয়ান ফু পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের তত্ত্বের সঙ্গে চীনবাসীদের পরিচয় ঘটান। খাং, লিয়াং এবং থান চীনের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-সমিতি সংগঠন করে অথবা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁদের সংস্কারের মতবাদ প্রচারিত করেন।

১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে, জার্মানি চিয়াওচৌ উপসাগর অধিকার করলে চীন-সাম্রাজ্য বিখণ্ডিত হবার গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হল। তখন সারাদেশের সংস্কারপন্থীরা দেশের এই গুরুতর সংকটের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষিত করলেন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের মতবাদ প্রচারিত করলেন। ১৮৯৮ সালে, খাং ইয়ৌওয়েই পেইচিং-এ 'পাও কুও হুই' (দেশরক্ষা সমিতি) প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি জাতির অস্তিত্ব লোপের বিপদ সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত করে সরকারকে অবিলম্বে সংস্কারের নীতি গ্রহণ করার দাবী জানান। সম্রাট কুয়াং স্যু খাং ইয়ৌওয়েই-এর মতামত গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে ও তাঁর বহু অনুগামীকে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত করলেন। তাদের সম্রাটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়া হল। ১৮৯৮ সালের ১১ই জুন থেকে ২১ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ১০৩ দিনে বহু রাজকীয় অনুশাসন ঘোষিত হল। যেমন সরকারী পদপ্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণে গতানুগতিক প্রথায় আটটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত প্রবন্ধ রচনার বিলোপ, পাশ্চাত্য ধরণের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সবুজ পতাকা বাহিনীকে ভেঙ্গে দেওয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত রাজকর্ম-চারীদের বরখাস্ত করা, আধুনিক ধরণের ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, খনি উন্নয়ন, রেলপথ নির্মাণ, বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগ গঠন এবং উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্য পুরস্কৃত

করা। আর ছিল সংবাদপত্র প্রকাশ, শিক্ষাসংক্রান্ত সমিতি গঠন, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে চীনের পরিচয় ঘটানোর জন্য অনুবাদ সংস্থা গঠন, জাতীয় বাজেট তৈরী এবং সরকারের অর্থবিবরণ পেশ। এই সকল পদক্ষেপে প্রতিফলিত হল বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবনা আর তা সবে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরচারী প্রথার এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল।

সংস্কারপন্থীরা এই সকল পদক্ষেপ সম্রাটের নামে ঘোষিত করতে সক্ষম হলেন বটে, কিন্তু রাজমাতা ছি সি'র নেতৃত্বে সনাতনপন্থী দল দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের কব্জায় রেখে সব রকম সংস্কারের বিরোধিতা করতে থাকলেন। ঘোষিত নতুন নীতি আর কার্যকরী হতে পারল না। তার ফলে নব্য ও প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠল। এই সকল সংস্কার বন্ধ করার জন্য রাজমাতা ছি সি একটি সামরিক উত্থানের চক্রান্ত করলেন। সংস্কারপন্থীরা সংস্কারগুলি রক্ষা এবং সনাতনপন্থীদের পরাজিত করার জন্য সামন্তসেনাধিপতি ইউয়ান শিখাই-এর সেনাদের সাহায্য কামনা করলেন। কিন্তু, ইউয়ান শিখাই এই সংবাদ সনাতনপন্থীদের নিকট ফাঁস করে দিয়ে সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ছি সি খুব তৎপরতার সঙ্গে এবং কালবিলম্ব না করে সম্রাটকে গ্রেপ্তার করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ২১ শে সেপ্টেম্বর তিনি নিজেকে রীজেন্টরূপে ঘোষণা করে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। সংস্কারপন্থীদের ছয়জন নেতাদের হত্যা করা হল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন থান সিথোং।

সংস্কারপন্থীরা তাঁদের আন্দোলনের সব আশা সম্রাট কুয়াং স্যু-এব ক্ষমতার উপর নির্ভর করেছিলেন। সুতরাং, এই আন্দোলন একটি ক্ষীণ ও দুর্বল সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

১৮৯৮ সালের এই ধরণের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর সংস্কারপন্থীদের মধ্যে কয়েকজন বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি বিপ্লবীদের শিবিরে যোগদান করলেন। খাং ইয়ৌওয়েই এবং লিয়াং ছিছাও-এর নেতৃত্বে কয়েকজন সংস্কারপন্থী নিজেদের মনোভাব আঁকড়ে থাকলেন এবং রাজতন্ত্রবাদী-উদারপন্থীর আবরণে বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলনের ঘোর বিরোধীদল রূপে পরিণত হলেন।

৬. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইহোথুয়ান কৃষক আন্দোলন

বিদেশী পাদ্রী-বিরোধিতায় প্রতিফলিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলন : সম্রাটের ওপর নির্ভরশীল সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর চীনের বিরুদ্ধে বিদেশীদের আক্রমণ আরো তীব্র হতে থাকল। মানুষের জীবনযাপন দিনদিন ক্লেশকর হয়ে উঠল, করের বোঝাও দিনদিন বাড়তে থাকল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এইরূপ পরিস্থিতিতে উত্তর চীনে সৃষ্টি হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইহোথুয়ান (ন্যায়পরায়ণ সমন্বয়পূর্ণ মুষ্টিযোদ্ধা সংগঠন)। এই সংগঠনে কৃষকদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

থাইফিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাবার পর থেকেই চীনের গোড়ার স্তরের লোকেদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের বিরাম ছিল না। এইসব আন্দোলন আগ্রাসনী বিদেশী শক্তি কর্তৃক চীনে প্রেরিত পাদ্রী এবং মিশনারী সঙ্ঘ বিরোধী জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। বন্দুক উঁচিয়ে চীনের কাছ থেকে আদায়কৃত বিশেষ সুবিধার বলে এইসব পাদ্রীরা চীনের অন্তর্বর্তী অঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করেছিলেন এবং তারা গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত থাকতেন ও চীনকে পদানত করার জন্য প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এইসব বিদেশী ধর্মযাজকেরা, বিশেষ করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকেরা বহু গীর্জা নির্মাণ করেছিলেন এবং বিরাট জমিদারির অধিকারী হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অস্ত্রের বলে তাঁরা স্থানীয় রাজকর্মচারীদের ভয় প্রদর্শন করতেন, সরকারী প্রশাসনিক কাজে এবং আইন ও বিচারালয়ের মোকদ্দমাতে হস্তক্ষেপ করতেন, এবং সাধারণ লোকেদের দমন করার জন্য দুর্বৃত্তদের ধর্মান্তরিত করে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করতেন। এর ফলে চীনা জনগণের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল।

ইহোথুয়ান আন্দোলন : বহুদিন থেকে জনগণের মনে পুঞ্জীভূত থাকা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মহান সংগ্রাম ১৮৯৯ সালে শানতোং-এ বিস্ফোরিত হল এবং সত্বর ব্যাপক আকার ধারণ করল। সর্বপ্রথম এই সংগ্রাম শুরু করেছিল ইহোথুয়ান নামে একটি গুপ্ত সমিতি। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই সমিতির মূল ক্রিয়া-কলাপ। এই সমিতির সদস্য মুখ্যত ছিলেন কৃষক, হস্তশিল্পের কারিগর, পরিবহণ কর্মী এবং নিম্নবেতনভুক্ত কর্মীরা। আর ছিলেন অল্প সংখ্যক বাউণ্ডুলে ও

ধর্মযাজকদের দ্বারা নির্যাতিত কিছু ভূস্বামী। কৃষক গরিষ্ঠ এই গণআন্দোলনের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতনের বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, যেহেতু ঐ সময়ে শানতোং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বলি হয়েছিল সেহেতু ইহোথুয়ানের আক্রমণের মুখ্য লক্ষ্য ছিল বিদেশী আগ্রাসনকারীরা এবং চীনবাসীদের নিকট সংস্পর্শে আসা আগ্রাসনী শক্তির প্রতিনিধি বিদেশী পাদ্রীরা। ছিং রাজকর্মচারী কর্তৃক বলপ্রয়োগে এই আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হল না বরঞ্চ তাতে এই আন্দোলন আরও বিস্তারলাভ করল।

ছিং শাসকেরা ইতিমধ্যেই এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তাদের পক্ষে এই আন্দোলনে সংঘটিত ঘটনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা ছিল না। তারা শুধু সশঙ্কিত চিত্তে এই আন্দোলনের বিস্তার দেখতে থাকলেন। তাছাড়া, এই আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল ঠিক রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে। ইহোখুয়ান সমিতি বিদেশী পাদ্রীদের বিরোধিতা করছিল দেখে শাসকেরা স্থির করলেন তার নেতৃত্ব দখল করে আন্দোলনকে নিজেদের কাজে লাগাবেন। তাই ইহোথুয়ানকে বৈধ সংগঠন হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি দেয়া হল এবং এই সংগঠনের ভিতর থেকে নেতৃত্ব দখল করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের অধীনস্থ ব্যক্তি এমনকি কিছু সরকারী কর্মচারীরাও এই আন্দোলনে যোগদান করলেন। আন্দোলনের নেতারা ছিলেন বিভিন্ন ধরণের, যার ফলে ইহোখুয়ানের নতুন শ্লোগান হল "রাজবংশকে সমর্থন কর বিদেশীদের বিনাশ কর।" ইহোখুয়ান বৈধ সংগঠনরূপে ঘোষিত হলে এই আন্দোলন শানতোং থেকে অন্তর্দেশীয় প্রদেশে দ্রুত বিস্তারলাভ করল এবং অবশেষে পেইচিং ও থিয়ানচিনের মত শহরেও এই আন্দোলন শুরু হল। ১৯০০ সালের গ্রীষ্মকালে পেইচিং শহর ইহোখুয়ানের প্রায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে এল এবং সেখানে প্রকাশ্যে বিদেশী গীর্জা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দূতাবাসের ওপর আক্রমণ করা হল।

১৯০০ সালে চীনবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সম্মিলিত শক্তি: চীনা জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সৈন্য পাঠাতে মনস্থ করল। তাকু এবং থিয়ানচিন থেকে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইতালী এবং অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মিলিত সেনাবাহিনী পেইচিং অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। ইহোথুয়ান আদিম ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বত্র বর্বর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করল।

ছিং সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার ও সৈনিকরাও এই সংগ্রামে যোগ দিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা অস্ত্রশক্তিতে প্রাধান্যলাভ করেছিল, তারা পেইচিং যাত্রার সময় নির্বিচারে বেসামরিক লোকেদের হত্যা করতে লাগল এবং গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগ করল। ১৯০০ সালের আগস্ট মাসে তারা বোম্বেটেদের মত পেইচিং শহরে প্রবেশ করল এবং সমগ্র শহর লুণ্ঠন করল। এই আগ্রাসী সেনারা পেইচিং, থিয়ানচিন, পাওতিং ইত্যাদি এলাকায় যেভাবে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা এবং বলাৎকার করল বিশ্বে তার নজির খুব কম।

আট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মিলিত সেনারা পেইচিং-এ প্রবেশ করলে রাজমাতা ছি সি'র নেতৃত্বে ছিং সরকার সিআনে পালিয়ে গেলেন। পেইচিং পরিত্যাগ করার পূর্বে এই সরকার ইহোখুয়ানকে 'দাঙ্গাকারী দল' বলে ঘোষিত করে আগ্রাসী সেনাদের প্রতি "মৈত্রী ভাব" প্রকাশ করলেন এবং তাদের হয়ে 'দাঙ্গাকারীদের' দমন করার জন্য অনুরোধ জানালেন। সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করল যে তারাও দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য চীন-সরকারকে সাহায্য করতে আসছে। এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে ইহোখুয়ানের সদস্যারা স্বদেশের সামন্ততান্ত্রিক শক্তির যোগ-সাজসে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন এবং তাদের আন্দোলন বেদনাজনকভাবে ব্যর্থ হল।

ইহোখুয়ান আন্দোলনের ব্যর্থতাতে প্রমাণিত হল যে, একটি অগ্রণী শ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া কৃষকবিদ্রোহ সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এই আন্দোলনের সময় চীনে একটি স্বতন্ত্র প্রলেতারিয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। সদ্যজাত বুর্জোয়াশ্রেণী দুর্বল ছিল, এমনকি এই শ্রেণীভুক্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরা এই আন্দোলনকে বর্বরসুলভ বলে মনে করেছিলেন। ধূর্ত এবং হিংস্র সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীশক্তির বিরুদ্ধে এককভাবে সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করার শক্তি কৃষকজনতার ছিল না। তা সত্ত্বেও ইহোখুয়ান আন্দোলনে ব্যক্ত হল যে কৃষকজনতার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপুল শক্তি। এ শক্তির কথা বুঝতে পেরে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের প্রতি তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা চীনকে ভাগ করে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধিকারে আনে তা হলে তাদের ইহোখুয়ানের মত অগণিত সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং, তারা চীনের

'স্বাধীনতার' আবরণ ঠিক রেখে পেইচিংকে ছিং শাসকদের প্রত্যর্পণ করে নেপথ্যে চীনের রাজনীতি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৯০১ সালের সন্ধি : যখন উত্তর চীনে ইহোখুয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে চলেছিল, সেই সময়ে দক্ষিণ চীনের প্রদেশগুলির ভাইসরয় এবং গভর্ণরেরা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি 'বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার' আচরণ গ্রহণ করছিলেন। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় মধ্য ও দক্ষিণ-চীনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হলেন। আট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুক্তবাহিনী পেইচিং শহর অধিকার করলে ছিং রাজসরকার দক্ষিণ-চীনের ভাইসরয়দের নেতা লি হোংচাংকে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য নিযুক্ত করল। ১৯০১ সালে তিনি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, বেলজিয়াম, স্পেন এবং নেদারল্যাণ্ড এই এগারটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, এই চুক্তি অনুযায়ী চীনকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩৯ বছরে ৪৫০ মিলিয়ন রৌপ্যমুদ্রা দিতে হল। মূল এবং সুদসমেত এই অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯৮০ মিলিয়নের অধিক ; আরও, চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ক্রিয়াকলাপ দমন করার দায়িত্ব ছিং রাজসরকারকে দেওয়া হল ; পেইচিং এবং খিয়ানচিন ও শানহাইকুয়ানের মধ্যবর্তী সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সৈন্য মোতায়েন করার ব্যবস্থা করা হল এবং চীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তাকু দুর্গকে ভেঙ্গে ফেলে দেবার শর্ত আরোপিত হল।

১৯০১ সালের চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাজমাতা ছি সি সিআন থেকে পেইচিং-এ ফিরে এসে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সেবায় রত থেকে এবং তাদের সাহায্যে রাজ্যশাসন করতে প্রস্তুত হলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ভাবল যে, ছিং রাজসরকার অতীব দুর্নীতিপরায়ণ হলেও অস্ত্রবলের সাহায্যে এই সরকারকে টিকিয়ে রেখে তাদের আজ্ঞাবাহী দাসরূপে পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদীদের এই আশা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিফল করে দিল।

৭. ১৯১১ সালের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লব

সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলাবদ্ধ চীনের জনগণ: বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, ছিং রাজসরকার সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের কর্তৃত্বাধীন ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। চীনের বিভিন্ন স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া এই বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীরা চীনের কয়লা এবং লৌহ খনিজ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে চীনা অর্থনীতির ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করল। যেমন, ব্রিটেন খাইফিং (খাইলান)-এর কয়লাখনি নিজ অধিকারে নিল আর জাপান নিল ফুশুনের কয়লাখনি এবং আনশানের লৌহখনি। ফলে, চীনের পক্ষে ভারী শিল্প বিকাশের উপায় রইল না এবং লঘুশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ সব শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাও সম্ভব হল না।

১৯১১ সালের আগে চীনে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের মূল্য ছিল ১,৫০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। ছিং সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৪০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার বা ১৪০,০০০,০০০ স্টার্লিং। এর মধ্যে রেলপথ নির্মাণ বাবদ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। এই ঋণের মধ্যে অধিকাংশ ঋণের সুদের হার ছিল ৫%। ছিং রাজসরকার শাংহাই বন্দরের পার্শ্বে অবস্থিত বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের পুতুলে পরিণত হল। ১৯১১ সালের রপ্তানির চেয়ে আমদানি ১০০ মিলিয়নের অধিক হাইকুয়ান (শুল্ক- দপ্তরের) রৌপ্যমুদ্রা ছিল। চীনা জনগণকে এই ঋণের বোঝা এবং অন্যান্য ধরণের আরও বোঝার ভার গ্রহণ করতে হল।

আমদানীকৃত তৈরি বস্তুতে চীনের শহর ও গ্রামের বাজারগুলি ছেয়ে গেল। সুতা আমদানি প্রতি বছর অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৮৯১ সালে কেরোসিন তেলের আমদানির পরিমাণ ছিল ৫০ মিলিয়ন গ্যালনের কম, ১৯০৫ সালেই এই আমদানির পরিমাণ দাঁড়াল ১৫০ মিলিয়ন গ্যালন। তামাকের আমদানির মূল্য একমাত্র ১৯০৫ সালেই হল ৬৬০,০০০ স্টার্লিং। তাছাড়া চীনে ইংরেজ এবং মার্কিনী ব্যবসায়ীদের তামাকের কারখানাগুলোতেও বিপুল পরিমাণে সিগারেট উৎপাদিত হত। জাপানের কাঁচা সিল্ক চীনা সিল্ককে বিদেশী বাজার থেকে বিতাড়িত করল। চীনের চা রপ্তানি ১৮৮৬ সালে ২৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড থেকে কমে ১৯০৫ সালে দাঁড়াল ১৮০ মিলিয়ন পাউণ্ডে। এর ফলে

চীনের সিল্ক এবং চা ব্যবসায়ে মন্দাভাব দেখা দিল ও উৎপাদন কম হবার দরুন বিপুল সংখ্যক জনগণের জীবনযাপনের উপায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। ঐ সময়ে চীনের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য বলতে ছিল সোয়াবিন জাতীয় কৃষিজাত দ্রব্য এবং শূকরের লোম। চীনের কৃষিদ্রব্য উৎপাদন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং চীন ইতিহাসে নজিরহীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা চীনের অর্থনীতিক জীবনকে কুক্ষিগত করে চীনের ভূমির উপর বারবার আক্রমণ হানছিল। ফলে চীনা জনগণ ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিরোধ শুরু করল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অনুগত ছিং রাজসরকার চীনা জনগণের দেশহিতৈষী কার্যকলাপকে সর্বশক্তি দিয়ে দমন করতে সচেষ্ট হল। এই সরকার মনে করল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হওয়ার অর্থ হল ছিং রাজবংশের বিরোধিতা। ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে, জারতন্ত্রী রাশিয়া তার আগ্রাসনী সেনাদের প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করলে এবং উত্তরপূর্ব চীনের তিনটি প্রদেশে যুক্তিহীন অধিকতর অধিকার দাবী করলে শাংহাইবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। ঐ একই বছরে কুয়াংসি প্রদেশের গভর্ণর ফরাসী সেনাবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীদের দমন করার চক্রান্ত করলে চীনের বিভিন্ন স্থানের জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ১৯০৫ সালের মে এবং নভেম্বর মাসের মধ্যে শাংহাই এবং অন্যান্য ছয়টি বন্দরের ব্যবসায়ী এবং শিল্প-পতিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যদ্রব্য বর্জন করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এই সব আন্দোলনকে ছিং রাজসরকার নির্মমভাবে দমন করল এবং এই সরকার অনু-প্রবেশকারীদের দ্বারা প্রকাশ্যে চীনা ভূখণ্ডের অখণ্ডতা ঘোরতর লঙ্ঘনের নীরব সমর্থক ছিল। যেমন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন তিব্বত আক্রমণ করে লাসা শহরের ১৫০০ জন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করলে ছিং রাজসরকার তিব্বতকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হল। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পর তিব্বতের স্থানীয় শাসক এবং ইংরেজ সেনাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি অপমানকর গোপন চুক্তিও মেনে নিল। ঐ বছরে, জাপান এবং রাশিয়া যখন উত্তরপূর্ব চীনে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হল, তখন ছিং রাজসরকার লিয়াওহো নদীর পূর্ব ভূখণ্ডকে যুদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করল। এই সব লজ্জাকর আচরণ সারা দেশের জনগণের মনে রোষের ভাব সৃষ্টি করল।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার: বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে থাকল। ১৯০৫ সালে, বহু বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে টোকিও শহরে "চোংকুও কেমিং থোংমেংহুই" (চীনা বিপ্লবী সংঘ) নামে একটি দল গঠন করল। এই দলে ছিল ১৮৯৪ সাল থেকে সুন চোংশান (১৮৬৬—১৯২৫)-এর নেতৃত্বাধীন 'সিং চোং হুই' অর্থাৎ চীন পুনরুদ্ধার সমিতি। তিনি এই সংঘের নেতা নির্বাচিত হলেন। এই বিপ্লবী সংঘের স্লোগান ছিল: "মাঞ্চুদের বিতাড়িত করো", "চীনকে পুনরুজ্জীবিত করো", "একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করো", "জমির মালিকানায় সমতা আনো।" এই বিপ্লবী সংঘের কর্মসূচীতে ঘোষিত হল: "মাঞ্চুদের বিতাড়িত করে চীনকে পুনরুজ্জীবিত করা ছাড়া রাষ্ট্রের গঠন এবং মানুষের জীবিকানির্বাহের উপায়েও পরিবর্তন আনতে হবে। বহু জটিল পরিস্থিতি জড়িত থাকা সত্ত্বেও আমাদের মূল নীতি হবে 'স্বাধীনতা, সমতা এবং সৌভ্রাত্র।' অতীতে সংঘটিত হয়েছিল বীরদের সেবার জন্য বিদ্রোহ, এখন আমরা চাই জনগণের সেবার জন্য বিদ্রোহ।"

ডাঃ সুন চোংশান প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন তিন গণ নীতি—জাতীয়তাবাদ নীতি, প্রজাতন্ত্র নীতি এবং জীবিকানির্বাহ নীতি। জাতীয়তাবাদী নীতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব অস্পষ্ট থাকলেও তিনি ছিং রাজবংশের শাসনের বিরোধিতার কথা বললেন। প্রজাতন্ত্র নীতির ক্ষেত্রে তিনি চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। মানুষের জীবিকানির্বাহের উপায় পরিবর্তনের নীতিতে তিনি পাতি-বুর্জোয়াদের ইউটোপিয়া সমাজবাদের কথা ব্যক্ত করলেন। চীন পুঁজিবাদকে এড়িয়ে যেতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ভূমি অধিকারে সমতা আনার দাবী করলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, এই উপায়ে চীনা কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত করা যাবে এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশ "রোধ" করা যাবে। ডাঃ সুন-এর মানুষের জীবিকানির্বাহের নীতিকে লেনিন "নারোদইজম্"-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, এই কর্মসূচীতে পুঁজিবাদের বিকাশ রোধ করার প্রতিক্রিয়াশীল ও অবাস্তব কল্পনা একটি সর্বব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। লেনিন উল্লেখ করেন যে, ডাঃ সুন চোংশান-এর অর্থনীতিক কর্মসূচী সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করলে তা পুঁজিবাদের দিকে

যাওয়ার পথ পরিষ্কার করবে। (Lenin, Collected Works, Vol. 18,Fourth Russian editon, Moscow, p. 143—49).

এক বছরের মধ্যেই থোংমেংহুইয়ের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ১০,০০০। ছিং রাজসরকার জাপান সরকারের সঙ্গে যোগসাজসে এই সংঘের সদস্যদের নির্যাতন করতে শুরু করল। তা সত্ত্বেও এই দুই সরকারের মিলিত শক্তি বিপ্লবের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হল।

১৯০৫ সালের পর মাঞ্চু-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। চীনের বিভিন্ন স্থানে পরপর কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী হত্যা এবং বিনা প্রস্তুতিতে উত্থান সংঘটিত হল। আরও উল্লেখযোগ্য, বহু সংখ্যায় বুদ্ধিজীবী, কৃষকদের গুপ্ত সমিতি এবং ছিং সেনাবাহিনীর সেনারা ডাঃ সুন চোংশান-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের শুরু : ছিং শাসকেরা তাদের টলটলায়মান শাসন রক্ষা করতে জনগণের প্রতি প্রতারণামূলক কয়েকটি সংস্কারমূলক নীতি ঘোষণা করল। যেমন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংস্কার, আইন ও শাস্তিবিধানের সংস্কার, ইউ-রোপীয় ও মার্কিনী পুঁজিবাদী পন্থার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, অভিন্ন জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থা, জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ এবং রেলপথ নির্মাণে উৎসাহদান। ছিং শাসকেরা সংবিধান প্রস্তুত এবং ইউরোপের ধাঁচে একটি পার্লামেণ্ট গঠন করার আশ্বাস দিল। কিন্তু, এই সব পদক্ষেপ জনগণের দাবী মেটাতে ব্যর্থ হল।

১৯১১ সালের মে মাসে, ছিং রাজসরকার তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ইচ্ছা-নুযায়ী জনগণের বিরোধিতা উপেক্ষা করে সারাদেশের রেলপথ "জাতীয়করণ" করার একটি আদেশ জারী করল। এই আদেশে রেল-কোম্পানির শেয়ারগুলি সরকার কর্তৃক মূল মূল্যের ৪৫—৪৬ শতাংশ নগদ দামে ক্রয় এবং বাকী অংশ বণ্ডের মাধ্যমে দেয় বলে ঘোষিত হল। এই আদেশ জারী হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিচুয়ান, হুনান, কুয়াংতোং এবং হুপেই প্রদেশসমূহে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানান হল। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই "জাতীয়করণের" অর্থ ছিল চীনের রেল-কোম্পানিগুলিকে বিদেশী প্রভুদের হাতে তুলে দেওয়া। সিচুয়ান প্রদেশে ছিং সেনাদের সঙ্গে স্থানীয় প্রতিবাদকারীদের একটি সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হল। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সশস্ত্র কৃষকেরা সিচুয়ান প্রদেশের রাজধানী

ছেংতু শহর ঘেরাও করলেন।

দ্রুতগতিতে ঘটনার পট পরিবর্তন হতে থাকল। ১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর হুপেই প্রদেশের উছাং শহরে একটি সশস্ত্র উত্থান বিস্ফোরিত হল। সেনাবাহিনীর মধ্যে সক্রিয় ওয়েন স্যুয়ে শে (সাহিত্য সমিতি) এবং কোং চিন হুই (সহগামী সংঘ) নামে দুটি বিপ্লবী সংগঠন খুব গোপনতা রক্ষা করে এই উত্থানের প্রস্তুতি করেছিল। ছাত্র এবং মজদুরেরাও এই উত্থানে যোগদান করল। স্থানীয় ভাইসরয় শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। বিপ্লবীরা দ্রুত নিকটবর্তী হানখৌ এবং হানইয়াং শহর দুটি অধিকার করল। তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা থোংমেং-হুই-এর সদস্যরাও উছাং-এর বিপ্লবীদের সমর্থন করে এই উত্থানে যোগ দিলেন। এইভাবে মধ্য-চীনে বিপ্লবী পতাকা উত্তোলিত হল।

উছাং উত্থান সঙ্ঘটিত হলে বিপ্লবীরা তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকের অভাব বোধ করেন। সৈনিক হিসেবে যাঁরা এই উত্থানে যোগদান করেন তাঁরা ছিলেন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ শহর ও গ্রামের মজদুরেরা। তাদের দস্তুরমতো যুদ্ধ করার মতো প্রশিক্ষণ দেবারও সময় ছিল না। তা সত্বেও, চীনে জারতন্ত্রী রাশিয়ার প্রতিনিধির কথায়, এই সব সৈনিকদের শৌর্য তাদের প্রয়োগবিদ্যার অভাব পূরণ করেছিল। শৌর্য এবং সাহসিকতা উছাং উত্থানের সফলতাকে নিশ্চিত করল।

বিপ্লব দ্রুত সাফল্য অর্জনের পথে সঙ্কট : উছাং উত্থানে সাফল্য অর্জন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত প্রভাব বিস্তার লাভ করল। এক মাসের মধ্যে হুনান, চিয়াংসি, সেনসী, শানসী, ইয়ুন্নান, চিয়াংসু, চেচিয়াং, কুইচৌ, কুয়াংসি, কুয়াংতোং, আনহুই, ফুচিয়ান, শানতোং, ফেংথিয়ান এবং সিচুয়ান প্রদেশসমূহে বিপ্লবী সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাঁরা ছিং সরকারকে উদ্দেশ্য করে "স্বাধীনতা" ঘোষণা করলেন। এই সব প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিরা নানচিং শহরে মিলিত হয়ে প্রজাতন্ত্রী চীন-এর প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। ডাঃ সুন চোংশানকে এই অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত করা হল। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারি, পেইচিং-এ অধিষ্ঠিত সরকারের বিরোধীরূপে এই নানচিং সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

জনগণের নিকট ছিং রাজসরকার অপ্রিয় থাকার দরুন উছাং উত্থান দ্রুত সাফল্য লাভ করলে বিপ্লবীদের মধ্যেও কিছু সঙ্কট দেখা দিল। ছিং শাসকদের

পক্ষে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না দেখে বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীরা ছিং শাসকদের পরিবর্তে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অন্য যোগ্য ক্রীড়নকদের সন্ধানে রইল। বহু রাজতন্ত্রবাদী ও উদারবাদী ব্যক্তি এমনকি অনেক ধূর্ত আমলাব্যক্তিও সামন্তসেনাধিপতি দেখলেন যে বিপ্লবে "যোগদান" করলে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি হবে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা আগে বিপ্লব-বিরোধী ছিলেন তাঁরাও বিপ্লব সমর্থনের নামে সত্বর বিপ্লব বন্ধ করে পুরোনো শাসন ও সামাজিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হলেন।

বুর্জোয়া-বিপ্লবী নেতারা চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তি — কৃষকদের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হলেন। বিপ্লবে দ্রুত সাফল্য অর্জনের জন্য তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। এইভাবে, বিপ্লবে সাফল্য অর্জনের মধ্যেই বুর্জোয়া-বিপ্লবীরা তাদের নেতৃত্ব হারালেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা অথবা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে, সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রভাবের চাপে বিপ্লবের যবনিকাপাত হল।

১৯১১ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য: সামন্তসেনাধিপতি ইউয়ান শিখাই, যার হাতে ছিং রাজসরকারের সামরিক ক্ষমতা সত্যিকারে ন্যস্ত ছিল এবং যিনি বরাবর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বশংবদ ছিলেন, তিনি ১৯১১ সালের বিপ্লবের একজন "বীর" হলেন এবং বিপ্লবের সুফল ভোগে নিজেকে অধিষ্ঠিত করলেন। তিনি ছিং রাজসরকারকে তার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন এবং নানচিং সরকারকে সব ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেবার জন্যে ও তাকে প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্টরূপে নির্বাচিত করতে বাধ্য করলেন। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে ইউয়ান শিখাই নিজেকে প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট রূপে ঘোষণা করলেন। প্রকৃতপক্ষে এতে ঘোষিত হল প্রথম বুর্জোয়া-বিপ্লবের পরাজয়।

১৯১১ সালের বুর্জোয়া-বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল সুগভীর। প্রথমতঃ, এই বিপ্লব ছিং রাজসরকারের প্রায় তিনশত বছরের শাসনের অবসান ঘটাল এবং দু'হাজার বৎসরাধিক সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকে অসম্ভব করে তুলল। চীনা জনগণকে আরও উদ্দীপিত করার জন্য তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ১৯১১ সালের বিপ্লবোত্তর বিশৃংখলা দেখে খুবই মর্মাহত হয়েছিল। ইউয়ান শিখাই ক্ষমতা গ্রহণ করলে তবেই তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ১৯১১ সালের বিপ্লবে চীনের বুর্জোয়াদের দুর্বল এবং আপোষমূলক চরিত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল।

৮. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে চীনের অবস্থা

সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তসেনাধিপতিদের যুগপৎ অত্যাচারে জর্জরিত চীন: চীনের আধুনিক ইতিহাসে, ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সময়পর্বকে একটি তমসাচ্ছন্ন নৈরাজ্যের কাল বলা চলে। ইউয়ান শিখাই-এর স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বাধীনে চীন আগের মতোই বৃহৎ ভূস্বামী এবং মুৎসুদ্দীদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। ইউয়ান শিখাই প্রকাশ্যে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনলাভ করে নিজেই "সম্রাট" হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করার বাসনা প্রকাশ করে। কিন্তু, তার এই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হল। ১৯১৬ সালে তার হঠাৎ মৃত্যু হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা তার উত্তরাধিকারী — পেইইয়াং নামে অভিহিত একটি সামরিক নেতাদের গোষ্ঠীর হাতে পড়ল। বিভিন্ন চক্রে বিভক্ত এই গোষ্ঠীর সামন্তসেনাধিপতিদের কোন একটি চক্র পেইচিং-এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজেদের অধিকারে আনতে পারলে তখনই তারা একটি তথাকথিত "কেন্দ্রীয় সরকার" প্রতিষ্ঠিত করত। এই "কেন্দ্রীয় সরকার" সামন্তসেনাধিপতি, আমলা এবং বিভিন্ন নির্লজ্জ রাজনীতিবিদদের শিকারে পরিণত হত। বিভিন্ন প্রদেশের সামন্তসেনাধিপতিরা বিরাট সামরিক ব্যবস্থা রক্ষা করতেন এবং নিজ নিজ অধিকারভুক্ত এলাকায় নিজেদের "সার্বভৌম" মনে করে পরস্পর-বিধ্বংসী যুদ্ধে লিপ্ত হতেন।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পেইচিং-এ অবস্থিত তথাকথিত "কেন্দ্রীয় সরকার" এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তসেনাধিপতিদের "স্থানীয় সরকার"কে ইচ্ছামত কাজে লাগিয়ে অবাধে চীনা জনগণকে শোষণ করে চলে এবং চীনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা

চীনে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ শিথিল করতে বাধ্য হল, কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হল। রাশিয়াতে অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পেইচিং-এর সামন্তসেনাধিপতিদের সরকার জাপানীদের অনুসরণ করে রুশবিপ্লবের বিরুদ্ধে অনধিকার চর্চায় প্রবৃত্ত হয়।

১৯১১ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা তাঁরা কল্পনা করেছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হয়নি। তবে, বুর্জোয়াশ্রেণীর এক বিরাট অংশ নিজেদের সুবিধা আদায় করার জন্য সামন্তসেনাধিপতিদের অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ডাঃ সুন চোংশান-এর নেতৃত্বাধীন আরেক অংশ বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তসেনাধিপতিদের সঙ্গে আপোষ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না কোন পথে বিপ্লবকে চালিত করবেন এবং কোথায় তাঁরা পাবেন চীনকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয় শক্তি।

শ্রমিক, কৃষক এবং শহর ও নগরের পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণীর লোকেরা সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্তবাদী শোষণের দ্বারা আগের মতোই নিষ্পেষিত হতে থাকেন। বুদ্ধিজীবীরা কাতর হয়ে অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার জন্য পথের সন্ধান করতে থাকেন। বিগত অশীতি বৎসর ধরে চীনের দুরবস্থা, ১৯১১ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতা, সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধ এবং সর্বোপরি অক্টোবরের রুশবিপ্লবের সাফল্য সব কিছুই চীনা বুদ্ধিজীবী ও নির্যাতিত জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনা পুঁজিবাদের অগ্রগতি: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনা পুঁজিবাদের আরও অগ্রগতিলাভ করার ফলে চীনা সমাজেও নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে থাকে।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনা পুঁজিবাদীরা তাঁদের অগ্রগতির একটি সুযোগ পেলেন। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মালিকানাধীন শিল্পগুলি, বিশেষ করে তুলোর সুতো তৈরির মিল লক্ষণীয়ভাবে বিকাশ লাভ করে। ১৯১৩ সালে তুলোর সুতো তৈরি মিলের টাকুর সংখ্যা ছিল ৬৫১,৬৭৬। ১৯১৯ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১,১৭৩,০২১ টাকু। ঐ একই সময়ে চীনদেশে জাপানীদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগগুলিও অগ্রগতি লাভ করে এবং চীনের জাতীয় পুঁজিবাদী-

দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আবার তাদের আগ্রাসনী ক্রিয়াকলাপের পুরনো স্থান চীনে হাজির হল। চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের পুঁজির পক্ষে এই চাপ বহন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ল। এইরূপ পরিস্থিতি উদ্ভবের ফলে জাতীয় বুর্জোয়ারা সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হলেন।

সবচেয়ে নতুন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা হল জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ এবং বিদেশী-মালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগগুলির অগ্রগতিতে চীনদেশে শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯১৪ সালের শ্রমিকদের সংখ্যা দশ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৯ সালে হয়েছিল তিরিশ লক্ষ। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না হলেও ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের পূর্বমুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা কয়েকটি ধর্মঘট সংঘটিত করলেও এই সব ধর্মঘটের কোন রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের সংগঠন গঠন করলেও তাদের নিজস্ব কোন দল অথবা কেন্দ্রীভূত শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব ছিল না। সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ এই ত্রিবিধ নিষ্পেষণের অধীনে চীনে শ্রমিকশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতি গভীর ঘৃণার ভাব নিয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ কিনা নেতৃত্ব পেলে এবং রাজনৈতিক চেতনা উন্নত হলে চীনা শ্রমিকশ্রেণী দ্রুত একটি শক্তিতে পরিণত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত।

১৯১১ সালের বিপ্লবের পরবর্তী তমসাচ্ছন্ন কয়েকটি বছরে এই নতুন পরিস্থিতি উদ্ভবের ফলে চীনের তথা বিশ্ব ইতিহাসের অগ্রগতিতে একটি নতুন যুগের ঊষা উদিত হল।

৯. নব্য এবং প্রাচীন বিদ্যা

আফিম যুদ্ধের আগে, চীনের সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর ছিল নিজস্ব এক সংস্কৃতি যা প্রাচীন বিদ্যা নামে অভিহিত হত। আফিম যুদ্ধের পর, বিদেশ থেকে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি চীনদেশে আমদানি করা হল তা নব্যবিদ্যা নামে পরিচিত হল। প্রাচীন বিদ্যার সমর্থকরা নব্যবিদ্যার প্রতি প্রতিকল মনোভাব

পোষণ করতেন এবং এই বিদ্যার বিস্তার ও অগ্রগতির পথে গুরুতরভাবে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন।

নব্যবিদ্যা পাশ্চাত্য দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর সমাজতত্ত্ব এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান গ্রহণ করেছিল। হোং সিউছ্যুয়ান, খাং ইয়ৌওয়েই, ইয়ান ফু এবং সুন চোংশানের মতন নব্যবিদ্যার প্রতিনিধিমূলক প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এই সব সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁরা চীনের সঙ্কট মোচনের জন্য তার প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রধান গ্রন্থগুলি ছিল হোং সিউছ্যুয়ান প্রণীত "স্বর্গরাজবংশের ভূমি ব্যবস্থা" এবং হোং রেনকান লিখিত "সরকার সম্পর্কে নবপুস্তক"; খাং ইয়ৌওয়েই রচিত "রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে দশ সহস্র কথা" ও "তাখোং শু" (মহান ঐক্যবদ্ধ গ্রন্থ), ইয়ান ফু কর্তৃক অনূদিত আদম স্মিথের "The Wealth of Nations", মণ্টেসকুই-এর "L'Esprit des Lois", টমাস হাক্সলের "Evolution and Ethics", হার্বার্ট স্পেন্সার-এর "The Study of Sociology" ও জন স্টুয়ার্ট মিলের "System of Logic;" ডাঃ সুন চোংশানের "তিন গণনীতি" এবং খান সিথোং ও লিয়াং ছিছাও-এর রচনাবলী। এই সব গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র হোং সিউছ্যুয়ান এবং ডাঃ সুন চোংশান তাঁদের রচনায় বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যক্ত করেছিলেন। আর, অন্যান্য সকলে ব্যক্ত করেছিলেন সংস্কারবাদী তত্ত্ব। প্রাচীন বিদ্যাপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানতঃ যাঁদের উদ্দেশ্যে এই সব রচনা লিখিত হয়েছিল সেই সব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই রচনাগুলির ব্যাপক প্রচলন হয়। সংস্কারবাদী লেখকেরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রচার করেন এবং বুদ্ধিজীবীদের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আর এই সংগ্রামে তাঁরা কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেন।

চীনদেশবাসী ইতিমধ্যেই কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল এবং বিশেষ করে ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর নিজেদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। এই বিপ্লবের শিক্ষা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে আধা উপনিবেশে পরিণত চীনের বিপ্লবে বিজয় অর্জন করা বুর্জোয়াশ্রেণী ও পাতিবুর্জোয়া-শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়, এবং এই সংগ্রামে বুর্জোয়া সংস্কৃতিও কোন সাহায্যে আসবে না। এ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যাতে প্রমাণিত হয়েছিল যে চীনের গণবিপ্লবকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং গ্রহণ

করতে হবে সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি।

এই সমগ্র সময়পর্বে সমাজ-বিজ্ঞানের চেয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়নই ছিল প্রিয়, কারণ সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের এক অংশ তার প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। শাংহাই-এর চিয়াংনান অস্ত্রতৈরি কারখানার অন্তর্গত একটি অনুবাদ বিভাগ গণিতশাস্ত্র, বলবিদ্যা, বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শব্দশক্তি, আলোক, বাষ্পশক্তি, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং মানচিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে বহু বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করে। "পাশ্চাত্য দেশের পুস্তক বিবরণী" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিয়াং ছিছাও লিখেছেন :

> "চীন দেশকে যদি শক্তিশালী হতে হয়, তা হলে সর্বাগ্রে যথাসম্ভব পাশ্চাত্য পুস্তক অনুবাদ করতে হবে। যদি কোন বিদ্যার্থী উৎকর্ষ লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে যথাসম্ভব পাশ্চাত্য পুস্তক পাঠ করতে হবে।"

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ঐ যুগের বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রতি কত গুরুত্ব দিতেন। ছিং রাজবংশের শাসনের শেষার্ধে বিভিন্ন শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে অবশ্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা স্বদেশের বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে দেশকে শক্তিশালী করার এই অমূলক আশা নিয়ে অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য অধ্যয়ন করতে বিদেশ যান। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশযাত্রীদের সংখ্যা ছিল বিস্ময়কর। তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের নির্বাচিত বিষয়ে সম্মান লাভ করেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরে এসে তাঁদের জ্ঞান প্রয়োগ করার মতো সুযোগ সামান্যই ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন, কয়েকজন এমন পেশা গ্রহণ করেন যার সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও চীনে প্রকৃতি-বিজ্ঞান দুর্বল এবং অনুন্নত থেকে যায়।

সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের নীতি ছিল : "চীনা বিদ্যাকে মূলরূপে গ্রহণ করে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে বাস্তব কাজে প্রয়োগ।" "চীনা বিদ্যাকে মূলরূপে গ্রহণের" অর্থ ছিল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রাচীন বিদ্যাকে অক্ষুণ্ন রেখে বুর্জোয়া সংস্কৃতির নব্যবিদ্যা পরিহার করা। "পাশ্চাত্য বিদ্যার বাস্তব প্রয়োগ" বলতে তাঁরা বুঝাতেন প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রয়োগ করে সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে টিকিয়ে রাখা।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসকেরা নব্যবিদ্যার বিস্তারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের আগে পাতি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা উত্থাপিত "গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান" স্লোগানে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদীর চাপের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ ও প্রতিরোধ ব্যক্ত হয়েছিল।

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সাহিত্য ও কলা নব্যবিদ্যার এক অংশ ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে লিখিত পুস্তক অপরিণত ছিল এবং সমাজতত্ত্ব ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চেয়ে তা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তুলনামূলকভাবে সাহিত্য বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। লিন শু একশটিরও অধিক বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যেসব বুদ্ধিজীবী তখন নব্যবিদ্যার প্রচার করেছিলেন তাঁরা আন্তরিকভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে কাজে লাগে এমন কিছু জিনিস শিখতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁদের সামাজিক তত্ত্বে চৈনিক সামন্ততন্ত্রের বিষের কিছু অস্তিত্ব ছিল, এমনকি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি দাসত্বের মনোভাব বিদ্যমান ছিল, তবে তাঁরা চীনকে ত্রাণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতে গিয়েও তাঁরা চীনকে শক্তিশালী এবং স্বাধীন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভক্ত হু শি'র নেতৃত্বে দাসত্ব মনোভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীর কোন মিল ছিল না। সুতরাং, চীনা জনগণের বিপ্লব নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ার পর নব্যবিদ্যা-পন্থীদের মধ্যে প্রগতিশীল ব্যক্তিরা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করলেন যে বুর্জোয়াদের সেবাতে কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির পূজাতেও কোন ফললাভ হবে না। যখন তাঁরা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য ও সাফল্য দেখতে পেলেন তখন তাঁরা একের পর এক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিপুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন। বিপ্লবের ঝড়ঝাপটার বছরগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক এবং "বৈদেশিক দাসত্বপূর্ণ" সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লুস্যুনের নেতৃত্বে একটি নিরন্তর সংগ্রাম চালিত হল এবং এই সংগ্রাম সর্বত্র বিজয় অর্জন করল।

সমসাময়িক যুগ

(নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়)

১. নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু
৪ঠা মে আন্দোলন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ

(১৯১৯ সালের মে থেকে ১৯২৭ সালের জুলাই)

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ৪ঠা মে আন্দোলন: ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হল। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বিজেতা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের দ্বারা প্যারি শহরে ভার্সাইলের "শান্তি সম্মেলন" আহূত হয়। লুণ্ঠনজীবী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের এই সম্মেলন আহ্বান করার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বণ্টন করা, বিজিত দেশগুলির অঙ্গচ্ছেদ করা এবং তাদের উপনিবেশগুলিকে নূতন করে বিভাজন করা। ভার্সাইলের শান্তি চুক্তিতে নির্ধারিত হল যে, বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে চীনের শানতোং প্রদেশে জার্মানির অধিকৃত সব "বিশেষ" অধিকার সমেত ছিংতাও-এর ওপর দখল এবং চিয়াও-চৌ-চিনান রেলপথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সব খনির ওপর নিয়ন্ত্রণাধিকার জাপানের অধিকারে বর্তাবে। এতে চীনা জনগণের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হল। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে, পেইচিং শহরের ছাত্রছাত্রীরা থিয়ানআনমেনে একটি জনসভা করলেন। তাদের স্লোগান হল: "দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করো, বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দাও।" তাঁরা জাপান কর্তৃক চীনের ভূখণ্ড দখলের বিরুদ্ধে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন এবং পেইচিং-এর

সামন্তসেনাধিপতি সরকারের জাপ-তোষামোদকারী যোগাযোগ-মন্ত্রী ছাও রুলিন, জাপানস্থ চীনা দূত চাং জোংসিয়াং এবং মুদ্রা চালু ব্যুরোর ডিরেক্টর-জেনাবেল লু জোংইয়ু এই তিনজন বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেবার জন্য দাবী জানালেন। থিয়ানআনমেন-এর সভাস্থল থেকে ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে ছাও রুলিন-এর বাসভবনে গিয়ে সেখানে অগ্নিসংযোগ করলেন। ছাও-এর বাসভবনে লুক্কায়িত চাং জোংসিয়াং-এর খোঁজ পেয়ে তাঁরা তাকে ভীষণ প্রহার করলেন। পেইচিং শহরের ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম দেশের অন্যান্য স্থানের লোকেদের সমর্থন লাভ করল। সর্বপ্রথম বিভিন্ন স্থানের ছাত্ররা বিদ্যালয়ে ধর্মঘট সংগঠিত করে তাতে সাড়া দিল। ৩রা জুন, শাংহাই শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর যোগদানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হল। এই জনসভায় ছাত্রদের সমর্থনে সারাদেশে ধর্মঘট করার জন্য আহ্বান জানান হল। ৫ই জুন, শাংহাই, থাংশান এবং ছাংসিনতিয়ান-এর ৭০ হাজার শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধর্মঘটে যোগ দিলেন। সচেতনালব্ধ স্বাধীন শ্রেণীশক্তি হিসেবে চীনা শ্রমিকশ্রেণীর চীনা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করার এই ছিল সর্বপ্রথম ঘটনা। বিভিন্ন স্থানের বণিকশ্রেণী এবং ছাত্ররাও ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ৪ঠা মে আন্দোলন নামে খ্যাত এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে শ্রমিক, ছাত্র এবং বণিকদের সম্মিলিত গণ-চরিত্রযুক্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হল এবং সামন্তসেনাধিপতি সরকারের প্রতি প্রভূত চাপের সৃষ্টি করল। এই চাপের মুখে পড়ে, জুন মাসের ২৮ তারিখে প্রতিক্রিয়াশীল পেইচিং সরকার 'ভার্সাইল-চুক্তি' স্বাক্ষরিত করতে অস্বীকার করল। চীনবাসীদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অটল সংগ্রাম সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই জনপ্রিয় নতুন ধরণের বিপ্লবী আন্দোলনে মহান চীনা জনগণের নতুন জাতীয় জাগরণের চেতনা প্রদর্শিত হল। এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদবিরোধী মনোভাব চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করল।

চীনের ওপর অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লবের প্রভাব: সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশভক্ত আন্দোলনের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চীনা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অধিক প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের

প্রসার এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনা জাতীয় শিল্পের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে এবং চীনা সমাজে শ্রমিক ও বুর্জোয়া — এই দুটি নতুন শ্রেণীর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং মুক্তি সম্বন্ধে নানা ধরণের চিন্তার ঢেউ চীনে দেখা দিল । রাশিয়ার অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রধানতঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার সঙ্গে পরবর্তীকালের ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সর্বহারাদের বিপ্লব এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গভীরভাবে চীনের ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছিল। রুশ বিপ্লবের সাফল্য চীনা বিপ্লবের প্রতি একটি আদর্শ স্থাপন করল এবং চীনকে মুক্তির পথ দেখাল। চীনের সঙ্গে জার রাশিয়ার সব অসম চুক্তি সোভিয়েত সরকার বাতিল করলেন। তাতে চীনবাসীরা অনুপ্রাণিত হলেন এবং তাঁরা গভীরভাবে সমাজবাদী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানালেন। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার ঢেউ চীনে এলো। চীনের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকজন ব্যক্তি যেমন লি তাচাও (চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে সামন্তসেনাধিপতি চাং জুওলিন-এর হাতে নিহত হন), ছেন তুসিউ (চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা, তিনি পরে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন), মাও জেতোং এবং চৌ এনলাই ইত্যাদি অক্টোবর বিপ্লবে বিজয় অর্জনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁরা কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করেন এবং চীনের সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট মতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী রূপে পরিণত হন। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে চীনের নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুখ্যতঃ সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা প্রচারের আন্দোলন রূপে পরিণত হল।

নূতন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ৪ঠা মের দেশভক্ত আন্দোলনকে বেগময়ী করে তুলল এবং অনুরূপভাবে এই আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও উদ্দীপিত করল। নতুন চিন্তাধারা প্রচার এবং প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বহু সাময়িক পত্রিকা, পুস্তক এবং সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। কমিউনিজম সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বামপন্থীরূপে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশভক্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন; বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কারমূলক চিন্তার সমালোচনার

সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচারের ফলে মার্কসবাদ চিন্তাধারা চীনে দ্রুত প্রসারিত হল ও বহু চীনা যুবকদের তা প্রভাবিত করল। এইরূপে ৪ঠা মে আন্দোলন চিন্তার ক্ষেত্রে এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পথ প্রশস্ত করল।

অক্টোবর বিপ্লব এবং ৪ঠা মে আন্দোলন চীনের ইতিহাসের গতিতে আমূল পরিবর্তন আনল। চীনা বিপ্লব বিশ্বের সর্বহারাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অঙ্গে পরিণত হল। চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবে পরিণত হল এবং চীন পুরানো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ পেরিয়ে ৪ঠা মে আন্দোলনে সূচিত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে উপনীত হল।

মাও জেডোং বলেছেন, "৪ঠা মে আন্দোলন তৎকালীন বিশ্ববিপ্লব, রুশবিপ্লব এবং লেনিনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল।" (Mao Zedong, "On New Democracy", Selected Works, Foreign Languages press, Beijing, 1975, Vol. II p. 373) প্রাচ্যের জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে লেনিন বহুবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন তাঁর দাখিল করা "জাতি এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচীতে" জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে কমিউনিস্টদের গ্রহণযোগ্য কতকগুলি মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করেছিলেন। লেনিনের এই নির্দেশগুলি চীনের বিপ্লবের পথকে দ্যুতিময় করেছিল এবং তার অগ্রগতির জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতি : ৪ঠা মে আন্দোলনের পর, চীনের শ্রমিক আন্দোলন উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করে। কমিউনিজম চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে কোন কোন বুদ্ধিজীবী ছাংসিনতিয়ান, শাংহাই, হুনান এবং অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের শ্রমিক সংঘ (ট্রেড ইউনিয়ন), ক্লাব এবং নৈশ ক্লাস গঠন করতে সাহায্য করেন। তাঁরা পেইচিং, শাংহাই এবং কুয়াংচৌতে কথ্য ভাষা প্রয়োগ করে শ্রমিকদের কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করার জন্য সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। এইরূপে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ক্রমশঃ চীনের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে থাকে।

১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে শাংহাই শহরে সর্বপ্রথম একটি মার্কসবাদী গোষ্ঠী গঠিত হয়। ঐ বছরের আগস্ট মাসে চীনা সমাজবাদী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় একই সময়ে পেইচিং, হানখৌ, ছাংশা, কুয়াংচৌ এবং চিনান ইত্যাদি স্থানে এবং প্যারি শহর ও টোকিওতে অধ্যয়নরত চীনা ছাত্রদের মধ্যে মার্কসবাদী গোষ্ঠী এবং সমাজবাদী যুব লীগ গঠিত হয়।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে, চীনের শ্রমশিল্পের কেন্দ্রস্থল শাংহাই শহরে একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর পঞ্চাশজন সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে মাও জেতোং, তোং পি-উ, ছেন থানছিউ, হো শুহেং, ওয়াং চিনমেই, তেং এনমিং, লিতা প্রমুখ ১৩জন এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির ধরণ অনুযায়ী চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একটি গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় ও একটি কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত হয়। এইভাবে জন্ম হল চীনা শ্রমিকদের একটি মার্কসবাদী বিপ্লবী পার্টি। চীনের আধুনিক ইতিহাসে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ ঘটনা। এই পার্টি ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে বিপ্লবের সংগঠক ও নেতৃত্বরূপে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। এই পার্টি চীনা বিপ্লবের চরিত্রে প্রভূত পরিবর্তন এনে ধাপে ধাপে বিজয় অর্জনের জন্য নেতৃত্ব দেয়। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দুজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে, এর সর্বপ্রধান কাজ হবে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন করা যাতে প্রথমতঃ এই শ্রেণীশক্তি নিয়োজিত করে কমিউনিজম এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সারাদেশে প্রকাশ্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি চীনা ট্রেড ইউনিয়ন সচিবালয় গঠন করে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের এই ত্রিবিধ শোষণের ফলে চীনা শ্রমজীবীশ্রেণীর দুর্দশার শেষ ছিল না এবং তাদের সব অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের ছিল বিপ্লব সাধনের এক কঠিন ও দৃঢ় চিত্ত এবং দ্রুত মুক্তি লাভের প্রয়োজন। তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি — চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী নেতৃত্বাধীনে শ্রমজীবীদের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হল। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে

চীনা শ্রমজীবীশ্রেণী সর্বপ্রথম শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ তুললেন। এই তের মাসে, কয়েক শত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সমাজতন্ত্রবাদী যুব লীগের (১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে নামকরণ হয় চীনা কমিউনিস্ট যুব লীগ) সদস্য একশটির অধিক ধর্মঘট সংগঠিত করেন ও তাতে নেতৃত্ব দেন। চীনের বড় বড় শহর, শিল্প ও খনি অঞ্চলে এবং রেলপথে ও জাহাজ-চলাচলের ৩০০,০০০এর অধিক শ্রমিক এই সকল ধর্মঘটে লিপ্ত ছিলেন।

১৯২২ সালে জানুয়ারি মাসে হংকং-এ অনুষ্ঠিত নাবিক ধর্মঘট দিয়ে এই সকল ধর্মঘটের ঢেউ শুরু হয়। তারা মজুরি বৃদ্ধি দাবী করে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে হংকং-এর যাবতীয় শ্রমিকেরা নাবিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে ধর্মঘট শুরু করল। দেশের বিভিন্ন স্থানের শ্রমিকেরাও উদ্দীপনার সঙ্গে হংকং-এর ধর্মঘটীদের সমর্থন জানাল। নাবিকদের বিজয় অর্জনে মার্চ মাসের প্রথম দিকে এই ধর্মঘটের সমাপ্তি হল। এই ধর্মঘট সফল হওয়ার ফলে সারাদেশের শ্রমিকদের সংগ্রামী ইচ্ছা আরও প্রবল হল। ঐ বছরের মে মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কুয়াংচৌতে প্রথম জাতীয় শ্রমিক সম্মেলন আহূত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনকে একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অধীনে আনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সম্মেলন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংগ্রামের সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সর্বজন স্বীকৃত একটি সংগ্রামী প্রোগ্রাম কমিউ-নিস্ট পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল। এই ধরণের একটি প্রোগ্রাম প্রণয়নের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২২ সালের জুলাই মাসে শাংহাই শহরে তার দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করল। ১২৩ জন সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে যে বারো জন প্রতিনিধি (ডেলিগেট) এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ছেন তুসিউ, তেং চোংসিয়া, ছাই হোসেন এবং সিয়াং চিনইয়ু ইত্যাদি। এই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে চীনা বিপ্লবের মূল প্রোগ্রাম বিবৃত হল। এই ঘোষণাপত্রে ঘোষিত হয় যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত প্রোগ্রাম হল চীনে সাম্যবাদ বাস্তবে পরিণত করা। এই ঘোষণাপত্রে পুংখানুপুংখভাবে একটি ন্যূনতম প্রোগ্রাম — চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের মূল প্রোগ্রাম — প্রণয়ন করে বলা হয় :

"চীনা জনগণকে (তা বুর্জোয়া, শ্রমিক অথবা কৃষক যে শ্রেণীভুক্ত হোক

না কেন) নিদারুণ দুঃখকষ্টে ফেলেছে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ত-সেনাধিপতি ও আমলাদের সামন্ততান্ত্রিক শক্তি। সুতরাং এই দু'টি শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।"

এই ঘোষণাপত্রে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট গড়বার জন্য আহ্বান জানিয়ে তার রূপায়ণে একটি বাস্তব প্রোগ্রাম উত্থাপিত হয়। এই প্রোগ্রামে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে চীনা জনগণের সম্মুখে উপস্থিত মূল কর্তব্য হল : "অন্তর্কলহ বর্জন, সামন্ত-সেনাধিপতিদের উৎখাত ও দেশে শান্তি স্থাপন করা; আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদীদের শোষণ উৎখাত করে চীনা জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা; তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ সহ দেশে ঐক্যসাধন করে চীনকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা।" চীনের ইতিহাসে এই সম্মেলনেই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামী আহ্বান জানান হয়। এর পর থেকে চীনা জনগণের তীব্র বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু হল। এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালে যোগ দেবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এই সম্মেলন ধর্মঘট আন্দোলনকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করল। সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই শাংহাই, উহান, হুনান এবং কুয়াংতোং-এ পরপর ধর্মঘট সংঘটিত হল এবং রেল, খনি ও জাহাজ শ্রমিকদের মধ্যে নতুন করে ধর্মঘটের ঢেউ উঠল। এই ধর্মঘটগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকারে বৃহৎ ছিল চিয়াংসি প্রদেশের ফিংসিয়াং-এর আনইউয়ান কয়লাখনির ধর্মঘট এবং চুচৌ-ফিংসিয়াং রেলপথের শ্রমিকদের ধর্মঘট। এই দুটি ধর্মঘট ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং এতে বিশ হাজার শ্রমিক যোগদান করেছিলেন। এর পরই অক্টোবর মাসে খাইলুয়ানের কয়লাখনির চল্লিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করল। এ সব ধর্মঘটের অধিকাংশই সাফল্য অর্জন করেছিল।

যখন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং সামন্তসেনাধিপতিরা দেখল যে ধর্মঘট আন্দোলন সারাদেশে বিস্তার লাভ করছে, তখন তারা মিলিত হয়ে একযোগে অস্ত্র হাতে ধর্মঘট দমন করতে সচেষ্ট হল। ১৯২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি পেইচিং-হানখৌ রেলপথের বহু শ্রমিককে নৃশংসভাবে তারা হত্যা করল।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দাবীর সংগ্রাম থেকে পেইচিং-হানখৌ রেল-পথের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি, বিভিন্ন স্টেশনের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা পেইচিং-হানখৌ রেলপথ সাধারণ

ট্রেড ইউনিয়ন উদ্বোধনের জন্য চেংচৌতে একটি সভায় মিলিত হলে সামন্তসেনা-ধিপতি উ ফেইফু সভাস্থলে একদল সেনা এবং সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে ঐ সভা ছত্রভঙ্গ করে দিল। তিন দিন পর, অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে রেলপথের সমগ্র কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করল। তাদের স্লোগান ছিল: "স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করো।" "মানব অধিকারের জন্য সংগ্রাম করো।" ৭ই ফেব্রুয়ারি, সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সামরিক কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের দমন করার জন্য আদেশ দিল। হানখৌ-এর চিয়াংআনে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হলেন। ঐ একই দিনে ছাংসিনতিয়ান এবং চেংচৌতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। চীনের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ সব ঘটনা "৭ই ফেব্রুয়ারির গণহত্যা" নামে অভিহিত হয়। ঐ দিনে প্রায় চল্লিশ জন শ্রমিক নিহত হন, তিনশত জন আহত হন এবং চল্লিশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রেলপথের পাশে পাশে অবস্থিত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের দফতরগুলিতে ভাঙচূর করা হল অথবা তা সব বন্ধ করে দেয়া হল। যাঁরা শহীদ হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লিন সিয়াংছিয়ান এবং শি ইয়াং। তাঁরা উভয়ই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

ঐ যুগে পেইচিং-হানখৌ রেল ধর্মঘট ছিল সর্ববৃহৎ এবং সর্বশেষ ধর্মঘট। এই ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর সারা চীনের শ্রমিক আন্দোলনের স্রোতে ভাঁটা পড়ল।

চীনা শ্রমিক আন্দোলনের এই প্রথম প্লাবনে এবং "৭ই ফেব্রুয়ারি" শ্রমিক ধর্মঘটে প্রদর্শিত হল শ্রমিকশ্রেণীর মহান শক্তি। "৭ই ফেব্রুয়ারি" আন্দোলনের ফলে সারা দেশবাসীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মর্যাদা প্রভূত বৃদ্ধি পেল। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের শ্রমিকশ্রেণীও চীনা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হল।

"৭ই ফেব্রুয়ারির" ঘটনাতে চীনা শ্রমিকশ্রেণী এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তা হল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কেবলমাত্র নিজশ্রেণীর উপর নির্ভর করে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়, তাকে অবশ্যই সব সম্ভাব্য বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করে উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হবে এবং বিপ্লবী জনগণ অস্ত্রে সজ্জিত হলে তবেই সব প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা সম্ভব।

"৭ই ফেব্রুয়ারি" আন্দোলনের পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রধান কর্তব্যরূপে বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্ট গঠনের কাজে ব্রতী হল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের নিয়ন্ত্রণাধীন সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব: ঐ সময়ে চীনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের নিয়ন্ত্রিত পরস্পরবিরোধী সামন্তসেনাধিপতিদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নিজেদের বিশেষ সুবিধার প্রয়োজন অনুযায়ী একটি চক্রকে অন্য আর একটি চক্রের বিরুদ্ধে সমর্থন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কর্তৃক চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য বিবাদ তীব্রতর হল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধরত দেশগুলিকে সমরাস্ত্র বিক্রয় করে এবং টাকা ধার দিয়ে বিপুল লাভ করার দরুন সবচেয়ে বৃহৎ পুঁজি রপ্তানিকারী রূপে পরিণত হয়েছিল। তাই লাভের নতুন উৎসের সন্ধানে প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করা এর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদী অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় চীনে সবচেয়ে বেশি সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। ভার্সাইলের শান্তিচুক্তিতে জাপানের যে বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তার ফলে জাপান কর্তৃক চীনের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ত্বরান্বিত করা সম্ভব হল। চীনকে নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন করার জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে চীনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছিল প্রাধান্যপূর্ণ শক্তি। কিন্তু ১৯১৮ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান চীনে যে প্রভাব বিস্তার করছিল তাব তুলনায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনের উপর একচেটিয়া অধিকার বিস্তার ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। সুতরাং, তারা জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করল।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটন শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজিত এবং ব্রিটেন কর্তৃক সমর্থিত "প্রশান্ত মহাসাগর সম্মেলনের" উদ্বোধন হল। এই সম্মেলনে এই দুটি রাষ্ট্র জাপানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করল এবং তার ফলে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, গ্রেট ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, নেদারল্যাণ্ড এবং পর্তুগাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হল "নয় রাষ্ট্রের চুক্তি"। এই চুক্তিতে চীনের সার্বভৌমত্ব নামে রক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ছিল চীনকে লুণ্ঠন করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের

পরস্পরের মধ্যে একটি বোঝাপড়া। এই চুক্তি ছিল আগ্রাসনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "সমস্ত শক্তির মধ্যে সমান সুযোগ" এবং "মুক্তদ্বার নীতি" বলে আখ্যা দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় চীনের উপর জাপান যে একচেটিয়া অধিকার করায়ত্ত করেছিল এই চুক্তিতে তার অবসান ঘটান হল। তার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং জাপান যৌথভাবে চীনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কায়েম করল, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকার করল মুখ্য স্থান।

'ওয়াশিংটন সম্মেলনের' পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের চাপের ফলে জাপান তার কিছু অধিকার ছেড়ে দিলে এই তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপর-উপর হ্রাস পেল। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকল, পার্থক্য শুধু হল যে এই সংঘর্ষের রূপ ছিল ভিন্ন এবং তা প্রধানতঃ ছিল পরোক্ষ সংঘর্ষ। প্রত্যেক শক্তিই কোন একজন সামন্তসেনাধিপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজস্ব প্রভাব-বলয় বিস্তার করার জন্য যুদ্ধ করতে সেই সামন্ত-সেনাধিপতিকে দালালরূপে ব্যবহার করত।

চীনের সামন্তসেনাধিপতিরা মূলে সাম্রাজ্যবাদীদের দালালে পরিণত হল। ১৯১৬ সালে পেইইয়াং সামন্তসেনাধিপতিদের নেতা ইউয়ান শিখাই-এর মৃত্যুর পর এই দল "আনহুই চক্র" এবং "চিলি (হোপেই) চক্র" নামে দুটি উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। চিলি চক্রের নেতা ছিলেন ফেং কুওচাং। ১৯১৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছিলেন ছাও খুন এবং উ ফেইফু। ব্রিটেন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চিলি চক্রকে সমর্থন করত। তুয়ান ছিরুই-এর নেতৃত্বে আনহুই চক্র জাপ-সাম্রাজ্যবাদীর পদলেহনকারীতে পরিণত হয়। চাং জুওলিন-এর নেতৃত্বে চীনের উত্তরপূর্বের ফেংথিয়ান চক্রও জাপানের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করত। এই চক্রগুলি এবং বিভিন্ন স্থানের সামন্তসেনাধিপতিরা দেশের বিভিন্ন মুৎসুদ্দি ও স্থানীয় ভূম্যধিকারী আমীরওমরাহদের চক্রের স্বার্থের প্রতি-নিধিত্ব করত। প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে সংঘটিত নিরন্তর গৃহযুদ্ধে প্রতিফলিত হয়েছিল বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে চীনকে লুণ্ঠন করার সংগ্রাম। ইউয়ান শিখাই-এর মৃত্যুর পর পেইচিং-এ অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আনহুই চক্রের নিয়ন্ত্রণাধিকারে এসেছিল। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে, হোপেই প্রদেশের ইয়াংছুন ও জুওচো নামক দুটি স্থানে চিলি এবং আনহুই চক্রের মধ্যে যুদ্ধ হল। চিলি চক্র আনহুই চক্রকে পরাজিত করল এবং পেইচিং

সরকারের ক্ষমতা দখল করে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ১৯২২ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে হোপেই প্রদেশের ছাংসিনতিয়ান-মাছাং অঞ্চলে ফেংথিয়ান এবং চিলি চক্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষে চিলি চক্র সেবারও বিজয় অর্জন করেছিল। যখন উত্তর-চীনের সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন দক্ষিণ-চীনের এক অংশ সামন্তসেনাধিপতি উত্তর-চীনের সামন্তসেনাধিপতিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার ফলে দক্ষিণ-চীনেও নিরন্তর গৃহযুদ্ধ চলতে থাকল।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত: সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ তীব্রতর হবার জন্য এবং তার সঙ্গে সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে পরস্পর বিনাশের সংঘর্ষের জন্য কৃষকদের জীবনযাপন অতিশয় দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল। কৃষকদের উপর পীড়াদায়ক করের বোঝা ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। সামন্তসেনাধিপতিদের সৈন্যবাহিনীর উৎপীড়ন, সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা, প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, জমির খাজনা বৃদ্ধি এবং ঋণের উপর সুদের হার বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, এই সব তাদের সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করল। দক্ষিণ-চীনে কৃষক সমিতিগুলো গঠিত হয়। যেমন, কুয়াংতোং প্রদেশের হাইফেং-এ ফেং ফাই-এর নেতৃত্বে "সাধারণ কৃষক সমিতি" এবং হুনান প্রদেশের হেংশান-এ সিয়ে হুয়াইতে এবং লিউ তোংস্যুয়ান-এর নেতৃত্বে "কৃষক-শ্রমিক সমিতি"। উত্তর-চীনেও "লাল বর্শা সংঘ"-এর মতো আত্মরক্ষার জন্য কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকল।

শ্রমিকদের প্রতি শোষণ যত চরম হতে থাকল ততই তাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং একতা দৃঢ়তর হতে থাকল।

১৯২২ সাল থেকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা পুনরায় চীনের উপর অর্থনীতিক আক্রমণ শুরু করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্রুত বিকাশপ্রাপ্ত চীনা জাতীয় বুর্জোয়াদের পরিচালিত শিল্পোদ্যোগগুলি ক্রমশঃ নিশ্চল হয়ে গেল অথবা গভীর সংকটের মুখে পড়ল। চীনে সুতিবস্ত্রের কারখানায় এবং ময়দার কলেই এই অবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯১৫ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত, চীনের ময়দা ক্রয়ের চেয়ে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল বেশি। কিন্তু ১৯২২ সালে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। ১৯২৩ এবং ১৯২৪ সালে বাৎসরিক পাঁচ থেকে ছয়

মিলিয়ন পিকুল ময়দা আমদানি করা হয়। শিল্প বিকাশের পরিকল্পনায় বাধা পাবার ফলে মধ্য এবং পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীরা সাম্রাজ্যবাদীদের হিতার্থে স্বাক্ষরিত অসম সন্ধিগুলি রদ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও সচেতন হল। তারা সামন্তসেনাধিপতিদের সৃষ্ট গৃহযুদ্ধেরও বিরোধিতা করল।

বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেণীর মধ্যে একযোগে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করল, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একটি ব্যাপকভাবে গঠিত বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের প্রয়োজন আছে। ১৯২৩ সালের জুন মাসে, কুয়াংচৌতে পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ৪৩২ জন পার্টিসদস্যদের প্রতিনিধিরূপে যে তিরিশজন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লি তাচাও, মাও জেতোং, ছেন খানছিউ, ছ্যু ছিউপাই, চাং থাইলেই, ছাই হোসেন এবং সিয়াং চিংইয়ু প্রভৃতি। এই কংগ্রেস একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্ট গঠন করার বিষয় আলোচনা করে ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার যে বাস্তব নীতি গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের নেতা ডাঃ সুন চোংশানকে কুওমিনতাং পার্টির পুনর্গঠনে সাহায্য করা, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ও সমাজবাদী যুব লীগের সদস্যদের ঐ পার্টিতে যোগদানে অনুমতি দেওয়া এবং কুওমিনতাং পার্টিকে শ্রমিক, কৃষক, পাতি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া এই চার শ্রেণীর বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের সংগঠনরূপে পরিণত করা ও সংগ্রামের জন্য দেশের সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত করা। এই কংগ্রেসে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। কুওমিনতাং পার্টি ১৯১২ সালে প্রধানতঃ ডাঃ সুন চোংশানের নেতৃত্বে খোংমেংহুই (চীনা বিপ্লবী লীগ)-এর ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে আলোচনাকালে দুটি চরমপন্থী মতবাদ দেখা দিয়েছিল। একটি ছিল তৎকালীন পার্টির নেতা ছেন তুসিউ-এর প্রতিনিধিত্বে ব্যক্ত মতবাদ। তাঁর মত ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীই বুর্জোয়া বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কাজ কুওমিনতাং-এর হাতে তুলে দিতে হবে। এ ছিল দক্ষিণ আত্মসমর্পণকারী বিচ্যুতি। আর একটি মতবাদ

ব্যক্ত করেছিলেন চাং কুওথাও।* তার বক্তব্য ছিল যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এবং একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম। সুতরাং, চাং কুওথাও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, শ্রমিক অথবা কৃষকদের কুওমিনতাং পার্টিতে যোগদানের মতের বিরোধিতা করে। এ ছিল "বাম" বিচ্যুতি বা রুদ্ধদ্বার নীতি। এই দুটি মতবাদের বিরোধিতা করেছিলেন মাও জেতোং এবং অন্য কয়েকজন ব্যক্তি। অবশেষে, কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই কংগ্রেসে মাও জেতোং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন এবং তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন সাংগঠনিক বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

সুন চোংশান কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য গ্রহণ এবং কুওমিন-তাং-এর পুনর্গঠন: চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টাতে ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যেব ভিত্তিতে কুওমিনতাং পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেস কুয়াংচৌতে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উত্থা-পিত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী মূলনীতি সম্বলিত বিখ্যাত ঘোষণাপত্র গৃহীত হল এবং নির্ধারিত হল 'তিন বৃহৎ নীতি' — সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সহিত সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করা। এইরূপে সুন চোংশানের পুরনো তিন গণনীতি বৈপ্লবিক নতুন তিন গণনীতিতে পরিবর্ধিত হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সদস্য এই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাও জেতোং, লি তাচাও, লিন পোছ্যু এবং ছ্যু ছিউপাই। এঁরা সকলেই কুওমিনতাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পূর্ণ অথবা বিকল্প সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং কংগ্রেসে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। একটি বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্ট গঠনের ফলে বিপ্লবী আন্দো-লনের অগ্রগতিতে নতুন ঢেউ এল এবং কুওমিনতাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে এই ঢেউ সূচিত হয়।

---

* চাং কুওথাও চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। পার্টির অভ্যন্তরে সে অনেক ভুলভ্রান্তি করেছিল যাব ফলে পার্টির প্রভূত ক্ষতি হয়। ১৯৩৮ সালে বসন্তকালে সে সেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে কুওমিনতাং গুপ্তচর বাহিনীতে যোগদান করেছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ডাঃ সুন চোং-শানকে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে এবং একটি বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গঠন করতে সাহায্য করল। কুয়াংচৌ-এর নিকটবর্তী হোয়াম্পোয়া নামক স্থানে অবস্থিত এই বিদ্যালয় হোয়াম্পোয়া সামরিক আকাডেমি নামে পরিচিত হল। রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চৌ এনলাই, ইয়ে চিয়ানইং, নিয়ে রোংচেন, ইয়ুন তাইইং, সিয়াও ছুন্যু এবং সিয়োং সিয়োংকে এই আকাডেমিতে পাঠিয়েছিল। এই আকাডেমির শিক্ষার্থীদের অনেকে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি অথবা যুব লীগের সদস্য। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পার্টি তাঁদের বাছাই করে পাঠিয়েছিল এবং আকাডেমিতে তাঁরাই ছিল বিপ্লবের মেরুদণ্ড। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে, শ্রমিক এবং কৃষকদের সাহায্যে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী কুয়াংতোং প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও মুৎসুদ্দীদের কুয়াংচৌ বণিক স্বেচ্ছাবাহিনী নামে সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিবিপ্লবী উত্থানকে দমন করল এবং ঐ প্রদেশের বিপ্লবী কর্তৃত্বকে আরও শক্তিশালী করে তুলল।

আলোচ্য সময়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনা বিপ্লবকে সাহায্য করা ছাড়া পেইচিং-এ প্রতিষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে একটি সন্ধি স্বাক্ষর করল এবং চীনা জনগণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনা করল। সোভিয়েত ইউয়নের বিরামহীন প্রচেষ্টায় এবং চীনা জনমতের চাপে পড়ে পেইচিং-এর সামন্তসেনাধিপতিদের সরকার অবশেষে ১৯২৪ সালের মে মাসের ৩১ শে তারিখে দুটি দেশের মধ্যে সব রকম সমস্যার সমাধান এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করল।

একটি বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের গঠনে দেশের বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী আন্দোলন অনুপ্রাণিত হল। ১৯২৩ সালের '৭ই ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ড' ঘটনার পর শ্রমিক আন্দোলনে যে ভাঁটা পড়েছিল তাতে আবার জোয়ার এল। কুয়াংতোং-এর বিপ্লবী ঘাঁটিগুলিতে কৃষক আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হতে থাকল; আর হুনান, হোনান, সিছুয়ান, হুপেই, চিয়াংসি ইত্যাদি প্রদেশগুলিতে গুপ্ত কৃষক সমিতিগুলিও বিস্তার লাভ করল।

বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের অগ্রগতি পেইইয়াং সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করল। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে যখন চিলি এবং ফেংথিয়ান চক্রদ্বয়ের সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে যুদ্ধ চরম অবস্থায় পৌঁছল, তখন চিলি চক্রের ফেং

ইয়ুসিয়াং তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পেইচিং ফিরে গিয়ে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করলেন। তিনি চিলি চক্র থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজেকে বিপ্লবের সমর্থনকারী বলে ঘোষণা করলেন। এতে চিলি চক্রের পতন হল এবং পেইচিং-এর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আনহুই ও ফেংথিয়ান চক্রদ্বয়ের হাতে এল। কিন্তু ফেং ইয়ুসিয়াং-এর পরিচালনাধীন জাতীয় সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত হোপেই প্রদেশের এক অংশের এবং ছাহার ও হোনান প্রদেশের শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠল। এই সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত অসম চুক্তিগুলি বাতিল করার জন্য দেশব্যাপী গণআন্দোলন শুরু করল।

বিপ্লবী ঢেউকে স্বাগত জানাবার জন্য ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে শাংহাই শহরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ৯৮০ জন সদস্যের প্রতিনিধিরূপে যে বিশজন ডেলিগেট এই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লি তাচাও, চৌ এনলাই, এবং ছাই হোসেন ইত্যাদি। পার্টির সাংগঠনিক কাজ এবং জনগণের মধ্যে কাজ এই কংগ্রেসে আলোচিত হয়। এই কংগ্রেসে সারা দেশে পার্টি গঠন ও বিকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। শ্রমিক ও কৃষক সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হল এবং জাতীয় পরিষদ আহ্বানের দাবীতে আন্দোলন পরিচালনার নীতিও গৃহীত হল। এই কংগ্রেস গণসংগ্রামে এক নতুন ঢেউ সৃষ্টির জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিল।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে পেইচিং-এ ডাঃ সুন চোংশানের মৃত্যু হল। এই মহান গণতান্ত্রিক ব্যক্তির মৃত্যুতে সারা জাতি গভীরভাবে মর্মাহত হলেন।

৩০শে মে আন্দোলন এবং তার ফলাফল: চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর গণবিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার লাভ হতে থাকল। শাংহাই এবং ছিংতাওতে জাপানী মালিকদের অধীনে সুতিবস্ত্র মিলের শ্রমিকেরা পরপর কয়েকটি বৃহদাকারের ধর্মঘট করলেন। ১৯২৫ সালের ১লা মে কুয়াংচৌতে দ্বিতীয় নিখিল চীন শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এই নীতি অনুযায়ী, লিন ওয়েইমিনকে চেয়ারম্যান এবং লিউ শাওছিকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে নিখিল চীন শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত হল। ঐ

দিনেই কুয়াংচৌতে সারা কুয়াংতোং কৃষক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

১৯২৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি, কয়েকজন চীনা কর্মীকে বরখাস্তের প্রতিবাদে শাংহাই-এর জাপ-মালিকানাধীন সুতিবস্ত্র মিলের চল্লিশ হাজারের অধিক শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করলেন। এই ধর্মঘটে শ্রমিকেরা বিজয় অর্জন করলে শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। কিন্তু জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাবকে দমন করার সঙ্কল্প নিয়ে ১৪ই মে একটি জাপানী মিলের কয়েকজন কর্মীকে বরখাস্ত করল। এরপর শুরু হল শ্রমিক ধর্মঘট। ১৫ই মে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে চীনা শ্রমিকদের প্রতিনিধি ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কু চেংহোংকে জাপানীরা হত্যা করল এবং তাঁর অন্যান্য দশজন সহকর্মীকেও হত্যা বা আহত করল। এই ঘটনাই হল '৩০শে মে আন্দোলন' বিস্ফোরিত হবার সূত্রপাত। ঐ দিনে শাংহাই শহরের দুহাজার শ্রমিক এবং ছাত্রছাত্রী সড়কসভা করলে লীজ এলাকার পুলিশেরা কয়েকশত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। এরপর প্রায় দশ হাজার ছাত্র এবং শ্রমিক নানচিং রোডের লাওজা থানার সম্মুখে জড় হয়ে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য দাবী জানালে ইংরেজ পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের প্রতি গুলিবর্ষণ করে দশজন ব্যক্তিকে হত্যা করল, পনের জন ব্যক্তিকে গুরুতররূপে আহত করল এবং তিপান্ন জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। এই ঘটনা '৩০শে মের হত্যাকাণ্ড' নামে খ্যাত। এই ঘটনার পর ব্রিটেন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও ফ্রান্স বহু রণজাহাজ ও নৌসেনা শাংহাইতে নিয়ে এল। জুন মাসের ৪ তারিখের মধ্যে তাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে নিহত এবং আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা দাঁড়াল শতাধিক।

নানচিং রোডের হত্যাকাণ্ড শাংহাইবাসীদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার করল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তাতে সাড়া দিয়ে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেবার জন্য একটি "অ্যাক্‌শন কমিটি" গঠন করল। ৩১ শে মে ২00,000 শ্রমিক শাংহাই শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করলেন। ১লা জুন থেকে শাংহাইয়ে ধর্মঘটের ঢেউ শুরু হল। এই সব ধর্মঘটে ২00,000 শ্রমিক লিপ্ত ছিলেন। শ্রমিকদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে শাংহাই-এর অধিকাংশ ব্যবসায়ী তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখলেন এবং পঞ্চাশ হাজার ছাত্র ক্লাস বর্জন করলেন। বিক্ষোভ চলতে থাকলে সংগঠনও উন্নত হতে থাকল। ৭ই জুন, শাংহাই শ্রমিক ফেডারেশন, বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং

মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমিতিগুলি "শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র যুক্ত কাউন্সিল" গঠন করলেন। এই কাউন্সিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে পরিচালিত করার একটি মুখ্য শক্তিতে পরিণত হল। এই কাউন্সিল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে যে ১৭দফা দাবী পেশ করল, তার মধ্যে একটি ছিল চীন থেকে সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্রবাহিনীর অপসারণ। ১৭ দফা দাবী পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম শুরু হল।

"৩০শে মের হত্যাকাণ্ডের" ঘটনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ সারা দেশে বিস্তার লাভ করল। শ্রমিকরা তাদের কাজ বন্ধ করলেন, ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট বন্ধ করলেন এবং ছাত্ররা করলেন ক্লাস বর্জন। হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ এবং শাংহাইবাসীদের সমর্থনে পেইচিং, হানখৌ, নানচিং, ছাংশা, থিয়ানচিন, চিউচিয়াং, চিনান, ফুচৌ, ছিংতাও, চেংচৌ, খাইফেং, ছোংছিং, হাংচৌ এবং চাংচিয়াখৌতে অনুরূপ পন্থা অনুসৃত হল। কৃষকরাও গ্রামে গ্রামে শোভাযাত্রা করে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালেন। শাংহাই-এর ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্য অর্থও সংগৃহীত হল। বহু স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পুলিশের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হল। সারা দেশে এক বিরাট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করল।

কুয়াংতোং বিপ্লবী ঘাঁটি সুদৃঢ়করণ: সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন কুয়াংচৌ এবং হংকং-এ উচ্চ শিখরে পৌঁছল। শেষোক্ত শহরে ১০০,০০০ অধিক শ্রমিক চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জুন মাসের ১৯ তারিখে শাংহাই-এর শ্রমিকদের সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান জানালেন। হংকং-এর বহু ধর্মঘটী কুয়াংচৌতে গেলেন, সেখানকার ইংরেজদের লীজ এলাকার শ্রমিকরাও ধর্মঘট করলেন। এই ধর্মঘট কুয়াংচৌ — হংকং ধর্মঘট নামে খ্যাত।

২৩শে জুন, কুয়াংচৌতে ধর্মঘটীরা এবং তাদের সমর্থকরা একটি বিরাট মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। যখন মিছিলকারীরা কুয়াংচৌ শহরের উপকণ্ঠে শাচি নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন ইংরেজ, ফ্রান্স ও পর্তুগীজদের কামানবাহী জাহাজ, সেনা ও পুলিশ মিছিলকারীদের উপর মেশিনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ করল। তাতে দু'শ জনেরও বেশী ব্যক্তি হতাহত হল এবং এই ঘটনা 'শাচি হত্যাকাণ্ড' নামে অভিহিত হল।

এই দুর্ঘটনার পর জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয়ে উঠল। ২৯শে জুন হংকং-এ ধর্মঘটীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ২৫০,০০০। তাদের মধ্যে অর্ধেক লোক হংকং ছেড়ে কুয়াংচৌতে চলে গেলেন। সমৃদ্ধিশালী হংকং হতশ্রী বন্দরে পরিণত হল। ধর্মঘটীরা "কুয়াংচৌ — হংকং ধর্মঘট কমিটি" নাম দিয়ে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য নিজেদের সংগঠন তৈরি করলেন এবং দু'হাজার লোকবিশিষ্ট একটি সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী গঠন করলেন। কুয়াংতোং বিপ্লবী সরকারের সমর্থনে হংকং-এর অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য কুয়াংতোং প্রদেশের বিভিন্ন বন্দরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হ'ল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করার জন্য বিচারালয় স্থাপিত হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা তেং চোংসিয়া ও সু চাওচেং-এর নেতৃত্বে এবং কুয়াংতোং-এর বিপ্লবী সরকার ও কৃষকদের সমর্থন পেয়ে এই ধর্মঘট ষোল মাস স্থায়ী ছিল। বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধরণের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট তখন ছিল বিরল।

একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ১০০,০০০ সংগঠিত শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করে কুয়াংতোং বিপ্লবী ঘাঁটি এবং কুয়াংচৌতে অবস্থিত বিপ্লবী সরকার আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ১লা জুলাই কুয়াংচৌতে জাতীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। বিপ্লবে যোগদানকারী বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত এবং সংযুক্ত করে জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গঠিত হল।

১৯২৫ সালেই অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে কুয়াংতোং-এর বিপ্লবী সরকার এবং তার সৈন্যবাহিনী ঐ প্রদেশের সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের নির্মূল করল। তারা ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবর মাসে ছাওচৌ, শানথৌ এবং হুইচৌতে ছেন চিয়োংমিং-এর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দুটি পূর্বদিকগামী সামরিক অভিযান চালাল। জুন মাসে, তারা কুয়াংচৌ-এর নিকটবর্তী এলাকায় মোতায়েন ইয়ুন্নান এবং কুয়াংসির বিদ্রোহ পরিকল্পনাকারী সেনাদের নির্মূল করল। এই সব অভিযানের সময়ে কুয়াংতোং প্রদেশের শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকেরা এবং কৃষক সমিতির অধীনে কৃষকেরা বিপ্লবী বাহিনীকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই যুদ্ধগুলির সময় কমিউনিস্ট পার্টি এবং যুব লীগের সদস্যরা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং তাতে দ্রুত বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। চৌ

এনলাই ছিলেন এই পূর্বদিকগামী অভিযান বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের অধিকর্তা। ছাওচৌ এবং শানখৌ জয় করার পর তিনি এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কমিশনার নিযুক্ত হলেন। এখানে তিনি ভ্রষ্টাচারী কর্মচারী, স্থানীয় অত্যাচারী ও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য শ্রমিক এবং কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করলেন। ১৯২৬ সালের বসন্তকালের মধ্যেই সমগ্র কুয়াংতোং প্রদেশ বিপ্লবী সৈন্য-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন হল।

এই সময়েই (১৯২৫ সালের ডিসেম্বর) বিপ্লবের গুরু জে.ভি.স্টালিন চীন বিপ্লব যে অপরিমেয় শক্তির সঙ্গে এগিয়ে যাবে তা কল্পনা করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন :

> "চীন বিপ্লবী আন্দোলনে শক্তি অফুরন্ত। এই শক্তি এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় নি। ভবিষ্যতে এর প্রকাশ পাবে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শাসকেরা এখনও এইসব শক্তি দেখতে পাচ্ছে না এবং এইসব শক্তির সম্পূর্ণ মূল্যায়ণও করতে পাচ্ছেনা। এর জন্য তাদের ফলভোগ করতে হবে। (Stalin, Works, Vol. 7. Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1954, P. 300.)

স্টালিনের এই বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি ছিল বিশ্ব ও চীনের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন শক্তির তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। পরবর্তী-কালে চীনা বিপ্লবী শক্তির অগ্রগতিতে এই উক্তি যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়।

"৩০শে মে" আন্দোলনের পর, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিখ্যাত কৃষক নেতা ফেং ফাই-এর নেতৃত্বে কুয়াংতোং প্রদেশের কৃষক আন্দোলন দ্রুত অগ্রগতি লাভ করল। ১৯২৬ সালের মে মাসে কুয়াংচৌতে দ্বিতীয় সারা-কুয়াংতোং প্রাদেশিক কৃষক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে ৬২০,০০০এরও অধিক ব্যক্তি কৃষক সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। মাও জেতোং ১৯২৬ সালের মে মাস থেকে বিখ্যাত 'কুয়াংচৌ কৃষক আন্দোলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের' নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি চীনের একুশটি প্রদেশ এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়াতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নির্বাচন করে এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাত। মাও জেতোং ছাড়া এই কেন্দ্রে বক্তৃতা দেবার জন্য চৌ এনলাই, সিয়াও ছুন্যু, ইয়ুন তাইইং, ফেং ফাই, লি লিসান, রুয়ান সিয়াওসিয়ান এবং অন্যান্যরা আমন্ত্রিত হতেন। এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ

লাভের পর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে গিয়ে কাজ করতেন; পরে তাঁদের মধ্যে অনেকে কৃষক আন্দোলনের মুখ্য ক্যাডারে পরিণত হয়েছিলেন।

বিপ্লবের নেতৃত্ব দখল করতে দক্ষিণপন্থী জাতীয় বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র: "৩০শে মে"র আন্দোলনের পর বিপ্লবী শিবিরের অভ্যন্তরে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার অধিকার নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠল। শ্রমিক এবং কৃষকদের আন্দোলনের অগ্রগতিতে ও কমিউ-নিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে দক্ষিণপন্থী জাতীয় বুর্জো-য়ারা প্রকাশ্যে সাম্যবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধিতা শুরু করল। কুওমিনতাং দলের দক্ষিণপন্থীদের একাংশ যারা ভূম্যধিকারী এবং মুৎসুদ্দিদের প্রভাবের প্রতিনিধিত্ব করত তারা কুওমিনতাং থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিক্রিয়াশীল "পশ্চিম পাহাড়ের সম্মেলন চক্র" সৃষ্টি করল (এই সব ব্যক্তিরা ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে পেইচিং-এর উপকণ্ঠে পশ্চিম পাহাড়ে অবস্থিত সুন চোংশানের কবরের * সামনে বিপ্লববিরোধী সম্মেলন করেছিল বলে তারা 'পশ্চিম পাহাড়ের সম্মেলন চক্র' নামে আখ্যায়িত হয়)। কমিউনিস্ট পার্টির এবং কুওমিনতাং-এর বামপন্থীদের সমর্থনে ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে কুওমিনতাংএর দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে এই চক্রের বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের শাস্তির বিধান করা হয়। কিন্তু, চিয়াং চিয়েশি-এর প্রতিনিধিত্বে দক্ষিণপন্থী জাতীয় বুর্জোয়াদের কর্তৃক বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেবার অধিকার হরণ করার চক্রান্তকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ঐ সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবসাধনে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা ছিল না। এই পরিস্থি-তিতে, ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে মাও জেতোং তাঁর "চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করলেন যে, চীনা শ্রমশিল্পের সর্বহারারাই হল চীন বিপ্লবের অগ্রণী শক্তি, আর তাদের সবচেয়ে ব্যাপক এবং দৃঢ়তর মৈত্রী সেনা হল কৃষক। মাও জেতোং আরও বলেন যে, দোদুল্যমানচিত্ত-সম্পন্ন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের ঢেউ এলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং এই শ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা হয়তো বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হবে। তিনি বিপ্লবীদের সাবধানতা অবলম্বন ও এইরূপ পরিস্থিতি

* ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে এই কবর নানচিংএ স্থানান্তরিত করা হয়।

নিবারণের জন্য আহ্বান জানালেন। তৎকালীন পার্টির অভ্যন্তরে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তারই বিরোধিতা করে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়েছিল। ঐ সময়ে পার্টির মুখ্য সংগঠনগুলির দক্ষিণপন্থী ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদীরা কৃষকদের অবজ্ঞা করত, শক্তির উৎস সম্বন্ধে তারা ছিল অজ্ঞ এবং কুওমিনতাং-এর দক্ষিণপন্থীদের সম্মুখে তারা অসহায় বোধ করত।

মাও জেডোং-এর সঠিক মতামত তৎকালীন পার্টির নেতা এবং একজন দক্ষিণ-পন্থী চেন তুসিউ অগ্রাহ্য করল। ফলস্বরূপ, দক্ষিণপন্থী জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবকে আক্রমণ করার এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব দখল করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার্টির নেতৃত্ব ব্যর্থ হল। ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ, চিয়াং চিয়েশি তার অনুচরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একজন কমিউ-নিস্টের পরিচালনাধীন "চোংশান' নামক রণপোতকে কুয়াংচৌ থেকে হোয়া-ম্পোয়াতে যাবার জন্য আদেশ দিল। যখন তার নির্দেশ অনুযায়ী ঐ রণপোত কুয়াংচৌ ত্যাগ করল তখন চিয়াং চিয়েশি গুজব রটালো যে ঐ জাহাজ বিনা অনুমতিতে কুয়াংচৌ ত্যাগ করেছে। আর একটি বিদ্রোহ সংঘটিত করাই নাকি হল তার উদ্দেশ্য। ২০শে মার্চ চিয়াং চিয়েশি হোয়াম্পোয়া সামরিক আকাডেমি এবং জাতীয় সৈন্যবাহিনীর ১নং বাহিনীর সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যদের গ্রেপ্তার করার জন্য তার সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিল। কুয়াংচৌ-হংকং ধর্মঘট কমিটির কার্যালয় এবং কুওমিনতাং-এর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের বাসস্থান ঘেরাও করা হল এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর ১নং বাহিনী ত্যাগ করতে বাধ্য করান হল। ছেন তুসিউ-এর নেতৃত্বে পার্টির দক্ষিণ-সুবিধাবাদীরা এই ঘটনার প্রতি আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করল। অতঃপর, জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সামরিক নেতৃত্ব চিয়াং চিয়েশি'র অধীনে গেল। ১৫ই মে, কুওমিনতাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় প্লেনামে চিয়াং চিয়েশি "পার্টির পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে প্রস্তাব" পেশ করল। তাতে কুও-মিনতাং-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের নেতৃত্ব পদে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের পদাধিকার নিষিদ্ধ করা হল। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে কুওমিনতাং-এ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে আরও দুর্বল করে ফেলল। পার্টির অভ্যন্তরে ছেন তুসিউ-এর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা একের পর এক নিজেদের অধি-

কার ছেড়ে দিয়ে কুওমিনতাং-এর দক্ষিণপন্থীদের চক্রান্তের ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহ দিতে থাকল। তাতে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা ক্রমশঃ বিপ্লবের নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবাদ-বিরোধী মহান বিপ্লব গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হল।

উত্তর অভিযানে একের পর এক বিজয় অর্জন: উপরোক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকল। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী কুয়াংতোং প্রদেশ থেকে তার উত্তরাভিযান শুরু করল। তিনটি বিভিন্ন রাস্তা অনুসরণ করে এই বাহিনী পেইইয়াং সামন্তসেনাধি-পতিদের প্রতি আক্রমণ হানল। এই অভিযান ছিল শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ নিয়ে সম্মিলিতভাবে চালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তশক্তিবিরোধী একটি বিপ্লবী যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের প্রধান চালিকা শক্তি ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। চিয়াং চিয়েশি এবং তার মতো অন্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থীরা পেইইয়াং সামন্তসেনা-ধিপতিদের স্থান দখল করার মতলব করে এই যুদ্ধকে নিজেদের অভীষ্ট পূরণের যুদ্ধে পরিণত করতে চেষ্টা করল যাতে বিপ্লবকে ক্রমশঃ বিপথে চালিত করার তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়।

ব্যাপকতর শ্রমিক, কৃষক ও জনতার সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করে উত্তরাভিযান সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকল। এই বাহিনীর প্রধান শক্তি কমিউ-নিস্ট পার্টির সদস্য ইয়ে থিং-এর স্বাধীনভাবে পরিচালনাধীন রেজিমেণ্ট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে হুনান প্রদেশের মধ্য দিয়ে হুপেই প্রদেশে প্রবেশ করল। এই প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত তিংসিছিয়াও এবং হোশেংছিয়াও নামক স্থানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল। ১৯২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর এই রেজিমেণ্ট হানখৌ ও হানইয়াং অধিকার করল। ১০ই অক্টোবর উছাং অধিকৃত হল। ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে জাতীয় সরকার কুয়াংচৌ থেকে উহানে স্থানান্তরিত হল। উহান হল উছাং, হানখৌ এবং হানইয়াং এই তিনটি শহরের সম্মিলিত নাম।

পূর্ব প্রান্তে, উত্তরাভিযান সৈন্যবাহিনী ডিসেম্বর মাসে সমগ্র ফুচিয়ান প্রদেশের কর্তৃত্ব অধিকার করল এবং তারপর চেচিয়াং প্রদেশের ছ্যুচৌতে প্রবেশ করল। চিয়াংসিতে এই বাহিনী পুনঃপুনঃ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অবশেষে ৮ই নভেম্বর নান-ছাং দখল করল। উত্তর প্রান্তে, ফেং ইয়ুসিয়াং-এর পরিচালনাধীনে জাতীয় সৈন্য-

বাহিনী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে সুইইউয়ান থেকে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে ডিসেম্বর মাসে সমগ্র সেনসী প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনল।

উত্তরাভিযান যে দ্রুত বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল তার কারণ হল যে, এই যুদ্ধ বিপ্লবী পরিস্থিতির প্রয়োজনানুযায়ী ছিল এবং তা ছিল জনগণের অভিপ্রায়। আর কিছুটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং বিশ্বের জনগণের সাহায্য ও সমর্থন। শ্রমিক এবং কৃষকেরা এই অভিযানকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই অভিযান শুরু হবার সময় কুয়াংচৌ এবং হংকং-এ ধর্মঘটরত শ্রমিকেরা বিরাট সংখ্যায় অভিযান বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন এবং যোগাযোগ ও স্ট্রেচার বহনকারীর দল গঠন করেছিলেন। অভিযান বাহিনী হুনান প্রদেশে পৌঁছলে সেখানকার কৃষকেরা এবং রেলকর্মীরা অনেক সাহায্য করেছিলেন। এই বাহিনীর বিভিন্ন শাখাতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং যুব লীগের সদস্যরা মুখ্য ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক প্রভাবের দরুন অভিযানের সৈনিকেরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতা পালন করেন।

উত্তরাভিযান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহে শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলন দ্রুত অগ্রগতি লাভ করল। উহান অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং ১৯২৭ সালের শুরুতে এই সংখ্যা ছিল ৩০০,০০০। তাদের মধ্যে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী গঠিত হল। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের শুরুতে হানখৌ এবং চিউচিয়াং-এর শ্রমিকেরা স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে লীজ এলাকা দখল করলেন এবং উহানে অবস্থিত জাতীয় সরকারের সাহায্যে তাঁরা ইংরেজ অধিকৃত দুটি বন্দরের লীজ এলাকা দখল করে তার পুনরুদ্ধার করলেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর এবং ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দুবারের উত্থান ব্যর্থ হবার পর ২১শে মার্চ চৌ এনলাই, লুও ইনোং এবং চাও শিইয়ান-এর নেতৃত্বে শাংহাই-এর ৮০০,০০০ শ্রমিকেরা তৃতীয় বারের মতো সশস্ত্র উত্থান করে দুদিন এবং এক রাত তীব্র যুদ্ধ করার পর অবশেষে শাংহাই শহর দখল করলেন।

উত্তরাভিযানের প্রভাব সমগ্র ছাংচিয়াং নদী উপত্যকাঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল এবং তা পরে হুয়াংহো বা পীতনদী উপত্যকাঞ্চলের দিকে বিস্তার লাভ করতে থাকল। একই সময়ে, দক্ষিণ-চীনের প্রদেশগুলিতে, বিশেষ করে হুনান প্রদেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক কৃষক সমিতিতে যোগদান করেছিলেন এবং আত্মরক্ষী বাহিনী

গঠন করেছিলেন। কৃষক সমিতিগুলি স্থানীয় আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে ভূম্যধিকারী এবং সামন্ততান্ত্রিকদের উৎখাত করল এবং কোন কোন স্থানে তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করল। বহু ছোট শহর ও গ্রামে "সর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষক সমিতি" বাস্তবে রূপায়িত হল।

চীন বিপ্লব সম্বন্ধে স্টালিন এবং মাও জেতোং: ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন বিপ্লব দ্রুতগতিতে ছাংচিয়াং নদী উপত্যকাঞ্চলে বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রশ্ন উত্থাপিত হল। ঠিক ঐ সময়েই স্টালিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কার্যকরী কমিটির চীন বিষয়ের কমিশনের অধিবেশনে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ— "চীন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ" — প্রদান করলেন। এই ভাষণে তিনি চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতা এবং চীনা প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের মাধ্যমে চীন বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের গুরুতর বিপদের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি চীনা কমিউনিস্টদের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন যে চীন বিপ্লবের প্রধান এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সশস্ত্র সংগ্রাম। চীনা কমিউনিস্টদের সত্যিকারের বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এবং রণবিদ্যার শিক্ষা নেওয়া যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই কথা তিনি উল্লেখ করেন। আরও, কৃষকদের দাবী পূরণের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট শক্তিশালী করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে এবং গভীরে যেতে হবে। স্টালিন আরও বলেন যে, সর্বহারাদের জাগ্রত হয়ে বিপ্লবের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে রাখতে হবে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মূল কর্তব্য হবে চীনে পুঁজিবাদহীন ভবিষ্যতের জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম প্রসারিত করা।

১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে হুনান প্রদেশকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে কৃষক আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল তা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে সংগ্রামকে এক উচ্চ শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল। সর্বহারাশ্রেণী কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন ও নেতৃত্ব দিতে পারবে কিনা তা ছিল বিপ্লবের জয়-পরাজয়ের মূল প্রশ্ন। এই সন্ধিক্ষণে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও জেতোংকে হুনানের কৃষক বিপ্লব সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য সেখানে পাঠালেন। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর "হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট" প্রকাশিত হল। এই রিপোর্টে তিনি চীন বিপ্লবে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদভাবে

ব্যাখ্যা করে বললেন যে, বিপ্লবীদের অবিচলিতভাবে কৃষক আন্দোলনের সম্মুখভাগে থেকে সমর্থন করতে হবে এবং কৃষকদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হবে। যে সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি চীৎকার করে কৃষক আন্দোলনকে "অতি শোচনীয়" বলে অপবাদ দিয়েছিল তিনি তাদের এই উক্তির খণ্ডন ও বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে, কয়েক হাজার বছরের স্থানীয় উৎপীড়ক ও জমিদারশ্রেণীর মূল খুঁটি হল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তসেনাধিপতি এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা। আর, সামন্ততান্ত্রিক শক্তির উৎখাত সাধনে কৃষকদের সংগ্রামই হল জাতীয় বিপ্লবের সত্যিকারের লক্ষ্য। মাও জেতোং-এর মতে ভূম্যধিকারীশ্রেণীর শিকড় খুব গভীর, সুতরাং কৃষকদের সামন্ত-তন্ত্রকে নির্মূল করার বিপ্লবী সংগ্রামে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তবেই সামন্তবাদের উৎখাত সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভূম্যধিকারীদের শক্তি উৎখাত করার পর বিপ্লবের বিজয়কে রক্ষা এবং তার অগ্রগতির জন্য কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কৃষক সৈন্যবাহিনী স্থাপিত করতে হবে। মাও জেতোং তীব্রভাবে পার্টির অভ্যন্তরে ছেন তুসিউ-এর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণকারীরা কৃষক আন্দোলনকে "মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে" বলে যে ভুল মন্তব্য করেছিল তা খণ্ডন করলেন।

যদি স্টালিন এবং মাও জেতোং-এর মূল্যবান মতামত তৎকালীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতেন, তা হলে তখনকার বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যর্থ না হয়ে বিজয় অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারত।

কুওমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা: কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী শঙ্কিত হয়ে পড়ল। ১৯২৭ সালের ২৪শে মার্চ, সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তরাভিযান সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা মুক্ত নানচিং শহরে তাদের বসবাস এবং কূটনৈতিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এই ওজরে ঐ শহরের উপর বোমাবর্ষণ করল। তারা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শাংহাই শহরেও সৈন্য পাঠাল। শাংহাইতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধি চিয়াং চিয়েশি চক্র তখন সাম্রাজ্যবাদীদের এবং সামন্ততান্ত্রিক ও মুৎসুদ্দি শক্তির সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করত। সাম্রাজ্যবাদী এবং চীনা সামন্ততান্ত্রিক ও মুৎসুদ্দি শক্তির স্বার্থে চিয়াং চিয়েশি বিপ্লব দমনের জন্য রক্তক্ষয়ী পন্থা অবলম্বন করল। ১৯২৭ সালের

১২ই এপ্রিল সে একটি প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করল এবং তাতে বহু শ্রমিক ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নিহত হলেন। অতঃপর, কুয়াংচৌ, নানচিং, হাংচৌ, নিংপো এবং ফুচৌতে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ করে বহু সংখ্যক বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হল। ছেন তুসিউ এবং তার অনুগামীদের নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভুল লাইনের জন্য পার্টিতে সতর্কতার অভাব ছিল এবং কুওমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। এইরূপে বিপ্লবী শক্তি আচম্বিত প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংগঠিত করতে অক্ষম হল এবং বিপ্লব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

১২ই এপ্রিলের প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রথম গৃহযুদ্ধ আংশিকভাবে ব্যর্থ হল। তারপর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী এবং বৃহৎ ভূম্যধিকারী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীর পক্ষ নিল এবং বিপ্লবের পথ থেকে সরে দাঁড়াল। সাম্রাজ্যবাদী এবং বৃহৎ ভূম্যধিকারী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণীরা সত্বর চিয়াং চিয়েশিকে তাদের নূতন হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে নানচিং-এ একটি প্রতিবিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করল। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের পথ ত্যাগ করলে বিপ্লবী শিবির চারটি শ্রেণীর পরিবর্তে শ্রমিক, কৃষক ও পাতি বুর্জোয়া এই তিনটি শ্রেণীর শিবিরে পরিণত হল এবং বিপ্লবী সংগ্রাম একটি সংকটের পর্যায়ে প্রবেশ করল।

১৯২৭ সালের ২৭ শে এপ্রিল, উহানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম জাতীয় কংগ্রেস আহূত হল। ঐ কংগ্রেসে ৫৭,৯৬৭ সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবে ৮০ জন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। ঐ কংগ্রেসে ছেন তুসিউকে তাঁর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুলের জন্য সমালোচনা করলেও তাঁকেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক রূপে পুনর্নির্বাচিত করা হল। কিন্তু কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরও ছেন তুসিউ তাঁর আত্মসমর্পণকারী ভুল লাইন অনুসরণ করে চলেন। কৃষকদের ভূমির প্রশ্ন, উহানে অবস্থিত কুওমিনতাং-এর প্রতি কৌশল অবলম্বনের প্রশ্ন, বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা জোরদার করার প্রশ্ন, শ্রমিক ও কৃষকদের অস্ত্রে সজ্জিত করার প্রশ্ন এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এইসব জরুরী প্রশ্নের সমাধান করতে ঐ কংগ্রেস ব্যর্থ হল।

পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস সমাপ্তির পর উহানস্থিত বিপ্লবী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন

হুনান এবং হুপেই প্রদেশ দুটিতে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করতে থাকল। এই অঞ্চলসমূহের জমিদার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যবাদী ও চিয়াং চিয়েশির প্রতিবিপ্লবী চক্রের সমর্থনে কয়েকটি প্রতি-বিপ্লবী বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। ১৭ই মে, হুপেই প্রদেশে সিয়া তৌইন নামে একজন প্রতিক্রিয়াশীল অফিসার বিদ্রোহ করলে ইয়েখিং-এর সৈনিকরা তা দমন করলেন। ২১শে মে, হুনান প্রদেশের ছাংশা শহরে স্যু খেসিয়াং নামে আর একজন অফিসার সামরিক অভ্যুত্থান করলে সেখানে বহু শ্রমিক, কৃষক এবং কমিউনিস্ট ক্যাডার নিহত হলেন। উহানের ওয়াং চিংওয়েই চক্র জনপ্রিয় বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য বহু নির্দেশ জারী করল। পার্টিতে ছেন তুসিউ-এর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণকারীরা এই সব প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সংগঠিত না করে শ্রমিক ও কৃষকদের অস্ত্র ত্যাগ করার জন্য আদেশ দিল। তারা আপোষ-রফা করে ওয়াং চিংওয়েই-এর সমর্থন পাবার চেষ্টা করল। তারা বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ত্যাগ করল। কিন্তু তারা যা আশা করে-ছিল পরবর্তী ঘটনাসমূহে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দেখা দিল। ১৫ই জুলাই ওয়াং চিংওয়েই চক্র একটি সামরিক অভ্যুত্থান করল এবং অবিলম্বে সব জনসংগঠন-কে অবৈধ ঘোষণা করে বিরাটাকারে কমিউনিস্ট, শ্রমিক এবং কৃষকদের গ্রেপ্তার ও হত্যা শুরু করল। অবশেষে চীনা জনগণের তীব্র এবং তেজোময় প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

এই ব্যর্থতার কারণ হল সাম্রাজ্যবাদ এবং কুওমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী শক্তি তৎকালীন বিপ্লবী শক্তির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ছেন তুসিউ-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণ সুবিধাবাদীরা পার্টির অভ্যন্তরে মাও জেতোং-এর প্রতিনিধিত্বে কমরেডদের সঠিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। তা সত্ত্বেও, ঐ বছরের সব ঘটনার বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল এবং বিপ্লবী জনগণের প্রতি তা সব ছিল মূল্যবান শিক্ষা। তা থেকে চীনা জনগণ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সামন্তবাদী শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। আরও, জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম ও জীবনদানরত বিপ্লবী শক্তিরূপী চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আবির্ভাবকে তাঁরা চীনা জাতির আশা বলে মনে করলেন। চীনা শ্রমিকশ্রেণী এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তব থেকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করতে পারলেন, এবং অসংখ্য পার্টি ক্যাডার

নিজেদের পোড় খাওয়ানোর সুযোগ পেলেন ও তাঁরা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে নিয়োজিত হলেন। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধকে বিপ্লবের "নাট্যমঞ্চে পূর্ণাঙ্গ মহলা" বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই বিপ্লব চীনা শ্রমিকশ্রেণী এবং চীনা জনগণকে দেখাল বিজয় অর্জনের পথ।

২. দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ
(১৯২৭-এর আগস্ট মাস থেকে ১৯৩৭ সালের জুন মাস)

প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং-এর গর্হিত ক্রিয়াকলাপ : প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ ব্যর্থ হবার পর চীনে শ্রেণী শক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাস দেখা দিল। জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণী মুৎসুদ্দিশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে বিপ্লবের বিরোধিতা করল এবং পাতি বুর্জোয়া-শ্রেণীর একাংশও বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়াল। যে সব শ্রেণী বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেল তারা ছিল শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী কৃষক এবং শহুরে গরীব পাতি বুর্জোয়াশ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদীরা, সামন্ততান্ত্রিক শক্তিসমূহ এবং মুৎসুদ্দি-শ্রেণী ও কুওমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের নতুন ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত করে পেইইয়াং সামন্তসেনাধিপতিদের পরিবর্তে প্রতিবিপ্লবী সামরিক একনায়কতন্ত্র অর্থাৎ কুওমিনতাং-এর নতুন সামন্তসেনাধিপতিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করল।

সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে চিয়াং চিয়েশির নেতৃত্বে কুওমিনতাং-এর নতুন সামন্তসেনাধিপতিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এই প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিশ্বাসঘাতক চক্র সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। এই চক্র মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট ছিল। সময়ে সময়ে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদেরও আদেশ পালন করত এই চক্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং জাপানের মধ্যে চীনের বাজার দখল করার জন্য সংগ্রাম পরবর্তী কয়েক বছরে কুওমিনতাং-এর নতুন সামন্তসেনাধিপতির মধ্যে তীব্রতর যুদ্ধে প্রতিফলিত হল। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে কুওমিনতাং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী সামন্ত-সেনাধিপতি গোষ্ঠীদের মধ্যে ছ'সাতবার বৃহদাকারের যুদ্ধ সংঘটিত হল। ১৯২৭

সালের অক্টোবর মাসে একদিকে নানচিং-এর চিয়াং চিয়েশি ও লি জোংরেন এবং অন্যদিকে উহানের ওয়াং চিংওয়েই ও থাং শেংচি'র মধ্যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হল। নভেম্বর মাসে, কুয়াংতোং প্রদেশের নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কুয়াংতোং এবং কুয়াংসির সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হল। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিকে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত চিয়াং চিয়েশি, লি জোংরেন, ইয়ান সিশান, ফেং ইয়ুসিয়াং-এর গোষ্ঠী আর অন্যদিকে জাপান সমর্থিত চাং জুওলিন-এর গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তর-চীন নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার নিয়ে বিরাট সংঘর্ষ হল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে, মধ্য-চীন নিয়ন্ত্রণের জন্য চিয়াং চিয়েশি এবং লি জোংরেন-এর মধ্যে যুদ্ধ হল। অক্টোবর মাসে, চিয়াং চিয়েশির সঙ্গে ফেং ইয়ুসিয়াং-এর যুদ্ধ হল। তার দুমাস পর থাং শেংচি ও শি ইয়ুসান চিয়াং চিয়েশিকে আক্রমণ করল। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে, চিয়াং চিয়েশি হোনান প্রদেশে ইয়ান সিশান এবং ফেং ইয়ুসিয়াং-এর বিরুদ্ধে বিরাটাকারে যুদ্ধ শুরু করল। ইয়ুন্নান, কুইচৌ, সিচুয়ান এবং শানতোং প্রদেশের ছোটখাটো সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকল। এই সব গৃহযুদ্ধে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হল। চীন দেশের প্রায় অর্ধেক অংশ এই গৃহযুদ্ধের করাল-ছায়ায় পড়ল এবং সাধারণ জনগণের জীবন ব্যাপকভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে যুদ্ধে লাভবান হল চিয়াং চিয়েশি। এর কারণ হল যে, তার গোষ্ঠী চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের অধিকারী এবং কুওমিনতাং-এর কেন্দ্রবিন্দুরূপে জাহির করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়েছিল এবং দেশের মধ্যে চিয়াংসু, চেচিয়াং ও শাংহাই-এর ধনকুবেরদেরও সমর্থন পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চিয়াং চিয়েশির কর্তৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করার কারণ ছিল এই যে, তারা বিপ্লব দমন এবং চীনা জনগণকে শোষণের জন্য তাকে হাতিয়ার বলে গণ্য করত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা অন্যদিকে "বিভেদ ও শাসনের নীতি" অনুসরণ করে কুয়াংতোং, কুয়াংসি, সিচুয়ান এবং উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব চীনের স্থানীয় সামন্তসেনাধিপতিদের অর্ধ-স্বাধীনতার অবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং প্রকাশ্যে নানচিং সরকারকে অমান্য এমনকি ঐ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যও উৎসাহ দিত।

চিয়াং চিয়েশির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং শাসক চক্র ছিল ভূম্যধিকারী, মুৎসুদ্দি, বিশেষ করে চিয়াংসু ও চেচিয়াং-এর ধনকুবেরদের সমর্থনপুষ্ট ভূম্যধিকারী, মুৎসুদ্দি, সামন্তসেনাধিপতি. আমলাতন্ত্রবাদী ব্যক্তি, বাউণ্ডুলে এবং কুওমিনতাং দলের শঠ ব্যক্তিদের সম্মিলিত সরকার। প্রকৃতপক্ষে এই সরকারের সঙ্গে পেইইয়াং সামন্তসেনাধিপতিদের সরকারের কোন পার্থক্য ছিল না। যে পার্থক্য ছিল তা হল কুওমিনতাং-এর নতুন সামন্তসেনাধিপতিরা পেইইয়াং সামন্তসেনাধিপতিদের স্থানচ্যুত করে এক সময়ের বিপ্লবী তিন গণ-নীতি ও কুওমিনতাং-এর পতাকার আবরণে তাদের কলঙ্কজনক ফ্যাসিস্ট শাসন চালাল যা ছিল পেইইয়াং সামন্তসেনাধিপতিদের শাসনের চেয়েও ভয়ংকর। ফলস্বরূপ, এই শাসনাধীনে শোষণ ও নিপীড়ন ছিল এমন বর্বর ইতিপূর্বে যার কোন দৃষ্টান্ত মেলে না।

এই শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মাও জেতোং মন্তব্য করে বলেছিলেন :

> কুওমিনতাং-এর নতুন সামন্তসেনাধিপতিদের বর্তমান শাসন ঠিক আগের মতোই শহরে বিদেশী পুঁজিবাদের মুৎসুদ্দিশ্রেণীর আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকশ্রেণীর শাসন যা বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নতুন সামন্তসেনাধিপতিদের দ্বারা পুরানো সামন্তসেনাধিপতিদের বদলিয়েছে এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন আগের চেয়েও অধিক তীব্রতর করে তুলেছে। . . . সারাদেশের শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ জনগণ, এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীও আগের মতো প্রতিবিপ্লবী শাসনাধীনে রয়েছে এবং লেশমাত্রও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে নি। (Sclcted Works of Mao Zedong, Foreign Languages Press, Beijing, 1975, Vol. 1, P. 63)

এই বর্বর কলঙ্কময় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী চীনা জাতির প্রস্ফুটিত ফুল — কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং বিপ্লবী যুবকদের — অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার সঙ্গে হত্যা করতে থাকল। ১৯২৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরবর্তী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে অন্ততঃ দশ লক্ষ বিপ্লবীদের হত্যা করা হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতারা যেমন, কুও লিয়াং, ছাই হোসেন, ছেন ইয়াননিয়ান, চাও শিইয়ান, সিয়াও ছুন্যু ,ইয়ুন তাইইং, সিয়াং চিংইয়ু, সিয়োং সিয়োং, ফেং ফাই, লুও তেংসিয়ান, লুও ইনোং, ওয়াং হোপো, ছেন ছিয়াওনিয়ান, সিয়া মিংহান, সুন পিংওয়েন এবং হো মেংসিয়োং ইত্যাদি।

কিন্তু রক্তপাত করতে উদগ্রীব চিয়াং চিয়েশি দস্যুদল যতরকম পদক্ষেপই নিল না কেন তা চীনা জনগণকে এবং চীনা কমিউনিস্টদের ভীত অথবা নিশ্চিহ্ন করতে পারল না। মাও জেতোং বলেছেন :

> "কিন্তু তা' চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণকে সন্ত্রস্ত করতে পারে নি, বশে আনতে পারে নি কিম্বা নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। তাঁরা সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালেন, শরীরের রক্তচিহ্ন মুছে ফেলে নিহত কমরেডদের সমাধিস্থ করলেন এবং আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংগ্রামে। বিপ্লবের মহান পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধ'রে সশস্ত্র প্রতিরোধে জেগে উঠলেন তাঁরা, . . ."
>
> **("On Coalition Government" Selected Works of Mao Zedong, Foreign Languages Press, Beijing, 1975, Vol. III, p. 211.)**

১লা আগস্ট উত্থান এবং চিংকাংশানে বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা : ব্যর্থ বিপ্লবের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং অবিচ্ছিন্ন বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট তারিখে চৌ এনলাই, চু তে, হো লোং, ইয়ে খিং এবং লিউ পোছেং তিরিশ হাজার লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে চিয়াংসি প্রদেশের নানছাং-এ একটি অভ্যুত্থান সংগঠিত করলেন। এই অভ্যুত্থানে প্রতিষ্ঠিত হল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীনা গণ ফৌজ, এবং উত্তোলিত হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাংবিরোধী শক্তিশালী বিপ্লবী পতাকা। কিন্তু, অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবাহিনী চিয়াংসি প্রদেশের কৃষক আন্দোলনে যোগদান না করে দক্ষিণ দিকে কুয়াংতোং প্রদেশের দিকে যাত্রা শুরু করল। তারা ফুচিয়ান প্রদেশ অতিক্রম করে কুয়াংতোং প্রদেশের ছাওচৌ এবং শানথৌ অধিকার করল। অক্টোবর মাসের শুরুতে একটি যুদ্ধে তারা সংখ্যাধিক্য কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরাজিত হল। এই পরাজিত সৈন্যবাহিনীর একাংশ হাইফেং-লুফেং অঞ্চলে গেল এবং স্থানীয় কৃষক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল। চু তে ও ছেন ই'র নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য-

বিশিষ্ট আর একটি দল দীর্ঘ এবং চক্রাকারের পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ হুনানে পৌঁছল। সেখানে তারা কয়েকটি কৃষক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিলেন। তাদের সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ন'হাজার হল। পরে চু তে এবং ছেন ই এই সৈন্যবাহিনীদের নেতৃত্ব দিয়ে চিংকাংশানে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাও জেতোং-এর পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই মিলিত সৈন্য-বাহিনী চীনের শ্রমিক এবং কৃষকদের লাল ফৌজের অঙ্কুরে পরিণত হল।

আগস্ট মাসের ৭ই তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক হানখৌতে আহূত জরুরী সভাতে ছেন তুসিউ-এর দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণকারী লাইন বর্জন করে একটি নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই সভাতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল যে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য পার্টিকে নেতৃত্ব দিতে হবে, হুনান, হুপেই, কুয়াংতোং ও চিয়াংসি প্রদেশসমূহের কৃষকদের মধ্যে জমিদারদের জমি বণ্টন করার কাজে সাহায্য করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং শাসনের উৎখাতের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে হবে।

৭ই আগস্টের সভা সমাপ্তির পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শরৎ-কালীন ফসল সংগ্রহের সময় অভ্যুত্থান সংগঠিত করার এবং হুনান প্রদেশের রাজধানী ছাংশা আক্রমণ করার প্রস্তুতির জন্য মাও জেতোংকে পূর্ব-হুনান ও পশ্চিমচিয়াংসিতে পাঠালেন। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মাও জেতোং ইতিপূর্বে অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী ফিংচিয়াং ও লিউইয়াং-এর কৃষকসেনা, আনইউয়ানের খনিকর্মী এবং উছাং-এর পূর্বতন জাতীয় সরকারের রক্ষীবাহিনীকে একত্রিত করে শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবীবাহিনীর প্রথম বাহিনীর প্রথম ডিভিসন গঠন করলেন। এই বাহিনী ছাংশা আক্রমণের আগে লিলিং, লিউইয়াং এবং ফিংচিয়াং আক্রমণ করল। কিন্তু এই আক্রমণ ব্যর্থ হল। লিউইয়াং-এর ওয়েনচিয়াশি নামক স্থানে পরাজিত সেনাদের একত্রিত করে মাও জেতোং ছাংশা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে লুওসিয়াও পর্বতমালার মধ্যভাগে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অক্টোবর মাসে, কয়েকবার কঠিন সংঘর্ষের পর মাও জেতোং এই সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করে হুনান এবং চিয়াংসির সীমান্তে অবস্থিত চিংকাশান পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নিলেন ও সেখানে সর্বপ্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করলেন।

ডিসেম্বর মাসের ১১ই তারিখে, চাং থাইলেই, ইয়ে থিং, ইয়ে চিয়ানইং, নিয়ে রোংচেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কুয়াংতোং প্রাদেশিক শাখার অন্যান্য সদস্য কুয়াংচৌতে শ্রমিক ও স্থানীয় সৈন্যবাহিনীদের একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিলেন। এই অভ্যুত্থানে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার লোক যোগদান করল এবং ঐ শহরে একটি বিপ্লবী শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তিন দিন বীরত্বপূর্ণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাংদের শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত সৈন্যবাহিনী এই অভ্যুত্থানকে দমন করল।

নানছাং অভ্যুত্থান এবং শরৎকালীন ফসল সংগ্রহের অভ্যুত্থানের পর কুয়াংচৌ অভ্যুত্থান ছিল আর একটি গণ-অভ্যুত্থান যা প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং চক্রের প্রতি একটি বিরাট আঘাত হেনেছিল। যদিও এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল, তবুও পূর্ববর্তী দুটি অভ্যুত্থানের ন্যায় একটি লাল ফৌজ গঠন করতে এই অভ্যুত্থানেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সূচিত হয়েছিল।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে, চু তে'র পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনী মাও জেতোং-এর নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল। এই মিলিত নূতন বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা হল দশ সহস্রাধিক এবং তার নাম দেওয়া হল চীনা শ্রমিককৃষক লাল ফৌজের চতুর্থ বাহিনী। সর্বহারাদের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র শ্রমিক ও কৃষকযুক্ত এই বাহিনী ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং চীন বিপ্লবের ইতিহাসে তা ছিল একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চতুর্থ লাল ফৌজ বাহিনী চিংকাংশানের নিকটবর্তী অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালনা করল, ভূমি বণ্টনের জন্য কৃষকদের সংগঠিত ও শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করল এবং হুনান ও চিয়াংসির সামন্তসেনাধিপতিদের দ্বারা তিনবার ঘেরাও করার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দিল।

বিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনীকে পরিচালনা করে মাও জেতোং-এর চিংকাংশান যাত্রার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল বিরাট। এই যাত্রায় তিনি বিপ্লব ব্যর্থ হবার ফলে শহর থেকে পিছিয়ে আসার পদক্ষেপকে গ্রাম আক্রমণ করার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মাও জেতোং "চীনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?" নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসিত চীনের মতো আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সামন্তসেনাধিপতিদের মধ্যে অনবরত বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে শূন্যস্থানের

সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে শ্বেত শাসন কর্তৃক ঘেরাও হওয়া সত্ত্বেও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থানও টিকে থাকা সম্ভব। তিনি আরও বললেন যে পার্টির সঠিক নেতৃত্বের অধীনে লাল ফৌজের যুদ্ধ, ভূমি বিপ্লব ও গ্রামে ঘাঁটি নির্মাণ করা এই তিনটির সমন্বয় সাধন করে এবং দীর্ঘ সময় বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রমশঃ গ্রামীণ বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির উন্নতি ও বিস্তারলাভ করে শহরগুলিকে ঘেরাও করে সর্বশেষে দেশব্যাপী বিপ্লবের বিজয় অর্জন করতে হবে। মাও জেতোং-এর সৃজনশীল মার্কসবাদী তত্ত্ব চীন বিপ্লব বিস্তারলাভের একটি নূতন সঠিক পথের নির্দেশ দিল।

বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির বিস্তারলাভ : ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস মস্কোতে অনুষ্ঠিত হল। চল্লিশ সহস্রাধিক পার্টি-সদস্যদের প্রতিনিধিরূপে ৮৪জন ডেলিগেট এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই কংগ্রেসে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগের অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্ত শিক্ষার সারমর্ম গৃহীত হল। বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরও চীনা সমাজ যে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবস্থাতেই ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী চীন বিপ্লব যে তখনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত তা পুনঃউল্লিখিত হল। এই কংগ্রেসে বলা হল যে, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ছিল দুই বিপ্লবী ঢেউ-এর অন্তর্বর্তী সময়ে ভাঁটা পড়ে যাবার ন্যায়। পার্টির সাধারণ কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হল যে, ঐ সময় আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ, অথবা উত্থান সংগঠিত করার উপযুক্ত সময় নয় ; আশু কর্তব্য হল জনগণের মন জয় করে আগত বিপ্লবের ঢেউকে স্বাগত জানান। এই কংগ্রেসে চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একটি দশ দফা কর্মসূচী গৃহীত হল।

১৯২৯ সালের বসন্তকালে, মাও জেতোং এবং চু তে-এর নেতৃত্বে চতুর্থ লাল ফৌজ বাহিনী দক্ষিণ-চিয়াংসি প্রদেশে প্রবেশ করল। সেখানে তাঁরা জনগণকে সংগঠিত করে গেরিলা যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন এবং দক্ষিণ-চিয়াংসি বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার উদ্ঘাটন করলেন। ঐ বছরের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চতুর্থ বাহিনী তিনবার ফুচিয়ান প্রদেশে প্রবেশ করে সেখানকার কুও তিরেন, তেং জিহুই, চাং তিংছেং-এর নেতৃত্বে পার্টি সংগঠন ও অভ্যুত্থানকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল এবং সম্মিলিতভাবে পশ্চিম ফুচিয়ান ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করল। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে, ফেং তেহুয়াই, তেং তাইইউয়ান এবং হুয়াং কোং-ল্যুয়ের নেতৃত্বে ফিংচিয়াং উত্থান হল, সংগঠিত হল পঞ্চম লাল ফৌজ বাহিনী

এবং স্থাপিত হল হুনান-হুপেই-চিয়াংসি ঘাঁটি এলাকা। ফাং চিমিন, শাও শিফিং এবং হুয়াং তাও (যাঁরা ১৯২৭ সালের শীতকালে ইইয়াং-হেংফেং উত্থান সংগঠিত করেছিলেন) ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে দশম লাল ফৌজ বাহিনী গঠন করলেন এবং ফুচিয়ান-চেচিয়াং-চিয়াংসি ঘাঁটি এলাকা স্থাপিত করলেন যা পরে মধ্য-বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাতে পরিণত হল। লাল ফৌজ বাহিনীসমূহকে একত্রিত করে প্রথম ফ্রণ্ট লাল ফৌজ বাহিনী গঠিত হল এবং তার সৈন্য সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজারের অধিক। এই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন চু তে এবং সাধারণ রাজনৈতিক কমিশার ছিলেন মাও জেতোং। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে উ কুয়াংহাও, ফান চোংরু, তাই খেমিন ও উ হুয়ান-সিয়ান-এর নেতৃত্বে হুয়াংআন — মাছেং উত্থানের সময় গঠিত গেরিলাবাহিনী এবং চৌ ওয়েইচিয়োং, ছি তেওয়েই এবং স্যু ছিশু-এর নেতৃত্বে শাংছেং — লিউ-আন উত্থানের সময় গঠিত গেরিলাবাহিনী ১৯২৯ সালে তিনটি পৃথক পৃথক লাল ফৌজ ডিভিসনে গঠিত হল এবং তারা যথাক্রমে পূর্ব হুপেই, পশ্চিম-আনহুই ও দক্ষিণ-হোনানে সক্রিয় ছিল। জেং চোংশেং এবং স্যু চিশেন-এর নেতৃত্বে এই এলাকাগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত করে হুপেই — হোনান — আনহুই ঘাঁটি-এলাকাতে পরিণত হল এবং ১৯৩০ সালের বসন্তকালে এইসব সৈন্য-বাহিনীকে প্রথম লাল ফৌজ বাহিনীতে সংগঠিত করা হল। এর পর, এই বাহিনী এবং মধ্য-হুপেই-এর পঞ্চদশ লাল ফৌজ মিলিত হয়ে চতুর্থ ফ্রণ্ট লাল ফৌজ বাহিনী গঠিত হল এবং তার প্রধান সেনাধ্যক্ষ হলেন স্যু সিয়াংছিয়ান। ১৯২৮ সালের বসন্তকালে, হো লোং, চৌ ইছুন, লু তোংশেং প্রভৃতি হুনান ও পশ্চিম-হুপেই-এর মধ্যবর্তী সীমান্তে এলেন এবং সেখানে অটল সংগ্রামে নিয়োজিত হো চিনচাই, তুয়ান তেছাং ও তুয়ান ইয়ুলিন-এর নেতৃত্বে গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁরা চতুর্থ লাল ফৌজ (পরে নাম দেওয়া হয় দ্বিতীয় লাল ফৌজ) ও ষষ্ঠ লাল ফৌজ স্থাপিত করলেন। এই দুটি বাহিনী হুনান-হুপেই সীমান্ত বরাবর ও হোং সরোবর অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে, এই দুটি বাহিনী কোংআনে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় লাল আর্মি-গ্রুপে পরিণত হল এবং হুনান-পশ্চিম হুপেই ঘাঁটিএলাকা স্থাপিত করল। এই আর্মি-গ্রুপের সেনা-ধ্যক্ষ ছিলেন হো লোং এবং চৌ ইছুন ছিলেন রাজনৈতিক কমিশার। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তেং সিয়াওফিং,

চাং ইয়ুনই, লি সিংরুই ও ইয়ু জুওইয়ু পার্টির দ্বারা প্রভাবিত সৈন্যবাহিনীকে এবং ওয়েই পাচুন-এর পরিচালনাধীন কৃষক বাহিনীকে কুয়াংসি প্রদেশের ইয়ৌচিয়াং নদীর উপকূলে অবস্থিত পোসে ও জুওচিয়াং নদীর উপকূলে অবস্থিত লোংচৌতে কয়েকটি অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিলেন। তাঁরা সপ্তম লাল ফৌজ এবং অষ্টম লাল ফৌজ গঠিত করে সেখানে শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯২৮ সালের বসন্তকালে, লিউ চিতান এবং সিয়ে জিছাং ওয়েইনান-হুয়াসিয়ান অভ্যুত্থান সংগঠিত করলেন এবং কুয়ানচোং ও উত্তর সেনসীতে গেরিলা যুদ্ধ চালনা করলেন। ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালের মধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি হুনান, চিয়াংসি, ফুচিয়ান, হুপেই, আনহুই, কুয়াংসি, কুয়াংতোং, হোনান এবং অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপিত করল। কিন্তু এই সব বিপ্লবী ঘাঁটির মূল কেন্দ্রস্থল ছিল চিয়াংসি প্রদেশ।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকেরা যে সব জেলাতে শ্রমিক ও কৃষক-দের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যে সব স্থানে লাল ফৌজ গিয়েছিল সে সব স্থানে উদ্যমের সঙ্গে ভূমি-সংস্কার বিপ্লব কার্যকরী করলেন। ভূমি-সংস্কার বিপ্লব পার্টি-সংগঠন এবং মাও জেতোং কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী পালিত হয়েছিল, যথা . ভাড়াটে কৃষক ও গরীব কৃষকদের ওপর নির্ভর করা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করা, ধনী কৃষকদের নিয়ন্ত্রনে আনা এবং জমিদারশ্রেণীকে উৎখাত করা। মাও জেতোং জমিদারদের ভূ-সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করে তা সব স্বল্পভূমিসম্পন্ন অথবা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু ধনী কৃষকদের বেঁচে থাকার একটি উপায় করা এবং সাধারণ জমিদারদের জীবনযাপনের উপায় রক্ষা করার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সুতরাং, যে সব এলাকায় ভূমি-সংস্কার বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সে সব এলাকায় সামন্ততান্ত্রিক কিম্বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়েছিল এবং এই শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘাঁটি এলাকাগুলি রক্ষা করেছিলেন এবং লাল ফৌজকে সমর্থন করেছিলেন। লাল অঞ্চলগুলি যে বহুদিন টিকে থাকতে পেরেছিল এবং লাল ফৌজ যে একের পর এক বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ ছিল কৃষক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্ব এবং ব্যাপক কৃষক জনতার সমর্থন-

লাভের ফলে চীনা শ্রমিক ও কৃষক লাল ফৌজ ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠল। ১৯৩০ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে তেরটি লাল ফৌজ বাহিনী গঠিত হল এবং এদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। লাল ফৌজ গঠনের নীতি ছিল যে, এই বাহিনী একমাত্র চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত হবে, সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে জনগণের সংগ্রামে ও বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপিত করতে তাদের সেবা করবে। এই বাহিনী হবে সামন্তসেনাধিপতিবাদ প্রবণতা ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রাম্যমান বিদ্রোহীদের অবলম্বিত পন্থাবিরোধী গণতান্ত্রিক বাহিনী। সামরিক কৌশল ও সামরিক পন্থা সম্বন্ধে লাল ফৌজের নীতি ছিল, সম্পূর্ণরূপে শত্রুপক্ষের দুর্বল দিকগুলির সুযোগ গ্রহণ এবং নিজেদের শক্তির প্রয়োগ করা, সম্পূর্ণরূপে জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করা ; গেরিলা যুদ্ধ এবং গেরিলা যুদ্ধের ধরণকে প্রাধান্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করা, সামরিক কৌশল হিসেবে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা যার উদ্দেশ্য হবে কম লোক নিয়ে বেশি লোককে পরাজিত করা ; আর সামরিক পন্থা হিসেবে যুদ্ধের সত্বর নিষ্পত্তির জন্য কম লোক নিয়ে বেশি লোককে পরাজিত করা যাতে শত্রুপক্ষকে কাবু করে নিজেকে শক্তিশালী করা যায়। যেহেতু চীনা শ্রমিক ও কৃষক লাল ফৌজ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিলিটারি কমিশন ও মাও জেতোং-এর সামরিক নীতিতে গঠিত হয়েছিল এবং যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সেহেতু এই বাহিনী ক্ষুদ্র ও দুর্বল অবস্থা থেকে বৃহৎ ও শক্তিশালী অবস্থাতে অগ্রগতি লাভ করল এবং অবশেষে একটি ধ্বংসাতীত, দুর্দম এবং সর্ববিজেতা ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনীতে পরিণত হল।

যে দ্রুতগতিতে লাল ফৌজ বিস্তারলাভ করছিল তা চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিশ্বাসঘাতক শাসনকে বিপন্ন করে তুলল। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে, চিয়াং চিয়েশির প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনী চিয়াংসির কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকার বিপক্ষে বড় বড় 'পরিবেষ্টন ও পর্যুদমন' অভিযান পাঠাতে শুরু করল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকার পার্টি সংগঠন এবং মাও জেতোং-এর পরিচালনায় শ্রমিক ও কৃষক লাল ফৌজ পরপর তিনবার এই ধরণের অভিযানকে চূর্ণ করল। এর ফলে, লাল ফৌজ শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি আরও বিস্তৃত হল।

১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে চিযাংসি প্রদেশের রুইচিন নামক স্থানে

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস (সোভিয়েত প্রতিনিধি সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হল। এই কংগ্রেসে একটি খসড়া সংবিধান, একটি শ্রম আইন, একটি ভূমিবিষয়ক আইন গৃহীত হল এবং লাল ফৌজ, অর্থনৈতিক নীতি, জাতিসত্তার প্রতি নীতি, শ্রমিক ও কৃষকদের বিচারালয় সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মাও জেতোং চীনা কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও কৃষক গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যনির্বাহক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত হলেন এবং চু তে লাল ফৌজের সর্বসেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। এইরূপে, চীনের লাল এলাকাগুলোর জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

জাপান কর্তৃক উত্তরপূর্ব চীন দখল এবং জাপ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম : ১৯২৯ সালের শেষার্ধে, পুঁজিবাদী দুনিয়া একটি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হল। একচেটিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের পন্থা অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি উৎপীড়ন তীব্রতর করল এবং তাদের উপনিবেশগুলিকে নতুন ক'রে ভাগ করে নেবার জন্য ও প্রভাব-বলয় বিস্তারের জন্য নিত্য নূতন যুদ্ধ শুরু করল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের "মহাদেশীয় নীতি" (প্রথমে উত্তরপূর্ব চীন ও মঙ্গোলিয়া এবং পরে সমগ্র চীন ও এশিয়া দখল করার নীতি) অনুসরণ করে উত্তরপূর্ব চীন দখল করার জন্য আগ্রাসন শুরু করল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ই তারিখে জাপ-সৈন্যবাহিনী শেনইয়াং-এর প্রতি এক আকস্মিক আক্রমণ শুরু করল। চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং "অপ্রতিরোধ" নীতি অবলম্বন করল। ফল-স্বরূপ, তিন মাসের মধ্যে উত্তরপূর্ব চীনের দু'মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার ভূমি এবং তিরিশ মিলিয়ন অধিক লোকসম্পন্ন লিয়াওনিং, চিলিন ও হেইলোংচিয়াং প্রদেশ তিনটি জাপানের হস্তগত হল। এর পরের বছর, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মাঞ্চুরিয়া নাম দিয়ে একটি পুতুল সরকার স্থাপিত করল।

জাপান কর্তৃক উত্তরপূর্ব চীন দখলের ফলে জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য একটি নূতন গণআন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক-কৃষক লাল ফৌজই সর্বপ্রথম জাপ-প্রতিরোধ ধ্বনি তুললেন। জনগণ এই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং জাপ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

দাবী জানালেন। প্রতিরোধ সংগ্রাম চালনার জন্য তাঁরা উত্তরপূর্ব চীনে জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলেন। শাংহাই, কুয়াংচৌ, হংকং এবং অন্যান্য স্থানে শ্রমিকেরা জাপ-বিরোধী ধর্মঘট পালন করলেন; সারাদেশে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাপানী পণ্যদ্রব্য বর্জন আন্দোলন শুরু করলেন। বহু নগর ও শহরের জনগণ জাপ-বিরোধী সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন।

জাপ-আগ্রাসন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্কে পরিবর্তন আনছিল। এ যাবৎ চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং-এর উপর নির্ভরশীল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী জাপানের বিরুদ্ধে 'অপ্রতিরোধ' নীতির জন্য কুওমিনতাং-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকল। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে, শাংহাই, পেইফিং, থিয়ানচিন এবং নানচিং-এর তিরিশ হাজার ছাত্র নানচিং-এ মিলিত হয়ে কুওমিনতাং কর্তৃক উত্তরপূর্ব চীন সমর্পণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল এবং জাপানকে রুখবার জন্য দাবী করল। কিন্তু চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং তাদের প্রতি দমন নীতি প্রয়োগ করল। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনায় দেশের সমাজের সর্বস্তরে ক্রোধের সঞ্চার হল।

জাপান কর্তৃক চীন আগ্রাসনে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তি সমূহ দুষ্কর্মে সহযোগীর ন্যায় ভূমিকা গ্রহণ করল। তারা 'সরেজমিনে তদন্ত' করার জন্য লীগ অফ নেশন্স-এর একটি কমিশন গঠন করালেন। এই 'তদন্ত' শেষ হবার পর কমিশন উত্তর-পূর্ব চীনকে 'আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধিকারে' রাখার সুপারিশ করল। বস্তুতঃ এই সুপারিশে জাপানকে উত্তরপূর্ব চীনে প্রাপ্ত সুবিধা ভোগ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার উৎসাহ দেওয়া হল। তখন সারা বিশ্বে স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র দেশ যা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে জাপ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করে।

এক ধাক্কায় চীনকে বশীভূত করার বাসনায় জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখে অতর্কিতে শাংহাই আক্রমণ করল। সারা দেশে জনগণের জাপ-বিরোধী মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শাংহাই-এ অবস্থিত ছাই থিংখাই-এর পরিচালিত ১৯ রুট বাহিনীর সৈন্যরা চিয়াং চিয়েশিকে উপেক্ষা করে শাংহাই-এর প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধ করল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি শাংহাংই-এর শ্রমিক এবং ছাত্রদের নিয়ে যুদ্ধের সম্মুখক্ষেত্রে যোগদান এবং সৈন্যদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করল। আত্ম-

রক্ষাকারীদের সমর্থনে শাংহাইবাসী এবং সারা দেশবাসী অর্থ দান করলেন। তা সব ১৯ রুট বাহিনীর খুব সহায়ক হল। এক মাস বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর শাংহাই প্রতিরোধকারীরা চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং-এর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যের জন্য পরাজিত হলেন।

শাংহাই-এর যুদ্ধে কুওমিনতাং কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার পর জাপান কর্তৃক উত্তরপূর্ব চীন দখলে যে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা সাময়িকভাবে প্রশমিত হল। তা সত্ত্বেও জাপ-বিরোধী আন্দোলন স্তব্ধ হল না। ১৯৩৩ সালের মে মাসে, তিনজন সামরিক অধিনায়ক ফেং ইয়ুসিয়াং, ফাং চেনউ এবং চি হোংছাং (কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য) চাংচিয়াখৌতে জাপ-বিরোধী ছাহার-সুইইউয়ান মিত্র-বাহিনী গঠন করলেন। তাঁরা তুওলুন, পাওছাং, কুইউয়ান এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থান পুনর্দখল করলেন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে, কুওমিনতাং-এর অভ্যন্তরে দেশভক্ত ব্যক্তিবিশেষ যাঁদের মধ্যে ছিলেন লি চিশেন, ছেন মিংশু ও ছাই থিংখাই ফুচিয়ানে জাপ-বিরোধী গণ-সরকার স্থাপিত করলেন এবং জাপানদের প্রতিরোধ ও চিয়াং চিয়েশির বিরোধিতায় লাল ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। কিন্তু, পরে জাপ-আক্রমণকারীদের সহযোগিতায় চিয়াং চিয়েশি তাদের দমন করল।

লাল ফৌজের লং মার্চ: ১৯৩২ সালের জুন মাসে, বিপ্লবী ঘাঁটিগুলিকে চতুর্থবারের মতো 'পরিবেষ্টন ও পর্যুদমন' করার জন্য চিয়াং চিয়েশি ৫০০,০০০ সৈন্য জড়ো করল। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে চিয়াং চিয়েশির আক্রমণকে চৌ এনলাই, চু তে এবং নিয়ে রোংচেন-এর পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে চূর্ণ করে দিল। জাতীয় সঙ্কট দিন দিন গুরুতর হতে থাকল এবং সম্মিলিতভাবে জাপ-আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্য সমস্ত সশস্ত্র শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসের ১৭ তারিখে শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার এবং লাল ফৌজ একটি ঘোষণা জারি করলেন। যে সব সৈন্যবাহিনী জাপানকে প্রতিহত করতে চায় ও লাল ফৌজের প্রতি আক্রমণ বন্ধ করতে চায় এবং জনগণকে অস্ত্রে সজ্জিত করতে প্রস্তুত ও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে চায় তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এই সরকার ইচ্ছুক বলে ঐ ঘোষণায় ব্যক্ত করা হল। ঐ ঘোষণা কুওমিন-তাং-এর একাংশ দেশভক্ত সামরিক নেতৃবৃন্দ যেমন ফেং ইয়ুসিয়াং, লি চিশেন

এবং ছেন মিংশু-এর আনুকূল্য লাভ করল। কিন্তু চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং আগের মতো জাপানের প্রতি দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আরও বিরাটাকারের 'পরিবেষ্টন ও পর্যুদমন' অভিযানের প্রস্তুতি করতে থাকল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী এবং ইতালির সহায়তায় ১৯৩৩-এর অক্টোবর মাসে চিয়াং চিয়েশি বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে তার পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও পর্যুদমন' অভিযান শুরু করল। যেহেতু তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃসংস্থার ছেন শাওইয়ু এবং ছিন পাংসিয়ান-এর নেতৃত্বে "বামপন্থীরা" মাও জেতোং পরিকল্পিত সামরিক লাইন উপেক্ষা করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষার সামরিক লাইন গ্রহণ করল ও অন্যান্য 'বাম' ভুল করল, সেহেতু লাল ফৌজ এক বছর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করা সত্ত্বেও শত্রুদের পরিবেষ্টন অভিযান চূর্ণ করতে অক্ষম হল। ঐ পরিস্থিতিতে, লাল ফৌজের পক্ষে কৌশলগত স্থানান্তরিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে লাল ফৌজের মূল বাহিনী চিয়াংসি বিপ্লবী ঘাঁটি ছেড়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বিখ্যাত লং মার্চ শুরু করল। সিয়াং ইং এবং ছেন ই'র নেতৃত্বে কয়েকটি গেরিলা ইউনিটকে ঐ অঞ্চলে শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য রাখা হল। বহু ক্লেশকর সংগ্রাম চালিয়ে এই ইউনিটগুলি বিপ্লবী শক্তি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হল এবং পরে তা নতুন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী গঠনের ভিত্তিতে পরিণত হল।

লং মার্চের লাল ফৌজ কুয়াংতোং, হুনান এবং কুয়াংসি অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ-এর জুন-ই নামক স্থানে পৌঁছল। সেখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর বর্ধিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত করল। এই সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মাও জেতোং যুদ্ধকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করে 'বাম' ভুল পথের অনুসরণকারী কমরেডদের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়ে তাঁদের সঠিক পথে আনলেন। সম্মেলনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ভুল "বামপন্থী" লাইন সংশোধিত করে মাও জেতোং উত্থাপিত সঠিক নীতি অনুমোদিত হল, মাও জেতোং, চৌ এনলাই এবং ওয়াং চিয়াসিয়াং এই তিন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সামরিক পরিচালনা গ্রুপ নির্বাচিত হল এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাও জেতোং-এর নেতৃত্ব পদ প্রতিষ্ঠিত হল।

জুন-ই সম্মেলনে জাপানীদের প্রতিরোধ করতে আরও উত্তরে যাবার সিদ্ধান্ত

নেওয়া হল। ইয়ুন্নান প্রদেশ অতিক্রম করে এবং সিচুয়ান ও সিপাং প্রদেশ দুটির মধ্যবর্তী সীমান্ত প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ জুন মাসে উত্তরপশ্চিম সিচুয়ানের মাওকোং নামক স্থানে পেঁৗছল। সেখানে এই লাল ফৌজ সিচুয়ান-সেনসী বিপ্লবী ঘাঁটি থেকে পশ্চাদপসরণকারী চতুর্থ ফ্রণ্ট লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হল। এই দুটি ফৌজ একসঙ্গে আরও উত্তর দিকে যাত্রা করল এবং বিরাট তুষারাবৃত পাহাড় অতিক্রম করে সোংফানের নিকটবর্তী মাওএরকাই নামক স্থানে পেঁৗছল। সেখানে, মাও জেতোং পার্টি ও লাল ফৌজকে চাং কুওথাও কর্তৃক পার্টি ও লাল ফৌজের অভ্যন্তরে বিচ্ছেদ ঘটাবার ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন এবং কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ পুনরায় উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করল। বহু বাধা অতিক্রম করে, জলাভূমি পেরিয়ে এবং কানসু ও সেনসী প্রদেশ দুটির মধ্য দিয়ে কঠিন ও ক্লেশকর যুদ্ধ করতে করতে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে এই ফৌজ উত্তর সেনসীর বিপ্লবী ঘাঁটিতে পেঁৗছল এবং সেখানকার লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হল। আর এইভাবে মানব ইতিহাসে নজিরহীন ২৫,০০০ লি লং মার্চের সমাপ্তি হল। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে, হো লোং, রেন পিশি, কুয়ান সিয়াংইং এবং সিয়াও খে পরিচালনাধীন দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ফ্রণ্ট লাল ফৌজ দুটির এক অংশও কেন্দ্রীয় লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হতে উত্তর সেনসীতে পেঁৗছল।

লাল ফৌজের মূল বাহিনীর লং মার্চ এগারটি প্রদেশ এবং ২৫,০০০ লি (পৌনে আট হাজার মাইল) পথ অতিক্রম করতে ঠিক এক বছর সময় নিয়েছিল। লং মার্চের সময়ে লাল ফৌজ কুওমিনতাং-এর কয়েক লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট ৪১১টি রেজি-মেণ্টকে পরাজিত করেছিল, তাদের পরিবেষ্টন, প্রতিবন্ধক, নিশ্চিহ্ন ও পরাজিত করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। লাল ফৌজের সৈনিকেরা পাঁচটি পর্বত-মালা এবং উমেং-এর উচ্চ পাহাড় ও খাড়া পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করেছিলেন। তাঁরা উচিয়াং, চিনশা, তাতু নদীর মতো প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করেছিলেন, সারা বছরে তুষারাবৃত বিরাট পর্বতমালা আরোহণ করেছিলেন; জনমনুষ্যহীন লাজ্ঞি বিশাল জলাভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিলেন এবং বিপজ্জনক গিরিপথ ভেদ করেছিলেন। মানুষের ধারণাতীত কঠিন ও ক্লেশকর অবস্থা অতিক্রম করে এবং যাত্রাপথে জনগণের, বিশেষ করে মিয়াও, ই ও তিব্বতী জাতিসত্তার অমূল্য সমর্থন লাভ করে লাল ফৌজ বিজয়ের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক

উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছিল। লং মার্চের বিজয়মণ্ডিত সমাপ্তিতে প্রমাণিত হল যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা গণফৌজ ছিল অপরাজেয়। এই মার্চ লাল ফৌজের মুখ্য শক্তি এবং পার্টির ক্যাডারদের ইস্পাতের মতো শক্ত করে দিল। সারাদেশের জনগণ তাতে উদ্দীপিত হল এবং দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনে এক নূতন ঢেউ এল।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের শুরু: তৎকালীন চীনদেশের চারটি প্রতিপত্তিশালী পরিবার — চিয়াং চিয়েশি, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ তাঁর আত্মীয় সোং জিওয়েন ((T.V. Soong) পরিবার, খোং সিয়াংসি ((H.H. Kung)) পরিবার, চিয়াং চিয়েশির দুই বিশ্বস্ত সঙ্গী ছেন কুওফু, ছেন লিফু'র পরিবার — তাদের রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে কুওমিনতাং শাসিত অঞ্চলের জনগণের রক্ত ও ঘর্মমিশ্রিত শ্রমকে শোষিত করে নিজেদের পরিপুষ্ট করে চলেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই চারটি পরিবার ইংরেজ ও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের সাহায্যে আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদী শাসন কায়েম করল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বিরাট একটি ফ্যাসিস্ট গুপ্তপুলিশ বাহিনী গঠন করল এবং সর্বপ্রকার জাপ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার জন্য ফ্যাসিস্ট ধরণের পুলিশ-সন্ত্রাসবাদ চালু করল। জাপ-আক্রমণকারীদের সঙ্গে আচরণে তারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ সুবিধা প্রদান নীতি মান্য করে চলল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে, তারা "থাংকু চুক্তি" স্বাক্ষরিত করে কার্যতঃ উত্তরপূর্ব চীনের লিয়াওনিং, চিলিন, হেইলোংচিয়াং এবং রেহো-এর উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করে নিল। দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের মে মাসে, তারা "হো-উমেজু চুক্তি" স্বাক্ষরিত করে প্রকৃতপক্ষে উত্তর-চীনের উপর জাপ-আক্রমণকারীদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নিল। চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং কর্তৃক চীনের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জাতীয় সঙ্কট আগের চেয়ে আরও গুরুতর আকার ধারণ করল। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে জাপ-আক্রমণকারী-দের প্ররোচনায় চীনের বিশ্বাসঘাতকদের দল "পূর্ব হোপেই ঘটনা" সৃষ্টি করল এবং ঐ অঞ্চলের ২২টি কাউন্টিতে ক্রীড়নক রাজনৈতিক শাসন স্থাপিত করল। ঐ সঙ্গে সমগ্র উত্তর-চীনে আক্রমণাত্মক প্রভাব বিস্তারের জন্য জাপানীরা উত্তর চীনে ভুয়া "স্বায়ত্তশাসন" আন্দোলন শুরু করল।

জাতির অবলুপ্তির সঙ্কটে চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার বামপন্থীদের

মনে জাপ-বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠল। কুওমিনতাং শিবিরেও জাপানের বিরোধিতা না আত্মসমর্পণ এই প্রশ্নে মতান্তর দেখা দিল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণের মুখে দেশে শ্রেণীসম্পর্কে নতুন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবং ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি অনুসারে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট "জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জাতীয় মুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট আবেদন" প্রচারিত করল। এই আবেদনে গৃহযুদ্ধ পরিহার করে একযোগে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তাব দেওয়া হল। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তাব" গ্রহণ করলেন। এই প্রস্তাবে পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের নীতি অনুমোদিত হল। মাও জেতোং-এর "জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন সম্পর্কে" শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হল। এই রিপোর্টে তিনি সুসম্বদ্ধভাবে পার্টির নূতন নীতি ব্যাখ্যা করলেন।

চীনের বিভিন্ন শ্রেণী এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের জাতীয় মুক্তি ও বেঁচে থাকার দাবী ছাত্রদের ৯ই ডিসেম্বরের দেশাত্মবোধক আন্দোলনে ব্যক্ত হল। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে এবং নেতৃত্বে পেইচিং-এর ছাত্রছাত্রীরা একটি বিরাট শোভাযাত্রা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। তাঁরা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ আর জাতির মুক্তির জন্য আহ্বান জানালেন এবং কমিউনিস্টবিরোধী গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করতে দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আরও বড় আকারের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল। এই দুটি বিক্ষোভ প্রদর্শন সারাদেশে সাড়া জাগাল এবং জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করল। হাংচৌ, থিয়ানচিন, শাংহাই এবং অন্যান্য শহরের ছাত্র, শ্রমিক ও নাগরিকগণ অনুরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। এই সব আন্দোলনের ফলে শাংহাই এবং অন্যান্য শহরে জাতীয় মুক্তি সমিতি নামে সংগঠন স্থাপিত হল। জাপ-প্রতিরোধ আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থনে রাতারাতি নানাবিধ সাময়িক পত্রিকা, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র মুদ্রিত হতে থাকল। জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিস্তার লাভ এবং গভীরতা পরবর্তীকালের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের গণভিত্তি প্রস্তুত করল।

উত্তরপূর্ব চীন পতনের পর, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উত্তরপূর্ব জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর দ্রুত বিস্তার লাভ হল। ১৯৩৪ সালে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুসারে উত্তরপূর্ব চীনের জাপ-বিরোধী বিভিন্ন সশস্ত্রবাহিনীকে যুক্ত করে সাতটি ইউনিটকে পুনর্গঠিত করে "উত্তরপূর্ব সম্মিলিত জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনী" নাম দেওয়া হল। ১৯৩৫ সালে, এই সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করে এগারোটি বাহিনী এবং একটি স্বাধীন ডিভিসনে বিভক্ত করা হল। ১৯৩৬সালে, বিভিন্ন বাহিনীকে তিনটি ফ্রণ্টে গেরিলা যুদ্ধ চালনার জন্য পুনর্গঠিত করা হল। 'উত্তরপূর্ব সম্মিলিত জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনী' জাপ-হানাদারদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে অতি ক্লেশকর পরিস্থিতির মধ্যে বীরত্বের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রাম চালাল। উত্তরপূর্ব চীনের জনগণ সর্বতোভাবে এবং সর্বপ্রকার বিপদ মাথায় নিয়ে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামকে সাহায্য করলেন। তাঁরা সম্মিলিত বাহিনীর ওপর এবং তার সর্ববরেণ্য নেতা ইয়াং চিনইয়ু ও লি হোংকুয়াং-এর ওপর আশা রেখেছিলেন। উত্তরপূর্ব সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী সারাদেশের জনগণের জাপ-বিরোধী মনোভাবকে অনুপ্রাণিত এবং উদ্দীপিত করল।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের জন্য আহ্বান এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিস্তারের ফলে কুওমিনতাং সেনাবাহিনীর এক অংশ খুব প্রভাবিত হল। ১৯৩৬ সালের শুরুতে, চাং স্যুয়েলিয়াং-এর অধীনে কুওমিনতাঙের উত্তরপূর্ব সৈন্যবাহিনী এবং ইয়াং হুচেং-এর অধীনে সপ্তদশ রুট বাহিনী যারা চিয়াং চিয়েশি কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম চীনে "কমিউনিস্ট দমনের" জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা ইয়ানআনে চৌ এনলাই এবং চাং স্যুয়েলিয়াং-এর মধ্যে আলোচনার পর লাল ফৌজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রায় বন্ধ করল। জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ভিত্তিতে চাং এবং ইয়াং লাল ফৌজের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপিত করলেন। ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে তাঁরা লাল ফৌজকে আক্রমণ করার জন্য চিয়াং চিয়েশির আদেশ পালন করতে অগ্রাহ্য করলেন এবং ঐ সময়ে সিআনে অবস্থানরত চিয়াং চিয়েশিকে অতর্কিতে বন্দী করে তার নিকট আট দফা দাবী পেশ করলেন। এই দাবীতে চিয়াংকে গৃহযুদ্ধ বন্ধ এবং জাপানদের প্রতিরোধ করার জন্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা মান্য করার কথা উল্লিখিত হল। গুরুতর জাতীয় সঙ্কটের কথা মনে রেখে

কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং চিয়েশি কর্তৃক জাতীয় সংহতি এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মেনে নেবার শর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই ঘটনা সমাধানের পক্ষে মত ব্যক্ত করল। এই উদ্দেশ্য নিয়ে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চৌ এনলাই, ছিন পাং-সিয়ান এবং ইয়ে চিয়ানইংকে প্রতিনিধিরূপে সিআনে পাঠালেন। চিয়াং চিয়েশি বাধ্য হয়ে আট দফা দাবী মেনে নিলে তাকে মুক্ত করা হল। এই ঘটনা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সারাদেশের জনগণের সমর্থন লাভ করল।

"সিআন ঘটনা" তৎকালীন ইতিহাসে একটি নূতন মোড় এনে দিল। এক দশকের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি বস্তুতঃ শেষ হল এবং শুরু হল আভ্যন্তরীণ শান্তি ও জাপবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর চীন এবং জাপানের মধ্যকার জাতীয় দ্বন্দ্ব হল মুখ্য এবং চীনা জনগণ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব আর চীনদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব অধিকার করল গৌণ স্থান। জাপান কর্তৃক উত্তর-চীন আক্রমণ এবং সমগ্র চীনকে অধিকারভুক্ত করার বিপদের লক্ষণে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ-হানি হবার উপক্রম হলে এই দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চাইল চীন জাপানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করুক। এতে চিয়াং চিয়েশির প্রতি-নিধিত্বে ব্রিটিশ ও আমেরিকাপন্থী বুর্জোয়াশ্রেণীর জাপানের প্রতি মনোভাব পরিবর্তন হল। শক্তিশালী জনমতের চাপে পড়ে তারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হল। এইরূপে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আহূত জাপবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হল। এই যুক্তফ্রণ্টে ব্রিটিশ ও আমেরিকাপন্থী বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীও সামিল হল। ১৯৩৭ সালের বসন্তকালে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি "আভ্যন্তরীণ শান্তি, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং জাপবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম" বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য একটি নূতন কর্মসূচী পেশ করল।

মাও জেতোং ঐ সময়ে কয়েকটি অনবদ্য তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর রচিত "চীন বিপ্লবের যুদ্ধে কৌশলগত সমস্যা" এবং ১৯৩৭ সালে রচিত দার্শনিক প্রবন্ধ "অনুশীলন সম্পর্কে" ও "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" তত্ত্বের দিক থেকে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞ-তার সারসংকলন ও বিশ্লেষণ করলেন। আর তা ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী মতাদর্শ এবং সামরিক লাইনের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা জনগণ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী মহান বিপ্লবী কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এই দশ বছরে অগণিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, পার্টি-বহির্ভূত বিপ্লবী এবং বিপ্লবী জনতা যে ত্যাগ স্বীকার করলেন তার জয়গাথা সকলকে সব যুগে অনুপ্রাণিত করবে। এই দশ বছরে চীনা জনগণ অমূল্য অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ চালনা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে মাও জেতোং-এর তত্ত্ব অনুযায়ী চীন বিপ্লবের অনুশীলনের সমন্বয়ের কাজও প্রভূত অগ্রগতি লাভ করল। দশ বছরের ক্লেশকর সংগ্রামের মধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং ক্যাডাররাও নিজেদের পোড় খাইয়ে নিলেন, শক্তিশালী শ্রমিক-কৃষক লালফৌজকে বাঁচিয়ে রাখলেন এবং রক্ষা করলেন সেনসী-কানসু-নিংসিয়া বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল। এই সব ছিল বিপ্লবী কার্যসাধনের মূল ভিত্তি-স্তম্ভ যা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে জয় অর্জনের জন্য সংগঠনতৈরী করাকে সম্ভবপর করে তুলল।

৩. জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ
(জুলাই, ১৯৩৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বদান: ১৯৩৩ সাল থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মন্দাভাবের পরিস্থিতি উদ্ভব হবার পর ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ঐ সব দেশগুলি পুনরায় একটি নতুন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হল। ঐ সময়ে, জার্মানি, জাপান ও ইতালি ফ্যাসিস্ট দেশগুলি উন্মাদের ন্যায় শুরু করল তাদের আগ্রাসী যুদ্ধের বিস্তার। চীনকে উপনিবেশে পরিণত করে একচেটিয়া শোষণের জন্যে ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপ-সাম্রাজ্যবাদী পেইচিং শহরের দক্ষিণ-উপকণ্ঠে অবস্থিত লুকৌছিয়াও সেতুর নিকটে শুরু করল প্রবল আক্রমণ। স্থানীয় চীনা সৈন্যবাহিনী সাহসের সঙ্গে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করল। এই ঘটনার পরের দিন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি

সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্যে সারা জাতির উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণাপত্র প্রচারিত করল। অনেক গড়িমসি এবং ইতস্ততঃ করার পর, ব্রিটিশ ও মার্কিনপন্থী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত চিয়াং চিয়েশির কুওমিনতাং পার্টি অবশেষে জনমতের চাপে এবং জাপ-আক্রমণে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ এবং চার বৃহৎ পরিবারের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার ফলে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হল। ঐ বছরের আগষ্ট মাসে সেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের লাল ফৌজের মূল বাহিনী অষ্টমরুট বাহিনীতে পরিণত হল এবং তার সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল ৪৫,০০০। চু তে হলেন এই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ, ফেং তেহুয়াই উপ-সেনাধ্যক্ষ, ইয়ে চিয়ানইং চীফ-অফ-স্টাফ, জুও ছুয়ান ডেপুটি চীফ-অফ-স্টাফ, এবং রেন পিশি হলেন সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের ডিরেক্টর। এই বাহিনীর অধীনে ছিল তিনটি ডিভিসন: ১১৫ নং ডিভিসনের কম্যাণ্ডার ছিলেন লিন পিয়াও, নিয়ে রোংচেন ছিলেন রাজনৈতিক কমিশার ও ডেপুটি কম্যাণ্ডার; ১২০ নং ডিভিসনের কম্যাণ্ডার ছিলেন হো লোং, আর কুয়ান সিয়াংইং এবং সিয়াও খে হলেন যথাক্রমে রাজনৈতিক কমিশার ও ডেপুটি কম্যাণ্ডার; ১২৯ নং ডিভিসনের কম্যাণ্ডার ছিলেন লিউ পোছেং আর তেং সিয়াওফিং এবং স্যু সিয়াংছিয়ান ছিলেন যথাক্রমে রাজনৈতিক কমিশার ও ডেপুটি কম্যাণ্ডার। এই বাহিনী উত্তর-চীনের জাপ-বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল। সেপ্টেম্বর মাসে, কুওমিনতাং এবং কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার কথা পুনরায় ঘোষণা করল। তারপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ও নেতৃত্বাধীনে জাপ-আক্রমণবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণ-চীনে অবস্থিত লাল ফৌজের গেরিলাবাহিনী নয়া চতুর্থ বাহিনীতে পরিণত হল এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মধ্য-চীনের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল। এই বাহিনীর কম্যাণ্ডার ছিলেন ইয়ে থিং, রাজনৈতিক কমিশার ও ডেপুটি কম্যাণ্ডার ছিলেন সিয়াং ইং, চাং ইয়ুনই ছিলেন চীফ-অফ-স্টাফ, চৌ জিখুন ছিলেন ডেপুটি চীফ-অফ-স্টাফ, ইউয়ান কুওফিং ছিলেন রাজনৈতিক বিভাগের ডিরেক্টর এবং তেং জিহুই ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর। নয়া চতুর্থ বাহিনীর অধীনে ছিল চারটি ডিট্যাচমেণ্ট: ১নং ডিট্যাচমেণ্টের কম্যাণ্ডার ছিলেন ছেন ই; ২নং ডিট্যাচমেণ্টের কম্যাণ্ডার ছিলেন থান চেনলিন; ৩নং

ডিট্যাচমেণ্টের কম্যাণ্ডার ছিলেন চাং ইয়ুনই এবং ৪নং ডিট্যাচমেণ্টের কম্যাণ্ডার ছিলেন কাও চিংথিং।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হবার পর, প্রতিরোধী শিবিরে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব থাকার দরুন দুটি ভিন্ন ধরনের মতবাদও দেখা দিল। একটি শক্তি ছিল চার বৃহৎ পরিবারের নেতৃত্বাধীন বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়া যারা নিজেদের এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করত এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের লাইন অবলম্বন করে জাপানের সঙ্গে আপোষ করতে প্রস্তুত ছিল। অন্য শক্তি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সর্বহারাশ্রেণী এবং ব্যাপক-তম জনগণ যারা গ্রহণ করেছিল জনযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ণ বিজয় অর্জন করার লাইন। সুতরাং ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের ২৩ তারিখে প্রকাশিত "জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের নীতি, পন্থা ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে মাও জেতোং উল্লেখ করলেন যে, জাপ-প্রতিরোধ যুদ্ধে আছে দু ধরনের নীতি, দুটি পন্থা এবং দুই ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ এক ধরনের নীতি হল প্রতিরোধ যুদ্ধে অটল থাকা, পন্থা হল বৃহত্তর জনতার ওপর নির্ভর করা, আর তাব ভবিষ্যৎ হল মুক্তি অর্জন ; এবং এর বিপরীত নীতি হল আপোষ ও সুবিধা প্রদান, আর জনতার ওপর নির্ভর না করলে ভবিষ্যৎ ফল হবে দাসত্ব বরণ ও পশুর মতো জীবন ভোগ। মাও জে-তোং সারাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন শেষোক্ত সম্ভাবনার প্রতিরোধ করে প্রথমোক্ত নীতির জন্যে সংগ্রাম করে জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জনকে ফলপ্রসূ করতে। আগস্ট মাসের ২৫ তারিখে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম ধরনের নীতিকে তার "জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তির দশ দফা কর্মসূচী"র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করল। এই কর্মসূচী জনগণের জন্য নির্ধারিত করল একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং বিজয় অর্জনের জন্যে সংগ্রামের একমাত্র সম্ভাব্য পথ।

চিয়াং চিয়েশি গোষ্ঠীর জন-বিরোধী নীতির জন্য, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম ছমাসে কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনী একের পর এক পরাজয় বরণ করতে থাকল। ১৯৩৭ সালের শেষে, উত্তর চীনে অবস্থিত এই বাহিনী পেইচিং এবং থিয়ানচিন ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে পীতনদীর নিকটবর্তী স্থানে পলায়ন করল। ঐ একই সময়ে মধ্যচীনে অবস্থিত কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনী শাংহাই এবং নানচিং থেকে পশ্চাদপসরণ করে পশ্চিম দিকে উহান অভিমুখে

যাত্রা করল। ডিসেম্বর মাসে, দোদুল্যমান চিয়াং চিয়েশি চক্র জার্মানির রাষ্ট্রদূতের মধ্যস্থতায় জাপানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল। কিন্তু, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক কোনরূপ আপোষ অথবা আত্মসমর্পণের প্রবল বিরোধিতা এবং তার সঙ্গে জনগণের ক্রমবর্ধমান জাপ-বিরোধী মনোভাবের জন্যে আপোষের চক্রান্ত ব্যর্থ হল।

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতিতে প্রকট হল দুই প্রকার দৃশ্য। শত্রুসেনারা এগিয়ে আসবার আগেই কুওমিনতাং সৈন্যরা বিলীন হয়ে গেল, আর জনযুদ্ধের নীতিতে পরিচালিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অষ্টমরুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী উত্তর ও মধ্যচীনের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করে একের পর এক বিজয় অর্জন করল। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্টমরুট বাহিনী শানসী প্রদেশের ফিংসিংকুয়ান গিরিপথে অধিক বলশালী ইতাগাকি ডিভিসনের তিন হাজারের অধিক সৈন্যকে নির্মূল করল। এই বিজয় দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে অসীম উৎসাহিত করল। অষ্টমরুট বাহিনী এবং নয়া চতুর্থ বাহিনী সর্বত্রই শত্রুদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় আক্রমণ করে চলল। তারা জনগণকে সংগঠিত করল এবং গেরিলা যুদ্ধ প্রসারিত করে শানসী, ছাহার, হোপেই, সুইইউয়ান, শানতোং, হোনান, আনহুই এবং চিয়াংসু প্রদেশসমূহের শত্রু-সেনার পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় পরপর বহু জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি স্থাপিত করল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ঘাঁটিতে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী শ্রেণীদের মিলনে গণপ্রশাসনিক সংগঠন গঠিত হল। জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তাদের ব্যাপকভাবে অস্ত্রে সজ্জিত করা হল। জমির কর হ্রাস এবং নিম্ন সুদের হার গ্রহণের নীতি অবলম্বন করা হল ও তাতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল। এই সব পন্থা জনগণকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করল। এইভাবে শত্রুদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় সংগ্রাম জাপ-আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করল। যুদ্ধের প্রথম বছরে, শত্রুদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় ৩০০,০০০ জাপ-আক্রমণকারী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করা হল।

তৎকালীন কুওমিনতাং শিবিরে প্রচলিত দুটি ভ্রান্তিপূর্ণ চিন্তা যথা "জাতির বিনাশ তত্ত্ব" এবং "দ্রুত বিজয় অর্জন তত্ত্ব"ঃ খণ্ডন করতে, প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নীতি ব্যাখ্যা করতে, সারাদেশের

জনগণকে দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার মনোভাবকে চালিত করতে, ১৯৩৮ সালের মে মাসে মাও জেতোং "দীর্ঘকালীন যুদ্ধ সম্পর্কে" শীর্ষক এক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। শত্রুপক্ষ এবং চীনা জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি উল্লেখ করলেন যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী, তথাপি চীনা জনগণের প্রচেষ্টার ফলে তাদের চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন যে, এই যুদ্ধ তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হবে, যথা কৌশলগত প্রতিরক্ষার পর্যায়, কৌশলগত অচলাবস্থার পর্যায়, আর কৌশলগত প্রতি-আক্রমণের পর্যায়। এই প্রবন্ধে মাও জেতোং জনগণের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে সামরিক পরিচালনার সব নীতির ব্যাখ্যা করলেন এবং বিশেষ করে জনগণের বিজয় অজন করার জন্য প্রতিরোধ যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার চমকপ্রদ কৌশল ও নীতির সূত্র দিলেন। এই অনবদ্য তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ পরবর্তী সময়ে জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে ইয়ানআনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহূত হল। এই অধিবেশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে 'দীর্ঘকালীন যুদ্ধ' প্রবন্ধে মাও জেতোং যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই হবে দীর্ঘকালীন প্রতিরোধ যুদ্ধের পথনির্দেশক নীতি। সেই সঙ্গে ঐ অধিবেশন ওয়াং মিং (ছেন শাওইয়ু) এবং পার্টির অন্য ক'জন সভ্য কর্তৃক অনুসৃত কুও-মিনতাং-এর প্রতি আত্মসমর্পণের নীতির সমালোচনা করল ; এবং পুনরায় ঘোষণা করল যে, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে প্রলেতারিয়েত স্বাধীনভাবে কাজ করবার নীতি অবলম্বন করবে, জাতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করে চলবে। ঐ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, পার্টি প্রধানতঃ যুদ্ধাঞ্চলে এবং শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় নিজের ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রীভূত করবে এবং জাপানের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে সংগঠিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষার্ধে, জাপ-আক্রমণকারীরা কুয়াংচৌ এবং উহান অধিকার করলে কুওমিনতাং-এর সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূখণ্ডের পাহাড়ী অঞ্চলে পেঁছিল এবং ছোংছিং হল তাদের কেন্দ্রস্থল। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন অষ্টমরুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী সংখ্যায়

এবং বলে ক্রমশঃ শক্তিশালী হওয়ার ফলে এবং শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় জাপ-বিরোধী বহু ঘাঁটি স্থাপিত হওয়াতে জাপানীদের অবস্থা খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠল। অতঃপর তারা কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীর প্রতি আক্রমণ বন্ধ করল আর তখন তাদের আক্রমণের মুখ্য লক্ষ্য হল উত্তর-চীন ও মধ্য-চীনের অষ্টমরুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী। এইভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সূচিত হল এক বিরাট পরিবর্তন। তখন থেকে শত্রুদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকাই হল প্রধান রঙ্গভূমি। আর এই সব প্রাঙ্গণে শুরু হল তীব্র যুদ্ধ, দীর্ঘকাল ধরে চলল শত্রু ও আমাদের মধ্যে মরণ-পণ ক্লেশকর অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ। আর অন্য দিকে জাপান ও কুওমিনতাং-এর মধ্যে যুদ্ধ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াই ছাড়া একপ্রকার বন্ধই ছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে অচলাবস্থার সৃষ্টি হল।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য; ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের সঙ্গে আপোষ করতে কুওমিনতাং-কে প্রলুব্ধ করার অপচেষ্টা: জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলে, স্টালিন-এর নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র বিদেশী রাষ্ট্র যে চীনকে এই যুদ্ধে সত্যিকারের সাহায্য করল। ১৯৩৭ সালের ২১ শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল "চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক অনাক্রমণাত্মক চুক্তি" এবং তাতে ব্যক্ত হল এক শক্তিশালী বন্ধুতুল্য সমর্থনের আশ্বাস। চীনকে সাহায্য হিসেবে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ এবং সামরিক অস্ত্রদানের মোট মূল্য ছিল ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ কর্তৃক ঋণের প্রায় পাঁচগুণ।

সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ক্লেশকর দিনগুলিতে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই চীনকে সাহায্য করেছিল।

ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা হল "পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘেদের মধ্যে লড়াই দেখা"র নীতি। যাতে দুটি 'বাঘ' চীনা জনগণ এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদী লড়াই করে যেতে পারে তারই জন্য তারা নামমাত্র সাহায্য দিয়েছিল। তারা এই লড়াইয়ে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল এবং সমরাস্ত্র বিক্রয় করে তা থেকে প্রচুর লাভ তুলে নিল। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পেট্রল, এরোপ্লেন, তাম্র, লৌহ, এবং ইস্পাতের অধিকাংশই সরবরাহ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৩৮ সালে জাপান কর্তৃক

ব্যবহৃত সামরিক উপকরণের শতকরা বিরানব্বই অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছিল। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল যে, চীন ও জাপান উভয়ই যুদ্ধে হৃতসর্বস্ব হলে তারা চীনকে জাপানের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য বাধ্য করবে এবং তারপর জাপানকে বাধ্য করবে কিছু সুবিধা ছেড়ে দিতে। এ ভাবেই তারা বিনাক্লেশে সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে।

১৯৩৮ সালের শীতকাল থেকে ১৯৩৯ সালের বসন্তকালের মধ্যে বিদেশী সংবাদসংস্থাসমূহ বহুবার যে সংবাদ পরিবেশন করেছিল তাতে বলা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীন ও জাপানের মধ্যে সংঘর্ষের 'সালিসি' করবার জন্য তথাকথিত "আন্তর্জাতিক প্রশান্ত মহাসাগর সম্মেলন" আহ্বানের প্রস্তুতি করছে। চীনে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার আর্চিবল্ড ক্লার্ক 'সালিশির' কার্যোপলক্ষে ঘন ঘন হংকং, চোংছিং এবং শাংহাই-এর মধ্যে যাতায়াত করলেন। অতঃপর, যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কুওমিনতাং-এর প্রতি জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন হল। যে সামরিক আক্রমণ ছিল তাদের নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তা তখন গৌণ স্থান অধিকার করল। তারা আত্মসমর্পণের জন্য চিয়াং চিয়েশির ওপর রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি করল। চিয়াং চিয়েশিকে প্রলুব্ধ করে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার অসৎ উদ্দেশ্যে জাপান সরকার পরপর কয়েকটি ঘোষণা জারী করল। এইসব ঘোষণা কুওমিনতাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের আপোষকামী শক্তি এবং আত্মসমর্পণকারীদের বেশ জোরদার করল।

প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অবিচল সংগ্রাম ও কুওমিনতাং কর্তৃক তিনবার কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণের প্রতিরোধ : আলোচ্য সময়ে, কুওমিনতাং শাসকচক্রের আত্মসমর্পণকারী কার্যকলাপের সবচেয়ে বৃহৎ অন্তরায় ছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী শক্তিসমূহ। কুওমিনতাং শাসকচক্র প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতি নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করল এবং ফলাফল দেখবার জন্য নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিল। প্রকৃতপক্ষে তারা আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি করছিল এবং কমিউনিস্ট ও জনগণের বিরুদ্ধে মুখ্য শক্তি কেন্দ্রীভূত করার অভিসন্ধি করছিল। ১৯৩৯ সালের ৭ই জুলাই, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঘোষণাপত্র জারী করল। তাতে সারাদেশের জনসাধারণকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অটল থাকতে ও আত্মসমর্পণের বিরোধিতা করতে, ঐক্যের দাবীতে অবিচল থাকতে ও বিভেদ সৃষ্টির বিরোধিতা করতে, অগ্রগতিতে অবিচল থাকতে ও

প্রতীপগতির বিরোধিতা করতে আহ্বান জানান হল।

১৯৩৯ সালের শীতকালে এবং ১৯৪০ সালের বসন্তে কুওমিনতাং-এর সৈন্য-বাহিনী সেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও শানসী প্রদেশে জাপ-বিরাধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের যুগে এই ছিল কমিউনিস্ট-বিরোধী সর্বপ্রথম আক্রমণ। এই ঘাঁটিগুলির সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক জনতা প্রতি-আক্রমণ করে হানাদারদের মোকাবিলা করলেন। তাঁরা অনুসরণ করলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি: "প্রগতিশীল শক্তির সম্প্রসারণ করা, মধ্যবর্তী শক্তিদের জয় করা এবং একগুঁয়েমীদের বিচ্ছিন্ন করা"; এবং "আক্রমণিত না হলে আমরা আক্রমণ করব না, আক্রমণিত হলে অবশ্যই প্রতি-আক্রমণ করব" এই আত্মরক্ষার নীতিতে অবিচল থাকা; এবং 'ন্যায়, হিতকর ও সংযম' নীতি অবলম্বন করে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কমিউনিস্ট-বিরোধী এই সর্বপ্রথম আক্রমণ প্রতিহত করা হল এবং আত্মসমর্পণের বিপদ সাময়িকভাবে অতিক্রম করা গেল।

জাপ-বিবোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ এক অচল অবস্থার পর্যায়ে পেঁৗছলে, শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্বর্তী এলাকার যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করল। তথাকথিত 'জেলের খাঁচা পদ্ধতি' অবলম্বন করে জাপ-হানাদাররা জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলোতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে ও ছোট ছোট এলাকায় খণ্ডন করতে এগিয়ে গেল। তারা সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করল তাদের কথিত 'সমূলে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান'। জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলোর সামরিক ও বেসামরিক জনগণ বারবার বীরত্বের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ব্যূহ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন এবং ঘাঁটিগুলি সম্প্রসারিত করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। ১৯৪০ সালের মধ্যে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাসমূহের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১০০,০০০,০০০, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল ৫০০,০০০ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৮০০,০০০। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই সময়পর্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধির যুগ।

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে, মাও সে-তুং-এর চীনা বিপ্লব সম্পর্কিত বিশ্লেষণমূলক প্রসিদ্ধ রচনা 'নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হল। এর উদ্দেশ্য

ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও জাপ-বিরোধী জনগণকে সঠিক তত্ত্ব আর সুনির্দিষ্ট নীতিতে বলিষ্ঠ করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং কর্তৃক উত্থাপিত দাবী যে চীনের পরিস্থিতি চায় 'এক পার্টি, এক তত্ত্ব ও এক নেতা' এই ফ্যাসিস্ট কমিউনিস্ট-বিরোধী তত্ত্বের খণ্ডন করা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের এবং চীনা বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাও জেতোং এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করলেন চীনা বিপ্লব এবং চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গঠনকার্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব ও নীতি। তিনি উল্লেখ করলেন যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে হবে জনগণের জয় ও নয়া গণতন্ত্রের জয় ; প্রতি-ক্রিয়াশীল কুওমিনতাং-এর ফ্যাসিবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই প্রবন্ধ চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনা জনগণের জন্য জোগাল একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত কর্মসূচী।

১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে, চিয়াং চিয়েশি জাপ-হানাদারদের সঙ্গে তাল রেখে প্রথমে নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং পরে অষ্টমরুট বাহিনীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ শুরু করল। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে, আশি হাজার কুওমিনতাং সৈন্য দক্ষিণ-আনহুই প্রদেশে অবস্থিত নয়া চতুর্থ বাহিনীর সদর দপ্তরের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করল। নয়া চতুর্থ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় দশ হাজার সৈন্য বীরত্বের সঙ্গে প্রতি-আক্রমণ করে আত্মবিসর্জন দিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি কম্যাণ্ডার সিয়াং ইং, রাজ-নৈতিক বিভাগের ডিরেক্টর ইউয়ান কুওফিং এবং চীফ-অফ-স্টাফ চৌ জিখুন। কম্যাণ্ডার ইয়ে থিং যখন কুওমিনতাং বাহিনীর সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন তখন তাঁকে বন্দী করা হল। এই ঘটনা "দক্ষিণ আনহুই ঘটনা" নামে খ্যাত।

এই হত্যাকাণ্ডের পর, জাপ-হানাদাররা এবং ওয়াং চিংওয়েই-এর (যিনি ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৯৪০ সালে নানচিং ভুয়া সরকারের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) সৈন্য চিয়াং চিয়েশির সঙ্গে যোগসাজশে মধ্য-চীনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নয়া চতুর্থ বাহিনীর সৈন্যদের আক্রমণ করল। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনীর প্রতি আরেকটি বিরাট আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে চিয়াং চিয়েশি প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করল। ঐ সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করল দৃঢ় বৈপ্লবিক নীতি। ১৯৪১ সালের ২০শে জানুয়ারি, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক কমিশন নয়া চতুর্থ

বাহিনীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে একটি আদেশ জারী করে ছেন ইকে অস্থায়ী কম্যাণ্ডার, চাং ইয়ুনইকে ডেপুটি কম্যাণ্ডার এবং লিউ শাওছিকে রাজনৈতিক কমিশার নিযুক্ত করল। নয়া চতুর্থ বাহিনীকে সাতটি ডিভিসনে পুনর্গঠিত করা হল : ১নং ডিভিসনের কম্যাণ্ডার হলেন সু ইয়ু ; ২নং ডিভিসনের হলেন চাং ইয়ুনই ; ৩নং ডিভিসনের হলেন হুয়াং খেছেং, ৪নং ডিভিসনের হলেন ফেং স্যুয়েফেং ; ৫নং ডিভিসনের হলেন লি সিয়াননিয়ান ; ৬নং ডিভিসনের হলেন থান চেনলিন ; আর ৭নং ডিভিসনের হলেন চাং তিংছেং। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশের জনগণের কাছে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দিল এবং তাদের কাছে এই বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাল। নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং বিভিন্ন জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলোর সমগ্র জনগণ জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সংঘবদ্ধ হল এবং কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনী ও জাপ-হানাদারদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি শুরু করল। বৃহত্তর জনগণ এবং কুওমিনতাং-এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যক্তিরা — যাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন সোং ছিংলিং ও হো সিয়াংনিং — চিয়াং চিয়েশির অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ ও তার বিরোধিতা করলেন। এইরূপে চিয়াং চিয়েশি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী দ্বিতীয়বারের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালের এই দুই বছরে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলি বার বার জাপ-হানাদার, তাদের পুতুল সেনা ও কুওমিনতাং বাহিনীর নির্মম আক্রমণের ফলে এক ক্লেশকর পর্যায়ে পড়ল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে রুশ-জার্মান যুদ্ধ এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গোড়ার দিকে ফ্যাসিস্ট শিবির সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জন করে অধিকতর সুবিধার স্থান দখল করল। জাপ-হানাদাররা উত্তর ও মধ্য-চীনকে তাদের বিশ্ব-ব্যাপী আক্রমণের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে চীনের অধিকৃত অঞ্চলে তাদের সন্ত্রাসবাদী শাসন তীব্রতর করল এবং সুসম্বদ্ধভাবে সেই সব অঞ্চলের সম্পদ অপসারিত করল। জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে তারা শুরু করল আরও ভয়ংকর এবং ক্ষিপ্ত 'সমূলে নিশ্চিহ্ন অভিযান'। তারা 'সব পোড়াও, সব মারো, সব লুণ্ঠন করো' নীতি পালনের অতি বর্বর আচরণ গ্রহণ করল — উদ্দেশ্য জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা।

তার ফলে এই ঘাঁটিগুলির জনবল, সম্পদবল ও আর্থিকবল গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। একই সঙ্গে কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনী এই সব এলাকাতে পরি-বেষ্টন, প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ও ধ্বংস করার কাজ জোরদার করল। কুওমিনতাং এমনকি বহুসংখ্যক সৈন্যকে শত্রুদের সেবায় পাঠাল যাতে তারা পুতুল সেনারূপে ব্যবহৃত হতে পারে ; এইভাবে তারা প্রত্যক্ষভাবে জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলিকে আক্রমণ করার জন্য জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করল। শত্রুপক্ষ, পুতুল সেনা ও চিয়াং চিয়েশির সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ও 'সমূলে নিশ্চিহ্ন অভিযানের' ফলে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলের আয়তন ও সামরিক শক্তি হ্রাস পেল; জনগণ ও তাদের সশস্ত্রবাহিনী অসীম ক্লেশকর পরিস্থিতির মধ্যেও সংগ্রামে অটল রইল।

এই ক্লেশকর পরিস্থিতি এবং সংকট অতিক্রম করার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলিকে শক্তিশালী করার কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের প্রতি খাদ্য সরবরাহের অসুবিধা সহ আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য মুক্তাঞ্চলের সকল সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে বৃহদাকারে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করা হল। মাও জেতোং-এর আহ্বানে সব সামরিক ইউনিট, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিদ্যায়তন এবং বেসামরিক জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ো-জমি উদ্ধার, কৃষির সম্পূরক উদ্যোগগুলোর উন্নয়ন এবং হস্তশিল্প উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হল। এইরূপে বহু সামরিক ইউনিট সম্পূর্ণ অথবা প্রায়-সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হল। সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যায়তনগুলি তাদের বেশির ভাগ খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হল। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র করার জন্য মিলিশিয়া ইউনিট এবং সামরিক কাজের ইউনিটগুলিকে ব্যাপকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা হল যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুদলের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা যায়। ঐ একই লক্ষ্যে নানা ধরণের গৃহজাত তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-সামগ্রীরও উন্নতিসাধন করা হল। পার্বত্য অঞ্চলে স্থলমাইন ব্যবহার করে এবং সমতলভূমি-তে 'সুড়ঙ্গযুদ্ধের' দ্বারা শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করা হল। সেই সঙ্গে ভূমি-কর ও সুদ হ্রাস করার নীতি অবলম্বন করে কৃষকদের বোঝা লাঘব করা হল; তার ফলে প্রতিরোধ-যুদ্ধ সমর্থনের জন্য তারা উদ্যমী হল। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব বেশি লোকেদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হল। ঘাঁটি

অঞ্চলের আর্থিক এবং বস্তুসমূহের সঞ্চয় ও জনগণের ভার লাঘবের জন্য 'কম ও উৎকৃষ্ট সৈন্য এবং সহজ প্রশাসনিক' নীতি কার্যকরী করা হল। জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জনগণকে সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হল। সর্বতোভাবে সরকারকে সমর্থন এবং জনগণকে সাহায্য করার জন্য সৈন্যবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানানো হল। আরেকদিকে, পার্টি, সরকার এবং জনগণকে সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার জন্য ও যুদ্ধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য আহ্বান জানানো হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করাল যে, বর্তমান ক্লেশ হল 'উষার পূর্বে তমসার মতো', পার্টি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাল, 'দৃঢ়মুষ্টিতে' তমসা ভেদ করে বিজয় অর্জনের উষাকে স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে যেতে।

এই ক্লেশকর মুহূর্তে পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে মজবুত করার জন্য চীনা কমিউ-নিস্ট পার্টি শুদ্ধিকরণ আন্দোলন শুরু করল। এই আন্দোলনের সময় পার্টির ক্যাডাররা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মূল ভূমিকা সম্বন্ধে লেনিন ও স্টালিনের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করলেন, সব কাজে বাস্তব থেকে এগুতে এবং তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনের সমন্বয় করার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হল। অধ্যাত্মবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও বাঁধাধরা নিয়মে পার্টি প্রবন্ধ রচনার প্রবণতা অতিক্রম করার জন্য তাঁরা সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পন্থা অবলম্বন করলেন। এই শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতাদর্শের ভিত্তিতে পার্টিতে নতুনভাবে ঐক্য স্থাপিত হল এবং পার্টিতে বিরাট পরিবর্তন এলো। এইরূপে পার্টি জনগণকে তাদের আরও ফলপ্রসূভাবে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব দিতে ও সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হল।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের বিজয় অর্জনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক নতুন মোড় নিল। তখন থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশ নিয়ে গঠিত বিশ্ব-ব্যাপী ফ্যাসিস্টবিরোধী শিবির আত্মরক্ষামূলক পন্থা অবলম্বন করা থেকে আক্র-মণাত্মক পন্থা গ্রহণ করল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও জেতোং-এর অত্যুৎ-কৃষ্ট নেতৃত্বাধীনে ও সুচিন্তিত নীতির সঠিক অনুশীলনের ফলে চীনের মুক্তাঞ্চল-গুলো এক অতি কঠিন 'পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠল, এবং ১৯৪২ সালের শুরু

থেকে শত্রুপক্ষের নির্মম 'পরিবেষ্টন ও পর্যুদমন' আক্রমণ বানচাল করে দিল। মুক্তাঞ্চল ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে থাকল ও তার আয়তন বিস্তৃত হতে শুরু করল।

১৯৪৩ সালের জুন ও জুলাই মাসে, কুওমিনতাং তৃতীয়বার কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ জোরদার করল এবং পীতনদীর উপকূল থেকে তার বিরাট সৈন্যবাহিনী সরিয়ে এনে সেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ঘিরে ফেলবার জন্য পাঠাল। পীতনদীর পাশে অবস্থিত আত্মরক্ষামূলক স্থানগুলির ওপর তারা গোলাবর্ষণ শুরু করল এবং এই সীমান্ত অঞ্চলের রাজধানী শহর তথা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আবাসভূমি ইয়ানআনকে নয় দিক থেকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি করল। সেই সঙ্গে কুওমিনতাং "চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দাও" বলে চীৎকার করতে শুরু করল। আগে থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাং-এর এই পরিকল্পনা ফাঁস করে দিল এবং এই নীতির প্রতিবাদ জানাল। সীমান্ত অঞ্চলের সকল সামরিক ও বেসামরিক জনগণকে সফলতার সঙ্গে সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তারা সক্রিয়ভাবে এই পূর্ব-পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি করল। কুওমিনতাং-এর বিরুদ্ধে সারাদেশের জনমতকে সতর্ক করে দেওয়া হল।

জাপ-বিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম: এই সম্মিলিত চাপ সৃষ্টির ফলে কমিউনিস্টবিরোধী আক্রমণ পুনরায় ব্যর্থ হল। ১৯৪৪ সালের মধ্যে মুক্তাঞ্চলের সৈন্যবাহিনী সীমিত প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে মুক্তাঞ্চলের আয়তন পুনরায় বিস্তৃত করল। উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ-চীনে পনেরটি জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চল ছিল এবং তার মোট জনসংখ্যা ছিল ৮০,০০০,০০০। এই সব অঞ্চলের নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪৭০,০০০ তাছাড়া ছিল ২,২৭০,০০০ গণ মিলিশিয়া। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ৯০০,০০০এরও অধিক, এবং উৎপাদন আন্দোলনের আরও অগ্রগতির ফলে মুক্তাঞ্চলসমূহের জনগণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হল। প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জনে মুক্তাঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ একটি শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হল।

কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং-এর চরম দুর্নীতি-পরায়ণ ও অবক্ষয়ী শাসনের কবলে পড়ল। চিয়াং চিয়েশি, সোং জিওয়েন

(টি.ভি.সোং), খোং সিয়াংসি (এচ.এচ. খোং) এবং ছেন লিফু এই চার পরিবারের প্রাধান্যে কুওমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা এমন এক স্থান দখল করেছিল যার ফলে তারা চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কবলস্থ করে জনগণকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ফেলতে সমর্থ হল। তারা অগণিত কাগজের মুদ্রা বাজারে ছাড়ল, দ্রব্যসামগ্রী গুদামজাত করে রাখল এবং শত্রুদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য গোপন চালান-কারবারে লিপ্ত হল। তারা মরিয়া হয়ে জনগণকে লুণ্ঠন করে নিজেরা প্রচুর ধনের অধিকারী হয়ে উঠল। সামন্ততান্ত্রিক, মুৎসুদ্দি ও সামরিক একচেটিয়া পুঁজি—যা আমলাতান্ত্রিক পুঁজি নামে খ্যাত — দ্রুত চার পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধিকারে এল। অধঃপতিত এবং দুর্নীতিপরায়ণ কুওমিনতাং-এর ছোটো-বড়ো বেসামরিক ও সামরিক পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে তহবিল তছরূপ, ভীতিপ্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ করে লিপ্সিত জিনিষ আদায় করার কাজ অবাধে করতে লাগল। তার সঙ্গে প্রতি বছর খাদ্যশস্যের ঘাটতি এবং জাপানী-দের প্রতিবন্ধকের ফলে সৃষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রায় অসহনীয় করে তুলল। কুওমিনতাং-এর গুপ্ত পুলিশ যথেচ্ছা-চার করতে শুরু করল, জনগণ সব রকম রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালো। হাজার হাজার প্রগতিশীল যুবক-যুবতীকে কুওমিনতাং ফ্যাসিস্ট বন্দীশিবিরে আটক করা হল এবং পরে তাদের হত্যা করা হল। এই ধরনের অত্যাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ শাসনের ফলে কুওমিনতাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হল এবং বহু স্থানে গণবিদ্রোহ সংঘটিত হল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে জাপ-হানাদাররা ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এক নতুন অভিযান শুরু করল। হোনান-হুনান-কুয়াংসি অভিযান নামে খ্যাত এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর চীন থেকে শুরু করে বর্মা ও ভারত পর্যন্ত একটি যোগাযোগ সড়ক উন্মুক্ত করা। মনোবলহীন কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনী এই অভিযান শুরু হবার আগেই আতংকগ্রস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। বছরের শেষে, জাপ-সেনারা কুইচৌ প্রদেশের তুশান পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ছোংছিং বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ল। কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীর পতন এবং কুওমিনতাং-এর কালিমাময় ফ্যাসিস্ট শাসন কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এক নতুন দেশহিতৈষী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার তুলল। ছোংছিং, খুনমিং এবং অন্যান্য স্থানের

জনগণ মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দাবী জানালেন ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক ও সামরিক হুকুম প্রত্যাহার করা হোক, কুওমিনতাং-এর একনায়কতন্ত্রের অবসান করা হোক এবং প্রতিষ্ঠা করা হোক একটি গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি "জাতীয় সরকার ও সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ দপ্তরের পুনর্গঠন করতে এবং একটি সম্মিলিত সরকার গঠনের" জন্য আহ্বান জানাল। সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও গোষ্ঠী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা সকলেই এই আহ্বানকে পরম উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি জানালেন। কিন্তু কুওমিনতাং তা করল প্রত্যাখ্যান। ইত্যবসরে প্রতিরোধ যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুওমিনতাং সরকার ও তার সৈন্যবাহিনীকে আরও কুক্ষিগত করল। মার্কিন প্রতিনিধিরা এবং চিয়াং চিয়েশি কয়েকজন কমিউনিস্টকে সরকারে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানিয়ে কুওমিনতাং সরকারের তথাকথিত "ঐক্য" ও "গণতন্ত্র" পূর্ণ করতে চেষ্টা করল। তারা আশা করেছিল যে, এই পন্থা অবলম্বন করে কুওমিনতাং সরকার পুনর্গঠিত হলে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করার দাবী দমন করা যাবে, এবং ধ্বংস করা যাবে অষ্টমরুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী আর মুক্তাঞ্চলগুলোকে। তাদের এই কুমত-লবপূর্ণ প্রস্তাব চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যাখ্যান করল। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি ও গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর জনতাও তাদের প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং চিয়েশির প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস: ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস ইয়েনআনে আহূত হল। ১,২১০,০০০ পার্টি সদস্যদের প্রতিনিধিরূপে ৫৪৪জন পূর্ণ-প্রতি-নিধি এবং ২০৮ জন বিকল্প প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এই কংগ্রেসে মাও জেতোং প্রদত্ত 'সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে' শীর্ষক রাজনৈতিক রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। এই রিপোর্টে মাও জেতোং আন্তর্জাতিক ও স্বদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন, পূর্ববর্তী দুই দশক বা ততোধিক সময়ে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব নেতৃত্বদানকালের সময়কার অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে প্রতিরোধ-যুদ্ধকালীন দুই লাইনের মধ্যে সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করলেন এবং সারা পার্টির ও জাতির জন্য প্রণয়ন করলেন আক্রমণকারীদের পরাস্ত করার ও একটি নতুন চীন গঠন করার এক ব্যাপক কর্মসূচী আর সঠিক লাইন। এই

কংগ্রেসে আরও প্রদত্ত হল চু তে কর্তৃক 'মুক্তাঞ্চলগুলির যুদ্ধফ্রন্ট' শীর্ষক সামরিক রিপোর্ট এবং লিউ শাওছি কর্তৃক 'পার্টি সম্পর্কে' শীর্ষক পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে সাংগঠনিক রিপোর্ট। সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে অভূতপূর্ব ঐক্য পরিলক্ষিত হল। এই কংগ্রেস একটি নতুন গঠনতন্ত্র গ্রহণ করল এবং নির্বাচন করল মাও জেতোং-এর নেতৃত্বে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি।

এই কংগ্রেসে বিবৃত হয় যে, চীনা জনগণ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সরাসরি নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই উনিশটি মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করেছে যার মোট জনসংখ্যা ৯৫,৫০০,০০০ ; অষ্টমরুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং দক্ষিণ-চীনের জাপ বিরোধী সৈন্য সমেত গণমুক্তিফৌজ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৯১০,০০০ ; ২,২০০,০০০ লোকবিশিষ্ট গণ মিলিশিয়া উৎপাদন ও যুদ্ধ উভয় কার্যেই নিয়োজিত আছে, ১৯৪৪ সাল থেকেই গণমুক্তিফৌজ আংশিকভাবে প্রতি-আক্রমণের ভূমিকা নিয়েছে ; এবং বড় বড় শহরের অধিকাংশ শহরগুলি এবং যান ও সরবরাহের সড়কগুলি গণমুক্তিফৌজের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে এসেছে; আর নিঃসন্দেহে শক্তিশালী গণমুক্তিফৌজ এবং সমগ্র জাতির ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জন ও গণতন্ত্রের ব্রত পূর্ণ নিশ্চয়তা করা যাবে। কংগ্রেস প্রতিরোধ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য এবং একটি গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারা পার্টি ও সারা দেশের জনগণকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান জানাল।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জন: ১৯৪৫ সালের ২রা মে, সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ বার্লিন শহরে প্রবেশ করলে হিটলারের নাজি দস্যুবাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। আর সেই সঙ্গে সমাপ্ত হল ইউরোপে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ।

১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ৯ই আগস্ট সোভিয়েত লালফৌজ বিদ্যুৎগতিতে চারটি রাস্তা ধরে উত্তরপূর্ব চীনে অবস্থিত জাপ-হানাদারদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আক্রমণ ও ভেদ করল। ১০ই আগস্ট গণ-প্রজাতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপ-হানাদারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত ঘাঁটির পতন হল এবং শৌর্য-শালী লালফৌজের আক্রমণে তাদের দশ লক্ষাধিক বাছাই করা কুয়ানতোং সৈন্যবাহিনী অদৃশ্য হল।

৯ই আগস্ট, মাও জেতোং জাপানীদের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী চূড়ান্ত আক্রমণ হানবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন। ১০ই আগস্ট, গণমুক্তিফৌজের সেনাধ্যক্ষ চু তে মুক্তাঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর প্রতি তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাপ-সৈন্যদের নিরস্ত্র করাবার জন্য নির্দেশ জারী করলেন। তখন, বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলের গণমুক্তিফৌজের সৈন্যবাহিনী জাপ-নিয়ন্ত্রণাধীন নগর, শহর ও সরবরাহ সড়কের প্রতি বিরাটাকারে আক্রমণ হানবার জন্য জড়ো হলেন।

১৪ই আগস্ট, জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করার কথা ঘোষণা করল এবং ৩রা সেপ্টেম্বর বিধিবৎভাবে তা স্বাক্ষর করল। চীনা জনগণ আট বছর কঠোর সংগ্রামের পর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জন করলেন। আত্মসমর্পণ ঘোষিত হবার সময় গণমুক্তিফৌজ বহু বড় শহর এবং প্রধান প্রধান সরবরাহ সড়ক অবরোধ ও বেষ্টন করে রেখেছিল, তাই জাপ-সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সরাসরি গণমুক্তিফৌজের নিকট আত্মসমর্পণ করাই বিধেয় ছিল। কুওমিনতাং সৈন্য-বাহিনী বহু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের অভ্যন্তরভাগে পশ্চাদপসরণ করে চলে গিয়েছিল। তথাপি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে কুওমিনতাং কর্তৃপক্ষ জনগণকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের ফলভোগ করা থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা জাপসৈন্য ও তাদের ক্রীড়নক সৈন্যদের সঙ্গে যোগ-সাজস করে গণমুক্তিফৌজকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী শহর ও যোগাযোগের সড়কসমূহের "অধিকার নেবার" ও গণমুক্তিফৌজকে আক্রমণ করার জন্য কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীকে বায়ুযান ও জলযান দিয়ে সাহায্য করল। তাতে এক নতুন গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা সূচিত হল।

আট বছর ক্লেশকর সংগ্রামের পর এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনদানের পর চীনা জনগণ অবশেষে ভয়ংকর জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করল এবং পবিত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয় অর্জন করল। এই বিজয়ী জনযুদ্ধের সংগঠক ও হোতা ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টি বহিঃশত্রু — জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য মরণ-পণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং প্রতিরোধকারীদের শিবিরের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী ও জনগণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং-এর বিরুদ্ধে অবিচল বিপ্লবী সংগ্রাম চালনা করে-

ছিল। এই দ্বৈত সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জিত হয়েছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে জনগণের সাফল্য তৃতীয় গৃহযুদ্ধে সাফল্য অর্জনের পথ প্রশস্ত করল।

৪. তৃতীয় গৃহযুদ্ধ
(সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)

শান্তি এবং গণতন্ত্রের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম: জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ সমাপ্তির পর, বৃহৎ ভূস্বামী এবং বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি কুওমিনতাং যুদ্ধে জনগণের বিজয় অর্জনের সুফল হরণ করার ও সমগ্র দেশে একনায়কত্বের শাসন কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। একটি বৃহৎ আকারের গৃহযুদ্ধ করার জন্য তারা যুদ্ধ-চলাকালীন দেশের অভ্যন্তরীণভাগে যে সামরিক শক্তি সঞ্চয় করেছিল এবং যে বৈদেশিক অস্ত্রসম্ভার তারা পেয়েছিল তা-সব প্রয়োগ করল — তাদের উদ্দেশ্য ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের সমস্ত বিপ্লবী শক্তির উচ্ছেদ সাধন। জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিস্তীর্ণ বাজার নিজের প্রভাবাধীন এবং চীনকে তার উপনিবেশে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কুওমিনতাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করল। চীনা জনগণ গৃহযুদ্ধের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

আট বছর ক্লেশকর সংগ্রামে অভিজ্ঞ চীনা জনগণ চাইছিলেন শান্তি এবং গণতান্ত্রিক ধরনের অবস্থা। জনস্বার্থের প্রতিভূরূপে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরীণ শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দিল। ১৯৪৫ সালের ২৫শে আগস্ট, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি 'সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে ঘোষণা' জারী করল। এই ঘোষণাপত্রে শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান হল এবং বিনাকালক্ষেপে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গৃহযুদ্ধ পরিহার করার কথা বলা হল।

২৮শে আগস্ট, মাও জেতোং কুওমিনতাং সরকারের কর্মস্থল ছোংছিং-এ গেলেন এবং ঐ সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। মাসাধিক অবিচল সংগ্রামের পর কুওমিনতাং সরকার অবশেষে শান্তি এবং গণতন্ত্রের নীতি মেনে নিতে বাধ্য হল। ১০ই অক্টোবর, দুই পক্ষ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করে ''গৃহযুদ্ধ পরিহার করতে

অটল থাকার" কথা ঘোষণা করলেন। এই চুক্তিতে দেশের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠন করার মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য একটি রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদ আহ্বানের কথা বিবৃত হল।

এই চুক্তি প্রকাশিত হবার পর, চুক্তির ধারা অনুযায়ী চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব-চেচিয়াং, দক্ষিণ-চিয়াংসু এবং দক্ষিণ-আনহুই থেকে তার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করল। কিন্তু ইতিপূর্বে যখন দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখনই কুওমিনতাং গোপনে পাঁচদিক থেকে মুক্তাঞ্চলগুলিকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করছিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরক্ষণেই কুওমিনতাং শানসী প্রদেশের শাংতাং অঞ্চল এবং হোপেই প্রদেশের হানতান অঞ্চলের মুক্তাঞ্চলের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠাল। অক্টোবর মাসের শেষ বিশদিনে গণমুক্তিফৌজ সাফল্যের সঙ্গে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন এবং তাতে কুওমিনতাং-এর ১১০,০০০ সৈন্য নিহত হল। কুওমিনতাং কর্তৃক একটি নতুন গৃহযুদ্ধ শুরু করার অভিসন্ধির প্রতি তা বিরাট আঘাত হানল।

কুওমিনতাং তার প্রথম সামরিক আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে আবিষ্কার করল যে, বিরাটাকারে গৃহযুদ্ধের জন্য তার প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এদিকে চীনা কমিউ-নিস্ট পার্টি শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। তার জন্যে দেশের ও বিদেশের জনমতের চাপে পড়ে কুওমিনতাং ১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করল ও দুই পক্ষই যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করল। দুই পক্ষের মধ্যে "সামরিক মধ্যস্থতার" জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রতিনিধি জেনারেল জর্জ সি মার্শাল শান্তির "সালিস"-এর রূপ গ্রহণ করলেন। এই রূপে তিনি কুওমিন-তাংকে সৈন্য সমাবেশ করার সময় দিলেন। যে দিন যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল সেই দিন ছোংছিং-এ একটি রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলন আহূত হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, চীনা গণতান্ত্রিক লীগের প্রতিনিধি এবং নির্দলীয় গণ-তান্ত্রিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করলেন। এই সম্মেলনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বহু গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করল এবং কুওমিনতাং-এর নতুন গৃহযুদ্ধের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের জন্য দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাফল্য অর্জন করল। জনমতের চাপে কুওমিনতাং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হল। এবং উপায়হীন হয়ে জনগণকে কিছু সুবিধাদান

দিতে বাধ্য হল। তার ফলে, সম্মেলন ঐ সময়ে শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের পক্ষে হিতকারী কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে সক্ষম হল।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনা জনগণ কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ চূর্ণবিচূর্ণ করল: কুওমিনতাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলনে যোগদান করেছিল, তাই এই সম্মেলনের অধিবেশন ও তাতে গৃহীত প্রস্তাব কুওমিনতাং তার রাজনৈতিক পরাজয় হিসাবে গ্রহণ করল। সম্মেলনের অধিবেশন চলাকালে কুওমিনতাং গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্রের অগ্রবর্তী এলাকায় বিরাট সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লংঘন করল। সম্মেলন শেষ হবার পর কুওমিনতাং তার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহ্বান করল এবং তার সদ্য স্বীকৃত সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল। তার কিছুদিন পর কুওমিনতাং নির্লজ্জভাবে যুদ্ধবিবতি চুক্তি ভঙ্গ করল এবং রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কুওমিনতাং বরাবর উত্তর-পূর্ব চীনের মুক্তাঞ্চলগুলোর প্রতি তার আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিল। এপ্রিল ও মে মাসে কুওমিনতাং আরেকবার এই অঞ্চলে বিরাটাকারের অভিযান চালাল। জর্জ সি মার্শাল এবং অন্যান্য মার্কিন প্রতিনিধি যারা 'সালিসের' ছদ্মবেশে "সামরিক মধ্যস্থতা" করছিল তারা প্রকৃতপক্ষে গৃহযুদ্ধের জন্য কুওমিনতাং-এর সৈন্যসমাবেশে সহায়তা করছিল। যে-সব স্থান থেকে মুক্তাঞ্চলের প্রতি আঘাত হানা যায় এমন সব স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকাশ এবং সমুদ্র পথে বিরাট সংখ্যক কুওমিনতাং সৈন্যকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল, এবং বহু পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ ও সামরিক উপকরণ যোগাল এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের লোকদের যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত করে তুলল। মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহ ও সমর্থন পাবার ফলে চিয়াং চিয়েশি ব্যাপক গৃহযুদ্ধ শুরু করল।

এদিকে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি শান্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। কিন্তু আমেরিকার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কুওমিনতাং এই প্রচেষ্টাকে দুর্বলতার প্রকাশ মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করল। কুওমিনতাং তার গুপ্তচরদের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার আদেশ দিল এবং গণতান্ত্রিক নেতাদের ওপর অত্যাচার দ্বিগুণ করল। এই সব থেকে চিয়াং চিয়েশি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শান্তির' প্রতি মৌখিক বুলির বিশ্বাসঘাতকতা উন্মোচিত হল। চীনা জনগণ ক্রমশঃ শান্তির স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে শান্তি, গণতন্ত্র এবং

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কুওমিনতাং শাসক-চক্রকে উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হলেন।

১৯৪৬ সালের ২৬শে জুন মধ্য-চীনের হুপেই-হোনান সীমান্তের মুক্তাঞ্চলকে ঘিরে ফেলবার জন্য চিয়াং চিয়েশি ৩০০,০০০ সৈন্য নিয়োজিত করে অভিযান শুরু করল। লি সিয়াননিয়ান, চেং ওয়েইসান এবং ওয়াং চেন-এর নেতৃত্বে মধ্য-চীনের মুক্তি ফৌজের ষাট হাজার সৈন্য সেই বূ্যহ ভেদ করলেন এবং নতুন নতুন স্থান নিজেদের অধিকারে আনলেন।

এরপর, জুলাই মাসে চিয়াং চিয়েশি-এর সৈন্যরা সমস্ত মুক্তাঞ্চলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করল। এই আক্রমণে চিয়াং চিয়েশি তার নিয়মিত ১,৬০০,০০০ সৈন্য নিয়োজিত করল, আর এই সকল সৈন্যরা আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাযুক্তিক সাহায্য, সমর্থন এবং উপদেশ পেত। শত্রুরা বিভিন্ন দিক থেকে চিয়াংসু-আনহুই, দক্ষিণ-শানসী, দক্ষিণ-পশ্চিম শানতোং, শানতোং উপদ্বীপ, পূর্ব-হোপেই, পূর্ব-সুইউয়ান, দক্ষিণ-ছাহার, রেহো এবং দক্ষিণ-লিয়াওনিং প্রদেশের মুক্তাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করল। এইভাবে চিয়াং চিয়েশিগোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করে চীনের ইতিহাসে এক অভূত-পূর্ব গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

এইযুদ্ধের শুরুতে চিয়াং চিয়েশি-এর মোট সৈন্যবল ছিল ৪,৩০০,০০০, আর অন্যদিকে চীনা গণমুক্তিফৌজের ছিল মাত্র ১,২৮০,০০০। সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কুওমিনতাং সর্বাত্মক আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করল আর দ্রুত গণমুক্তিফৌজকে ধ্বংস করার দুরাশায় উন্মত্তের ন্যায় আক্রমণ চালিয়ে শহর এবং ভূখণ্ড অধিকার করতে থাকল। এই আক্রমণ ১৯৪৭ সালের শুরুর দিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল।

এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তার মোকাবিলার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও জেতোং একটি সুচিন্তিত রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। তাতে ব্যক্ত হল, রাজনৈতিক ফ্রণ্টে চিয়াং চিয়েশি এবং তার মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সারা জনগণকে নিয়ে একটি যুক্তফ্রণ্ট সংগঠন ও নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা। সামরিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাতে বলা হল যে, সাময়িক সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী শত্রুপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে চলমান প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করে শত্রুপক্ষের কার্যকরী ক্ষমতাকে ধ্বংস

করাই হবে প্রধান লক্ষ্য আর নগর, শহর বা কোন বিশেষ স্থানের প্রতিরক্ষা করে নয়।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং মাও জেতোং কর্তৃক নির্দিষ্ট সামরিক নীতি গণ-মুক্তিফৌজ সঠিকভাবে পালন করল। যুদ্ধ শুরু হবার পরই বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলের সৈন্য ও বেসামরিক জনগণকে সংগঠিত করা হল। আট মাসের মধ্যেই গণ-মুক্তিফৌজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুক্তাঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন হোপেই প্রদেশের চাংচিয়াখৌ, রেহো প্রদেশের ছেংতে এবং চিয়াংসু প্রদেশের হুয়াইইন পরিত্যাগ করল ; কিন্তু এই কৌশল অভিযানের মধ্যে শত্রুপক্ষের ৭০০,০০০ সৈন্যকে পঙ্গু করে দেওয়া হল। শত্রুদের সামরিক অস্ত্র হস্তগত করে গণমুক্তি-ফৌজ অস্ত্রে সজ্জিত হল এবং যুদ্ধবন্দীদের জনগণের ব্রতের পথে এনে এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হল। সুতরাং, যুদ্ধ চলার সঙ্গে সঙ্গে গণমুক্তি-ফৌজ বৃহৎ এবং বলশালী হতে থাকল আর কুওমিনতাং বাহিনী সংখ্যায় হ্রাস পেতে থাকল, এবং যুদ্ধ করার মানসিকতাও হারাতে থাকল। এই কারণে, ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের পর কুওমিনতাং বাহিনী বাধ্য হয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ থামিয়ে দিয়ে মুক্তাঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম দিককার অর্থাৎ শানতোং ও উত্তর-সেনসীর যুদ্ধফ্রণ্টে তার আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করল। অন্যান্য যুদ্ধফ্রণ্টও প্রতিরক্ষা নীতি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল। অবস্থানুযায়ী কৌশল অবলম্বন করে ফেং তেহুয়াই, হো লোং এবং সি চোংস্যুন-এর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম পদাতিক বাহিনী ও ছেন ই এবং সু ইয়ু-এর নেতৃত্বে পূর্ব-চীন পদাতিক বাহিনী শত্রুদের কেন্দ্রীভূত আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করল। উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-চীনে গণমুক্তিফৌজ আংশিক প্রতি-আক্রমণ শুরু করল।

সামন্ততান্ত্রিক ও মুৎসুদ্দী শাসন সম্পূর্ণরূপে বিনাশের জন্য সংগ্রাম: এক বছর যাবৎ সৈন্য আগে-পিছে করার প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে গণমুক্তিফৌজ চিয়াং চিয়েশি-এর ১,১২০,০০০ সৈন্যকে বিনাশ করল এবং নিজের নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ১,২৮০,০০০ থেকে ২,০০০,০০০ বৃদ্ধি করল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে গণমুক্তিফৌজ দেশব্যাপী আক্রমণ শুরু করল এবং কুওমিনতাং শাসিত অঞ্চলকে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করল। যুদ্ধের কৌশলগত ক্ষেত্রে দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে তা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করল ; গণমুক্তিফৌজের ক্ষেত্রে তা হল প্রতিরক্ষার

কৌশল থেকে আক্রমণের কৌশল গ্রহণ, আর চিয়াং চিয়েশির সৈন্যবাহিনী যার সক্রিয় শক্তি বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাধ্য হয়ে আক্রমণের কৌশল পরিবর্তন করে গ্রহণ করল প্রতিরক্ষার কৌশল। ইতিহাসেও এ হল এক সন্ধিক্ষণ। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে "বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য" সম্বন্ধে মাও জেতোং যে রিপোর্ট দিলেন তাতে তিনি উল্লেখ করেন: "এ হল চিয়াং চিয়েশি-এর বিশ বছরের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের ক্রমবৃদ্ধি থেকে বিনাশের সন্ধিক্ষণ। এ হল চীনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এক শত বছরের ক্রমবৃদ্ধি থেকে বিনাশের সন্ধিক্ষণ।" (Selected Works of Mao Zedong, Foreign Languages Press, Beijing, 1977, vol. IV. P 157.) মাও জেতোং তাঁর এই রিপোর্টে আরও সুসম্বদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করলেন পার্টির সামরিক কৌশল, ভূমিসংস্কার নীতি, পার্টির শুদ্ধিকরণ আন্দোলন, অর্থনীতি এবং জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট বিষয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ।

সমগ্র মুক্তাঞ্চলে যে ভূমিসংস্কার করা হয়েছিল তাও ছিল গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ পরাভূত করার একটি মূল কারণ। জাপান আত্মসমর্পণ করার পর থেকে কৃষকেরা অবিলম্বে ভূমি পাবার দাবী করছিলেন। এই দাবী পূরণের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালের মে মাসের ৪ তারিখে একটি নির্দেশ জারী করেছিল। এই নির্দেশে ভূমি-কর এবং সুদের হার হ্রাসের নীতি পরিবর্তন করে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের জন্য জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি 'চীনের ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত আইন প্রণালী' প্রণয়ন করল। এই প্রণালী সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণকারী ভূসম্পত্তির অধিকার প্রথা বিলোপ করে "যে করে চাষ তার হাতে জমি দাও" প্রথা চালু করল। এরপর, পুরনো এবং বেশি পুরনো নয় এমন সব মুক্তাঞ্চলে ব্যাপক ভূমিসংস্কার আন্দোলন পালিত হল। ভূমি আইন বলবৎ করার এক বছরের মধ্যে মুক্তাঞ্চলসমূহের প্রায় দশ কোটি কৃষক ভূমির স্বত্বাধিকারী হলেন। তার ফলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান এবং তা সমর্থন করার জন্য তারা উদ্দীপিত হলেন ও যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্বর্তী এলাকাকে শক্তিশালী করার কাজে প্রভূত সাহায্য করলেন।

কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ: চিয়াং চিয়েশি জনগণবিরোধী গৃহযুদ্ধ অনুসরণ করতে থাকলে কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর ঔপনিবেশিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠল, আর্থিক সংকট আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকল, এবং চিয়াং চিয়েশি ও তার পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপ্ত ও আরও তীব্র হল।

জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের পর বৃহৎ চার পরিবারের কুওমিনতাং শাসকগোষ্ঠী জাপ-হানাদারেরা দীর্ঘকাল বর্বর লুণ্ঠন ও শোষণের মাধ্যমে চীনা জনগণের যে ধনসম্পত্তি পুঞ্জীভূত করেছিল তা হস্তগত করল। সেই সঙ্গে এই বৃহৎ চার পরিবার তাদের নিজেদের স্বার্থ আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের স্বার্থাধীন করল এবং কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অর্থনীতিকে একটি ঔপনিবেশিক রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থায় পর্যবসিত করল। চিয়াং চিয়েশি আমেরিকার সাহায্যের পরিবর্তে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা বিকিয়ে দিল। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিয়াং চিয়েশি চীন-আমেরিকা মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌচলাচল চুক্তি সম্পাদন করল। এই চুক্তি এবং অন্যান্য সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষরিত করে চিয়াং চিয়েশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট চীনের রাষ্ট্রগত, সামরিক, অভ্যন্তরীণ, কূটনীতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকিয়ে দিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর থেকে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের মধ্যে চিয়াং চিয়েশি আমেরিকার কাছ থেকে যে সাহায্য আদায় করেছিল তার মূল্য চার শো কোটি মার্কিন ডলারেরও অধিক ছিল। আমেরিকার পণ্যদ্রব্যে কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো ছেয়ে গেল, তার সঙ্গে ছিল গৃহযুদ্ধ শুরু করার জন্য চিয়াং চিয়েশি কর্তৃক জনগণের প্রতি নিষ্ঠুর শোষণ ও লুণ্ঠন; তার ফলে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকট দ্রুত প্রসারিত হতে লাগল। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য টিকে থাকার আশা বিনষ্ট হল। কৃষি ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। এই বাস্তবতার সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের পর্বত-প্রমাণ মূল্যবৃদ্ধি এবং টাকার মূল্যহ্রাস মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলল। জাপানের আত্মসমর্পণের সময় প্রধান প্রধান ভোগ্যদ্রব্যসমূহের মূল্য প্রাক্‌যুদ্ধের সময়কার তুলনায় ১৮০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৬০,০০০ গুণ। জাপ-প্রতিরোধ যুদ্ধের

ঠিক পূর্বে চিয়াং চিয়েশি সরকার ১,৪০০ মিলিয়ন ইউয়ান কাগজের মুদ্রা বাজারে ছেড়েছিল। জাপান যখন আত্মসমর্পণ করেছিল তখন এই টাকার পরিমাণ ছিল ৫০০,০০০ মিলিয়ন ইউয়ান, আর ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে হল ১৬,০০০,০০০ মিলিয়ন ইউয়ান।

অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তি অর্জন করতে থাকল, আর অন্য দিকে চিয়াং চিয়েশির রাজনৈতিক প্রতারণা দেউলিয়ার দিকে ধাবিত হতে লাগল, আর তার সামরিক অভিযানও ব্যর্থ হল। শ্রমিক, ছাত্র এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনতার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং চিয়েশিবিরোধী সংগ্রাম মুক্তাঞ্চলের সামরিক ও বেসামরিক জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে সংগ্রামের দ্বিতীয় বিপ্লবী ফ্রণ্টে পরিণত হল। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, শাংহাই-এর জনগণ 'আমেরিকার সৈন্য চীন ছাড়ো' ধ্বনি সহকারে এক সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। ১লা ডিসেম্বর, যখন চিয়াং চিয়েশির ভুয়ো জাতীয় পরিষদের অনুষ্ঠান চলছিল তখন শাংহাই শহরে একটি ঘটনা ঘটল যাতে হাজার হাজার পথের পাশের দোকানদারেরা জীবনধারণের এক সংগ্রাম শুরু করল। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত দোকানদারেরা তাদের ব্যবসার অধিকার রক্ষার জন্য আবেদন জানালে কুওমিনতাং সামরিক ও পুলিশবাহিনী তাদের ওপর যথেচ্ছাভাবে গুলিবর্ষণ করল। ডিসেম্বর মাসের শেষে, সারা চীনের পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রী মার্কিন সৈন্য কর্তৃক পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে বলাৎকারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। ১৯৪৭ সালের মে মাসে, ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুধা, নির্যাতন এবং গৃহযুদ্ধের প্রতিবাদে আর একটি আন্দোলন শুরু করল। ছাত্র, শ্রমিক এবং ব্যাপকতম জনগণের সংগ্রামকে দমন করার জন্য চিয়াং চিয়েশি গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, মারধোর এবং গুলিবর্ষণের আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও সংগ্রাম পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ় ও তীব্র আকার ধারণ করল। ১৯৪৮ সালের মে মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপ-সামরিকবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার মদৎ দেবার প্রতিবাদে আর একটি দেশাত্মবোধক আন্দোলন শুরু হল। চিয়াং চিয়েশি সারাদেশের জনগণ কর্তৃক ধিক্কৃত হতে থাকল। কুওমিনতাং-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর জনগণের অবস্থা দুর্দশায় পরিণত হয়েছিল, তাঁরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপিত করে গণমুক্তিফৌজের দ্রুত আগমন কামনা করতে লাগলেন।

গণমুক্তিফৌজ কৌশলগত আক্রমণ নীতি অবলম্বন করলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট আরও সুনির্দিষ্ট রূপ নিল। ১৯৪৭ সালের ১০ই অক্টোবর চীনা গণমুক্তিফৌজ একটি ঘোষণা জারী করল। এই ঘোষণায় "চিয়াং চিয়েশিকে উৎখাত করো আর গঠন করো একটি গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার" এই দাবী উত্থাপিত হল। তাতে আরও দাবী করা হল: শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, অন্যান্য শোষিত জনগণ, গণ-সংগঠনসমূহ, গণতান্ত্রিক দল, বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তা, প্রবাসী চীনা ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন; জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠন; চিয়াং চিয়েশির একনায়ক শাসনের উৎখাত; এবং গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠা। এই ঘোষণা চিয়াং চিয়েশি-এর একনায়ক সরকারবিরোধীদের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে একতাবদ্ধ হতে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট গঠনে উদ্বুদ্ধ করল। ২৭শে অক্টোবর চিয়াং চিয়েশি চীনা ডেমোক্র্যাটিক লীগকে ভেঙে দেবার জন্য এক আদেশ জারী করল। কিছু কিছু বুর্জোয়া বুদ্ধি-জীবী যাঁরা এযাবৎ অলীক আশা পোষণ করতেন যে, বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মাঝে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব তাঁরা এখন উপলব্ধি করলেন প্রতি-ক্রিয়াশীল কুওমিনতাং-এর নিপীড়নের অধীনে তৃতীয় পথ একটি অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

চীনা ডেমোক্র্যাটিক লীগকে ভেঙ্গে দেবার পর বিভিন্ন মধ্যপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় এক হল। ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে, শেন চুনরু এবং লীগের অন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হংকং-এ তাঁদের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন পুনর্গঠিত করলেন। কুওমিনতাং-এর অধীনস্থ কয়েকটি গণতান্ত্রিক সংগঠনও এক হয়ে লি চিশেন এবং হো সিয়াংনিং-এর নেতৃত্বে কুওমিনতাং বিপ্লবী কমিটি নামে একটি সংগঠন গঠন করলেন। এই সংগঠনগুলি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করে কুওমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনী নীতির বিরোধিতা করল। চীনা কৃষক-মজদুর গণতান্ত্রিক পার্টি, গণতন্ত্র বিকাশকামী চীনা সমিতি, চীনা গণতান্ত্রিক জাতীয় নির্মাণ সমিতি এবং চিউশান সংঘের মতো গণতান্ত্রিক দলগুলি ও নির্দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যক্তিরাও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল এবং গণ-সংগঠনগুলি নিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট

গঠন করার অবস্থা পরিণত পর্যায়ে পৌঁছল।

১৯৪৮ সালে ১লা মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে একটি নতুন গণ রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান ও গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক দিল। সারা দেশের জনগণ পরম উদ্দীপনার সঙ্গে সেই ডাকে সাড়া দিলেন। বহু গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ এই প্রস্তাবের প্রতি অনুমোদন ও সমর্থন প্রকাশ করে পরস্পরের মধ্যে তারবার্তা প্রেরণ করলেন।

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে বিজয় অর্জন: ১৯৪৮ সালের বসন্ত এবং গ্রীষ্ম-কালে গণমুক্তিফৌজ নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে বহু সুরক্ষিত নগর ও শহর অধিকার করল। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর গণমুক্তিফৌজ লিয়াওসি-শেনইয়াং, হুয়াইহো-হাইচৌ এবং পেইফিং-থিয়ানচিন প্রভৃতি অঞ্চলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করল। গণমুক্তিফৌজের মুখ্যবাহিনী এবং চিয়াং চিয়েশির বাহিনীর মধ্যে এই যুদ্ধগুলি ছিল চূড়ান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ থেকে নভেম্বর মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানে উত্তরপূর্ব গণমুক্তিফৌজ উত্তরপূর্ব চীনে ৪৭০,০০০ সৈন্যবিশিষ্ট কুওমিনতাং-এর মুখ্য সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করল এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব চীনকে মুক্ত করল। অতঃপর, গণমুক্তিফৌজ চিয়াং চিয়েশির বাহিনী থেকে সংখ্যাগত ও গুণগত-ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করল। সামরিক শক্তির দিক থেকে কুওমিনতাং-এর সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল ২,৯০০,০০০, আর অন্য দিকে গণমুক্তিফৌজের সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩,০০০,০০০। ১৯৪৮ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ ফ্রণ্ট কমিটি — যাতে ছিলেন লিউ পোছেং, ছেন ই, সু ইয়ু ও থান চেনলিন এবং যার সেক্রেটারী ছিলেন তেং সিয়াওফিং — পরিচালিত হুয়াইহো-হাইচৌ অভিযান পূর্বচীন ও মধ্য-সমতলভূমির স্যুচৌ-সুসিয়ান-ইয়োংছেং-এ অবস্থিত কুওমিনতাং-এর ৫৫০,০০০ উৎকৃষ্ট সৈন্যদের বিনাশ করে পূর্বচীন এবং ইয়াংসি নদীর উত্তরে মধ্য-সমতলভূমির কয়েকটি মাত্র স্থান ছাড়া আর সবই মুক্ত করল। এইভাবে, প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং শাসনের কেন্দ্রস্থল নানচিং এবং শাংহাই গণমুক্তিফৌজের নিকট উন্মুক্ত হল। পেইফিং-থিয়ানচিন অভিযান ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে শুরু হল এবং শেষ হল ১৯৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি। থিয়ানচিন

এবং চাংচিয়াখৌতে প্রতিরোধকারী কুওমিনতাং বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হল আর পেইফিং-এর প্রতিরোধকারী সৈন্যদের শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্গঠিত করা হল। এই অভিযানে গণমুক্তিফৌজ কুওমিনতাং বাহিনীর মুখ্য সৈন্যবাহিনীর এক অংশ মোট সংখ্যা ৫২০,০০০ সৈন্য বিনাশ করে উত্তর-চীনের সমগ্র ভূখণ্ডকে মুক্ত করল। এই তিনটি মুখ্য অভিযানে কুওমিনতাং-এর মূল বাহিনীর অধিকাংশই ধ্বংস হল এবং তাতে চীনা জনগণের বিপ্লব সামরিক দিক থেকে মূলতঃ বিজয় অর্জন করল।

বিপ্লবে বিজয় অর্জিত হবার পর ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হল। মাও জেতোং-এর পরিচালনাধীনে এই অধিবেশন পার্টির কাজের কেন্দ্রবিন্দু গ্রামের পরিবর্তে শহরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভর করে শহরের প্রশাসনিক কাজ শেখার প্রতিও এই অধিবেশন গুরুত্ব দিল। এই অধিবেশন বিপ্লবোত্তর চীনের বিভিন্ন অর্থনীতিক ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির মুখ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করল, পার্টি কর্তৃক চীনের বিভিন্ন অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পালনীয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করল এবং সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে পালনীয় কয়েকটি মূলনীতিরও রূপদান করল। এই অধিবেশন সমাপ্তির পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তর পেইচিং-এ স্থানান্তরিত হল।

সারাদেশের সামরিক পরিস্থিতি দ্রুত বিপ্লবের পক্ষে মোড় নিতে শুরু করল। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাং শাসনের পতন ত্বরান্বিত হল। পরাজয়কে প্রতিহত করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশানুসারে কুওমিনতাং শাসকগোষ্ঠী 'আক্রমণাত্মক শান্তি কামনার' নীতি অবলম্বন করল। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি চিয়াং চিয়েশি 'শান্তি' কামনা করে একটি ছলনাপূর্ণ প্রস্তাব দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ করার জন্য কিছু সময় নিয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বিপ্লবকে ধ্বংস করা। কিছু দিনের মধ্যে চিয়াং চিয়েশি এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে তার কার্যভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট লি জোং রেন-এর ওপর দিয়ে 'অবসর' গ্রহণ করল, কিন্তু নেপথ্যে সব কিছু পরিচালনা করতে থাকল। ছলনাপূর্ণ শান্তি কামনার উত্তরে ১৪ই জানুয়ারি মাও

জেতোং একটি বিবৃতি দিলেন এবং তাতে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আটটি শর্ত উল্লেখ করলেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি এবং কুওমিনতাং-এর লি জোংরেন সরকারের প্রতিনিধিরা একটি 'অভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তি'র খসড়া তৈরী করলেন। কিন্তু পনের দিন আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ২০শে এপ্রিল কুওমিনতাং সরকার তা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করল। কুওমিনতাং-এর 'শান্তি' কামনার কপটচারী চরিত্র উন্মোচিত হল।

২১শে এপ্রিল গণমুক্তিফৌজ ইয়াংসি নদী অতিক্রম করতে শুরু করল এবং দেশকে মুক্ত করার ব্রত সম্পন্ন করার জন্যে এই নদীর দক্ষিণ ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। দু দিন পর কুওমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের কেন্দ্র-স্থল নানচিং মুক্ত হল। এরই সঙ্গে সঙ্গে গণমুক্তিফৌজ ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিম চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হতে শুরু করল। এই অগ্রসরের পথে চিয়াং চিয়েশি-এর অবশিষ্ট বাহিনীকে বিনাশ ও পরাস্ত করা হল এবং ১৯৪৯ সাল শেষ হবার পূর্বেই তিব্বত ছাড়া চীনের সমগ্র মূলভূখণ্ড মুক্ত হল। চীনা জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ সারাদেশে মূলতঃ বিজয় অর্জন করল।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের জুন মাসের মধ্যে গণমুক্তিফৌজ কুওমিনতাং সৈন্যবাহিনীর ৮,০৭০,০০০ সৈন্যকে বিনাশ করল, ৫৪,৪০০টি কামান, ৩১৯, ৯০০ মেশিনগান, ১০০০ ট্যাংক ও বর্মাচ্ছাদিত যুদ্ধ-যান, ২০,০০০ মোটর-গাড়ি এবং অন্যান্য অস্ত্র ও বস্তু অধিকার করল।

চীনা গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের অধিবেশন: সমগ্র দেশে কুও-মিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন উৎখাত করার পর চীনা জনগণ নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত হলেন। নয়া চীনের রাষ্ট্রের চরিত্র এবং তার বিভিন্ন নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য ১৯৪৯ সালের ১ লা জুলাই মাও জেতোং 'জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বললেন যে, গণ প্রজাতান্ত্রিক চীন হল: "শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে (কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে) এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।" তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে চীনকে "অবশ্যই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর

সঙ্গে একান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।"* এই প্রবন্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মাও জেতোং নয়াচীন গঠনের মূলনীতিসমূহ নির্ধারিত করলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখে চীনা গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পেইচিং-এ শুরু হল। এই সভা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টের সভা। এতে শ্রমিক, কৃষক, পাতি-বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া, বিভিন্ন দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবিশেষ, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা এবং প্রবাসী চীনাদের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই পরিষদ ছিল সারাদেশের জনগণের প্রতিভূ। সুতরাং, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত না হলেও প্রকৃতপক্ষে এই পরিষদ জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং একটি জাতীয় গণ-কংগ্রেস আহূত হবার পূর্বে এই পরিষদ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য পালন করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত একটি খসড়া প্রস্তাব আলোচনা করে এই সভা 'চীনা গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের সাধারণ কর্মসূচী' গ্রহণ করল। এই কর্মসূচীতে নির্ধারিত হল নয়াচীনের চরিত্র ও দায়িত্ব, জনগণের অধিকার ও কর্তব্য, নতুন রাষ্ট্রক্ষমতার কাঠামো সম্বন্ধে মূল নীতিসমূহ, রাষ্ট্রের সামরিক পদ্ধতি, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি এবং সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রতি নীতি। এই কর্মসূচীতে সুস্পষ্টভাবে আরও নির্ধারিত হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকারী রাজনৈতিক ভূমিকা এবং জাতির অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মুখ্য ভূমিকা। আর এইভাবে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের সমাজতান্ত্রিক পথের অন্তর্বর্তী পর্যায় নিশ্চিত করা হল। সাধারণ কর্মসূচী চীনা জনগণের এক মহান সাময়িক সনদে পরিণত হল। এই সভা চীনা গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের সাংগঠনিক আইন এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের কেন্দ্রীয় গণ সরকারের সাংগঠনিক আইন অনুমোদন করল। এই সভায় মাও জেতোং কেন্দ্রীয় গণসরকারের চেয়ারম্যান রূপে নির্বাচিত হলেন; চুতে, লিউ শাওছি, সোং ছিংলিং, লি চিশেন, চাং লান এবং কাও কাং ভাইস-চেয়ারম্যান রূপে নির্বাচিত হলেন, এবং চৌ এনলাই ও অন্যান্য ৫৬ জন কেন্দ্রীয় গণসরকার পরিষদের সভ্যরূপে নির্বাচিত হলেন। এই সভা

রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিল এবং পেইচিংকে দেশের রাজধানী রূপে গ্রহণ করল।

গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর পেইচিং-এ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা সূচিত হল। পেইচিং-এর থিয়ানআনমেন থেকে মাও জেতোং সারাদেশের জনগণের প্রতি ও সারা বিশ্বের প্রতি প্রকাশ্যে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন এবং কেন্দ্রীয় গণসরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। চীনের ইতিহাসে সূচিত হল এক নতুন অধ্যায়। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে শুরু করে চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী, আমলাতন্ত্র-পুঁজিবাদবিরোধী নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তিরিশ বছর ধরে স্থায়ী ছিল। ঐ সব বছরগুলিতে অগণিত বিপ্লবী প্রাণ হারিয়ে শহীদ হয়েছিলেন এবং অনেকে অতিবাহিত করেছিলেন কষ্টভোগ ও কঠোর দুঃখদুর্দশাপূর্ণ সংগ্রামী জীবন। পরিশেষে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বে বিপ্লব বিজয়লাভ করল। এই জয় ছিল ৬০ কোটি লোকবিশিষ্ট চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জয়। এ ছিল একটি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নতুন জয়যাত্রা। এ ছিল বিশ্বশান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ব্রতের মহান বিজয়।

ইতিপূর্বে, ১৯৪০ সালে মাও জেতোং তাঁর "নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, "এটা খুবই স্পষ্ট যে, চীনের বর্তমান সমাজের চরিত্র যেহেতু ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, তাই চীনের বিপ্লবকে অবশ্যই দুই পর্বে ভাগ করতে হবে। প্রথম পর্বের কাজ হল সমাজের এই ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপকে একটা স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত করা; দ্বিতীয় পর্বের কাজ হল বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।" (Selected Work of Mao Zedong, Foreign Languages Press, Beijing, 1975, vol. II, P. 342.)

গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠায় সূচিত হল চীনের বিপ্লবের প্রথম পর্বের শেষ এবং দ্বিতীয় পর্বের শুরু। চীনের ইতিহাসে শুরু হল এক নতুন অধ্যায় — জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অধীনে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তীকালীন এক মহান অধ্যায়। গণ প্রজাতান্ত্রিক চীনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি হল প্রধান রাজনৈতিক দল। এই দল চীনের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক ব্রত গ্রহণ করেছে।

৫. সমসাময়িক চীনের সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শগত বিপ্লব

চীনের সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ৪ঠা মে আন্দোলনের আগে এবং তার পরের পর্বকে দুটি সুস্পষ্ট যুগে ভাগ করা যেতে পারে। ৪ঠা মে আন্দোলনের আগে চীনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সংগ্রাম ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর নব্য সংস্কৃতির (নব্যবিদ্যা) সঙ্গে সামন্ত ভূস্বামীশ্রেণীর প্রাচীন সংস্কৃতির (প্রাচীন বিদ্যা) সংগ্রাম। ৪ঠা মে আন্দোলনের পর অবস্থার পরিবর্তন হল। চীনে আবির্ভূত হল এক সজীব এবং সম্পূর্ণ নূতন সাংস্কৃতিক শক্তি — সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক মতাদর্শ, অর্থাৎ সাম্যবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামাজিক বিপ্লবের তত্ত্ব।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণ বিপ্লব। তার ভিত্তি ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী ও আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদ বিরোধী। সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত নয়া গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চরিত্রও ছিল সামন্তবাদবিরোধী, মুৎসুদ্দিশ্রেণীবিরোধী ও ফ্যাসিস্টবিরোধী।

পুরনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব-কারী নব্যবিদ্যা গোষ্ঠী সামন্ততান্ত্রিক এবং মুৎসুদ্দী মতাদর্শের প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পর নব্যবিদ্যা গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হলে একদল সক্রিয়ভাবে গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান প্রবর্তনের দাবী করলেন, একদল কোন্ পথ অবলম্বন করবেন তা স্থির করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, এবং অন্য একদল তাদের স্বপক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা যায় কি না তার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক মিত্রপক্ষের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নিলেন বা তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক ভাবধারাপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক মিত্রপক্ষ নব্যবিদ্যা গোষ্ঠীর অবক্ষয়ী ব্যক্তিবিশেষের সমর্থন পেয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ঐ যুগের সাংস্কৃতিক জগতে তা ছিল এক মুখ্য শক্তি। সুতরাং তাই হল নয়া গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান আক্রমণস্থল।

রাশিয়ার মহান অক্টোবর বিপ্লবের জয় চীনা জনগণের মনে জাতীয় মুক্তির নতুন আশা এনে দিল। ১৯১৯ সালে ৪ঠা মে আন্দোলন সংঘটিত হল আর চীনা জনগণের বিপ্লব এক নতুন ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করল।

৪ঠা মে আন্দোলন ছিল এক দিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আরেকদিকে সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলন। শুরুতে এই আন্দোলন ছিল জনগণের তিনটি শ্রেণী — সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী — নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রণ্টের বিপ্লবী আন্দোলন। ঐ সময়ে শেষোক্ত শ্রেণী আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীভুক্ত ছিলেন। এই তিনটি শ্রেণীই সর্বপ্রথম নব্যবিদ্যা গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপেক্ষা ও অবলোকন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ তাঁদের পুরনো গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বন্ধন ছিন্ন করে সাম্যবাদের মূল সূত্র গ্রহণ করলেন আর তারই ফলে তাঁরা এই মহান আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় পদ দখল করলেন। সংগ্রামের মধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাঁরা নিজেদের পোড় খাইয়ে নিয়ে মতাদর্শগতভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে ১৯২১ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত করলেন।

সাম্যবাদ আদর্শ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত ৪ঠা মে আন্দোলন বিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র বিকাশের দাবী করে, আর বিরোধিতা করে কনফুসিয়াসবাদ, সেকেলে নীতিশাস্ত্র ও সাহিত্য, কুসংস্কার এবং সারা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা। চীনা জনগণের পূর্ণ বিপ্লবী মনোভাব প্রকাশ করে লি তাচাও 'যুবক' পত্রিকায় চীনা যুবকদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, "গণতান্ত্রিক 'যুব চীন' প্রতিষ্ঠাকল্পে অতীতের পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে ফেলো আর ধ্বংস করো পুরনো শিক্ষাদীক্ষার জোয়াল।" লুস্যুনের গল্পসংগ্রহ "লড়াইয়ের ডাক" এবং কুও মোরুও'র কবিতা "দেবীগণ"-এ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের জন্য আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠল। নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কুঠারাঘাত সেকেলে নীতিশাস্ত্রের প্রাচীর — কনফুসিয়াসবাদকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল এবং সেকেলে সংস্কৃতির প্রতি বিরাট আঘাত হানল। চীনের ইতিহাসের উন্মেষ থেকে এই আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর চীনা জনগণের বিপ্লব আরও গভীর হল এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম উভয়ই তীব্রতর হল। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যাঁরা ৪ঠা মে আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীভুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দিকে গেলেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালনায় তাঁরা নূতন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হলেন। বিশেষ করে হু শি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলদের উপযুক্ত হাতিয়ার।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নূতন সাংস্কৃতিক শক্তি যে সব মিত্রপক্ষের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করা যায় তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হল এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালাল। তাতে দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্প সহ সমাজ-বিজ্ঞান ও নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃত অগ্রগতি লাভ করল। মতাদর্শের বিষয়বস্তু এবং রূপের দিক থেকে নতুন সাংস্কৃতিক শক্তি এক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করল, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে লেখ্য ভাষা। এই বিপ্লবের ব্যাপক প্রসার চীনা ইতিহাসে নজীরহীন। লুস্যুন ছিলেন এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির সবচেয়ে মহৎ এবং সবচেয়ে সংগ্রামশীল বিশিষ্ট নেতা। বিশের দশকের প্রথমার্ধে, কুও মোরুও এবং ছেং ফাংউ'র নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সৃষ্টি সংঘ সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে মার্কসবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। বিশের দশকের শেষার্ধে লুস্যুন এবং অন্যা বিপ্লবী লেখকেরা অধীর আগ্রহসহকারে সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব অধ্যয়ন ও তা প্রচার করে সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও সমর্থনে লুস্যুন এবং অন্যান্য বিপ্লবী লেখকেরা উদ্যোগী হয়ে 'বামপন্থী লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য তত্ত্ব ও সৃজনশীল রচনার উভয় ক্ষেত্রে এই সংঘভুক্ত লেখকদের অবদান হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচার, সৃজনশীল রচনা সৃষ্টি এবং সাম্প্রতিক বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী সক্রিয় হবার জন্য উৎসাহ প্রদান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বহু গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হল এবং নতুন নতুন সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও লোকদের মধ্যে সমাদর লাভ করল। অকাট্য যুক্তির দ্বারা কুও মোরুও 'প্রাচীন চীনা সমাজ অধ্যয়ন' নামক রচনাতে প্রমাণ করলেন যে প্রাচীন চীনা সমাজের বিকাশ ধারা মার্কস এবং এঙ্গেলস

কর্তৃক উত্থাপিত সামাজিক বিকাশের সর্বজনীন নিয়মের সঙ্গে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ। এইরূপে, কুও মোরুও হুশি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের অযৌক্তিক মতবাদ যে চীনের পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ার জন্য মার্কসবাদ চীনে প্রয়োগ করা যায় না তা খণ্ডন করলেন। হু শির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক চক্র নূতন সাংস্কৃতিক শক্তির সামনে নির্মূল হল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাং দমনমূলক আচরণ ও ভীতিপ্রদর্শন নীতির আশ্রয় নিল। লুস্যুন তখন মন্তব্য করেন যে, "বামপন্থী শিল্প ও সাহিত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য মিথ্যা অপবাদ, দমন, গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হচ্ছে আর বামপন্থী লেখকদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা, চর, গুপ্তচর ও ঘাতকদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাং-এর দমন নীতিকে অগ্রাহ্য করে লুস্যুন তাঁর মর্মভেদী প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে নিজের ক্রোধ প্রকাশ করলেন। এই সব প্রবন্ধে প্রতিফলিত হল কোটি কোটি চীনা জনগণের অন্তরাত্মা এবং অনাবৃত হল কলঙ্ক-ময় শক্তির জঘন্য রূপ। তাঁর সূচিবিদ্ধ লেখনী ছিল "সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাস-ঘাতক, সামন্তসেনাধিপতি, আমলা, স্থানীয় প্রজাপীড়ক শাসক, বদমাস বিত্তশালী ব্যক্তি, ফ্যাসিস্ট এবং অন্যান্য দানবতুল্য মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বন্দুক আর তাদের মূল চরিত্রের অনুসন্ধানী।" (চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং চীনা জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কর্তৃক চীন ও বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে লুস্যুনের মৃত্যুতে শোকবার্তা)। লুস্যুনের প্রবন্ধসমূহ জনগণকে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল আর তাদের অগ্রগতির পথের নির্দেশ দিয়েছিল। ছ্যু ছিউপাই যিনি লুস্যুনের সঙ্গে বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা বিকাশের জন্য কাজ করছিলেন তিনিও বহু সংগ্রামী প্রবন্ধ এবং সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মাও তুন-এর উপন্যাস "মধ্যরাত্রি"তে চীনের মুৎসুদ্দী এবং জাতীয় পুঁজিবাদীদের জীবনধারার প্রাণবন্ত চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং তাতে তিনি দেখালেন আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনে পুঁজিবাদ কেন অচল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাং-এর দমননীতি লজ্জাকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল আর নূতন সাংস্কৃতিক শক্তি পূর্ণ বিজয় অর্জন করল।

মাও জেতোং যিনি প্রাচীন চীনের উত্তম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং নূতন সংস্কৃতির স্রষ্টা ছিলেন তিনি অতি সুন্দরভাবে আধুনিক চীনা সংস্কৃতির ইতিহাসের

সারকথা ব্যক্ত করলেন এবং নূতন সাংস্কৃতিক শক্তির এগিয়ে যাওয়ার পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন।

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে মাও জেতোং-এর 'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, তিনি তাতে পুরনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের বুর্জোয়া সংস্কৃতি এবং নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন বুর্জোয়া সংস্কৃতি কেন ব্যর্থ হবে আর প্রমাণ করলেন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কেন অজেয়। তিনি উল্লেখ করলেন যে, নূতন সংস্কৃতির চরিত্রকে জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও লোকপ্রিয় হতে হবে আর তা হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্তবাদবিরোধী উভয়ই। 'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে' প্রবন্ধ চীনা সংস্কৃতির অপার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করল।

১৯৪২ সালের মে মাসে মাও জেতোং-কর্তৃক প্রদত্ত 'সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়ানআনের আলোচনা সভায় ভাষণ' প্রকাশিত হল। এই প্রসিদ্ধ রচনায় তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি অ-প্রলেতারীয় প্রধানতঃ পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন ভুল ধারণার সমালোচনা করলেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলার বহু মৌলিক তাত্ত্বিক প্রশ্ন ব্যাখ্যা করলেন এবং তা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের কিভাবে সেবা করবে সুস্পষ্টভাবে তার সাধারণ নির্দেশ দিলেন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ তত্ত্ব প্রয়োগে এই রচনার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৯ সালের ১লা জুলাইতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে মাও জেতোং-এর 'জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে' প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এতে তিনি ১৮৪০ সাল থেকে চীনের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সারমর্ম লিখলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বললেন :

"অন্যান্য সব পথই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং সবগুলিই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যে সব লোক ঐ সব পথ ধরে চলতে চেয়েছিলেন — তাঁদের অনেকের পতন ঘটেছে, অনেকের চোখ খুলেছে, অনেকে তাঁদের ধ্যানধারণা পাল্টাচ্ছেন। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে যে, পরিবর্তনের এই আকস্মিকতা অনেকেই অনুভব করছেন এবং নতুন করে শেখার প্রয়োজন বোধ করছেন। তাঁদের মনের এই

অবস্থা বোধগম্য এবং নতুন করে শেখার তাঁদের এই সদিচ্ছাকে আমরা স্বাগত জানচ্ছি।"*

"অন্যান্য সব পথই" বলতে তথাকথিত নব্য বিদ্যা বুঝায় যা আফিম যুদ্ধের পর চৈনিক বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশসমূহের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব — চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ের পর "পশ্চিমা বুর্জোয়া সভ্যতা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা সবই চীনা জনগণের চোখে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে।"** আর নতুন বিদ্যার সামাজিক তত্ত্ব নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। নব্য বিদ্যার অনুসারীদের মধ্যে অধঃপতিত অংশ যাঁরা সর্বদাই নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করতেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাংস্কৃতিক পদলেহীরূপে সেবা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তবে নব্য বিদ্যার অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য বিরাট অংশ মনে-প্রাণে দেশপ্রেমিক ছিলেন। স্বভাবসিদ্ধভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্ব শিখবার ইচ্ছা তাঁদের মনে জেগেছিল। আর তারই ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা গঠন করলেন, বুর্জোয়া চিন্তাধারা থেকে বিমুক্ত হবার জন্য প্রচেষ্টা করলেন এবং ধাপে ধাপে শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তাধারা গ্রহণ করলেন। তাতে সূচিত হল যে, বৃহৎ সাংস্কৃতিক শক্তি তার সদস্যদের সংখ্যা বাড়াবে এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন আর সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে সৃজনশীল রচনা আরও অগ্রসর ও শক্তিশালী হবে।

চীন হল এমন একটি দেশ যার সভ্যতা সুপ্রাচীন আর তার লিখিত ইতিহাস প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবরণীতে অতি-উন্নত কৃষি এবং হস্তশিল্পের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই সব বিবরণী থেকে আরও জানা যায় বহু মহান চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, রাজনীতিবিদ, সমরবিদ্যা-বিশারদ, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের অস্তিত্বের কথা। সাংস্কৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার যা আজও বিদ্যমান আছে তা থেকেও এই সব তথ্য জানা যায়। আধুনিক সংস্কৃতি প্রাচীন কালের সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভূত তা আরও বিকশিত হয়ে চলেছে।

চীনের প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পদশালী ঐতিহ্য নতুন সংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে এক অনুকূল ভিত্তি তৈরী করেছে। প্রধান কথা হল অক্লান্তভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বক্তব্য ও পন্থা অধ্যয়ন করা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যা কিছু আবর্জনা তা দূর করে এবং সার জিনিষগুলি আত্মভূত করে তার পুনর্মূল্যায়ণ করা এবং তাকে জ্ঞানের উপযোগী করে চীনা জনগণের মনকে সম্পদশালী করে তোলা। চীনের সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য দেন এবং তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ করেন।